মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম

নসীম হিজাযী

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম ভাগ	
আবুল হাসান	১
লংকার রাজ দরবার	২৩
দস্যু	৩৪
গংগু ও তার কাহিনী	৪৩
দেবল	৫৪
বন্দী	৬৩
মায়ার উদ্বেগ	৭১
ভাই বোন	৮৩
শত্রু ও মিত্র	৯১
শেষ আশা	১০৪
দ্বিতীয় ভাগ	
কুতায়বার দূত	১১৮
বছরা হতে দামিশ্‌ক	১৩৬
সৈনিক ও রাজকুমার	১৪৪
প্রথম বিজয়	১৫৭
সর্ব সহায়	১৭৩
শুকতারা	১৮৩
সিন্ধুর নব সৈন্যধ্যক্ষ	১৮৮
রাজা দাহিরের শেষ পরাজয়	১৯৭
ব্রাহ্মণাবাদ থেকে অরোর	২০৩
তাদের দেবতা	২১৩
সুলায়মানের বন্দী	২২১
সূর্যাস্ত	২২৬

॥ এক ॥

হিন্দু-পাকিস্তান উপমহাদেশের পশ্চিম উপকূলস্থিত প্রধান বন্দরসমূহ এবং লংকা দ্বীপের সাথে আরব ব্যবসায়ীদের সম্পর্ক প্রাচীন। অজ্ঞানতার যুগ থেকেই জনকয়েক আরব ব্যবসায়ী লংকা দ্বীপে বসবাস শুরু করে। ইতিমধ্যে আরব দেশে এক নতুন ধর্মের আবির্ভাব হয়। কিন্তু এ ধর্ম আরব ব্যবসায়ীদের বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে না। তবে ইরানী ও রোমীয়দের বিরুদ্ধে আরবদের বিস্ময়কর বিজয়বার্তা তাদের মনে জাতীয় গর্ব সঞ্চার করে। আরবের তুলনায় ইরানকে সভ্য দেশ বলে গণ্য করা হত। এ জন্য ভারতের বাজারে আরবের তুলনায় পারস্যের পণ্যের আদর ছিল বেশী। তা ছাড়া ভারতে শাসকরা ইরানকে খুব শক্তিশালী প্রতিবেশী বলে মনে করত। আরবদের তুলনায় ইরানী ব্যবসায়ীরা বেশী সম্মান পেত। শাম থেকে কোন কাফিলা এলে প্রাচীন রোমের শক্তিতে অভিভূত ভারতবাসী তাদেরকে আরবদের চেয়ে বেশী খাতির করতো। কিন্তু আবুবক্‌র সিদ্দীক এবং উমর ফারুকের বিস্ময়কর বিজয়বার্তা প্রতিবেশী জাতিদের মনে আরবদের মর্যাদা সম্বন্ধে বিরাট পরিবর্তন আনে।

লংকা দ্বীপ ও ভারতের অন্যান্য স্থানে যে সব আরব ব্যবসায়ী বাস করতো তারা তখনো আরবের আভ্যন্তরীণ বিপ্লবে প্রভাবান্বিত হয়নি। অধর্মের বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয়কে এরা ইরানী ও রোমকদের বিরুদ্ধে আরবদের বিজয় মনে করে বিশেষ উৎফুল্ল হয়েছিল। আরবদের নতুন ধর্মের প্রতি তাদের পূর্ব ঘৃণা এখন আকর্ষণে পরিবর্তিত হলো। এ সময় যাদের আরব দেশে যাবার সুযোগ হয়েছে তারা এই নতুন ধর্মে পূর্ণ আশীষ নিয়ে ফিরে এসেছে।

লংকায় আরব ব্যবসায়ীদের নেতা ছিল আবদুশ শম্‌স। এর পূর্ব পুরুষেরা অনেকদিন থেকে এ দ্বীপে বাস করে আসছে। তার জন্ম এই দ্বীপেই। প্রবাসী আরব বংশীয় এক কন্যার সাথে হয় তার বিয়ে। যৌবনকাল থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তার সমুদ্র ভ্রমণ সীমাবদ্ধ ছিল লংকা হতে কাঠিয়াবাড় উপকূল পর্যন্ত। তার স্ববংশীয় আত্মীয়-স্বজন আরব দেশে কে কে আছে, কোথায় বা আছে তাও তার জানা ছিল না।

য়ারমুক ও কাদিসিয়ায় মুসলমানদের বিপুল বিজয়বার্তা দুনিয়ার সর্বত্র যখন পৌঁছে যায় তখন অন্যান্য আরবদের মতো সেও মাতৃভূমি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে।

লংকার বর্তমান রাজার পিতাকে এসব বিজয়বার্তাই এক অজ্ঞাতনামা ব্যবসায়ীর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে প্রলুব্ধ করে। তিনি আবদুশ শম্‌স ও তার সাথীদেরকে ডেকে এনে মূল্যবান উপহার দিয়ে বিদায় করেন। হিজরী ৪৫ সালে পিতার মৃত্যুর পর নতুন

রাজা সিংহাসনে আরোহন করেই আবদুশ শমসকে ডেকে এনে বলেন- অনেকদিন যাবত আরব দেশ থেকে এখানে কোন ব্যবসায়ী আসেনি। আমি আরব দেশের বর্তমান অবস্থা জানতে চাই। তোমাদের নতুন ধর্ম সম্বন্ধেও আমার কৌতূহল আছে। তুমি সেখানে যেতে চাইলে আমি সব রকম সাহায্য করতে রাজী আছি।

আবদুশ শমস উত্তর দিল- আপনার মুখে আমার মনের গোপন বাসনাই প্রকাশ পেয়েছে। আমি যেতে প্রস্তুত।

জন পাঁচেক ব্যবসায়ী ছাড়া আর সব আরব ব্যবসায়ী আবদুশ শমসের সাথে যেতে প্রস্তুত হলো।

দশ দিন পর। বন্দরে এক জাহাজ যাত্রার জন্য প্রস্তুত। আরবরা আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিল। আবদুশ শমসের স্ত্রী আগেই মারা গিয়েছিল। বুকে পাথর বেঁধে সে একমাত্র কন্যাকে বিদায় দিল। মেয়ের নাম সলমা। নগরবাসী সকলেই তাকে নারী সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে গণ্য করত। শ্রেষ্ঠ ঘোড়সওয়ার তাকে উদ্ধত ও সতেজ ঘোড়া দৌড়াতে দেখে বিস্মিত হতো। শ্রেষ্ঠ সাঁতারু তাকে ভয়ঙ্কর জল-প্রপাতে লাফ দিয়ে পড়তে এবং সমুদ্রের জলে মাছের মত সাঁতার দিতে দেখে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকত।

আবদুশ শমসের যাত্রার বিশ দিন পরে কাঠিয়াবাড়ের ব্যবসায়ীদের একটি জাহাজ লংকার বন্দরে উপস্থিত হয়। আবদুশ শমস দু'জন সঙ্গী নিয়ে নেমে আসে। তারা এই দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে এলো, তাদের জাহাজ ও অন্যান্য সাথী সমুদ্রে গর্ভে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছে। কাঠিয়াবাড়ের এই জাহাজ সময় মত না পৌঁছলে তারাও কিছুক্ষণের মধ্যে সমুদ্রের অথৈ জলে চিরতরে ডুবে যেত।

রাজা এ সংবাদে খুব দুঃখিত হন। সিন্ধী ব্যবসায়ীদের নেতা দিলীপ সিংহকে দরবারে ডেকে তিনজন আরবের প্রাণ রক্ষার জন্য তিনি তাকে তিনটি হাতী উপহার দেন। রাজার দয়া দেখে দিলীপ সিংহ ও তার সঙ্গীরা লংকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। রাজা সানন্দে তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং সরকারী খরচায় তাদের জন্য ঘরদোর তৈরী করিয়ে দেন।

কয়েক বছর বিশ্বস্তভাবে রাজ-সেবা করার পুরস্কার স্বরূপ দিলীপ সিংহকে রাজা স্বীয় নৌবাহিনীর প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন।

॥ দুই ॥

উপরোক্ত ঘটনার তিন বছর পরে আবুল হাসান নামে প্রথম মুসলমান ব্যবসা ও ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সুদূর লংকা দ্বীপে আগমন করেন।

কয়েক সপ্তাহ সমুদ্র ভ্রমণের পর আবুল হাসান ও তাঁর সঙ্গীরা জাহাজে দাঁড়িয়ে লংকা দ্বীপের শস্য-শ্যামল উপকূল দেখছিলেন।

কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ ও ছেলে নৌকায় চড়ে এবং কেউ কেউ সাঁতার দিয়ে তাঁদের জাহাজকে বন্দরে সম্বর্ধনা জানাতে আসছিল। দ্বীপবাসী অর্ধ-নগ্ন ও শ্যামল রংয়ের স্ত্রীলোকদের মাঝখানে এক নৌকায় জনৈক বিদেশী নারীর প্রতি আবুল হাসানের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। তার বর্ণ ছিল গৌর এবং চেহারা ও গঠন স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে ভিন্নতর। দু'জন বলিষ্ঠ দাঁড়ি নৌকার দাঁড় টানছিল। জাহাজের কাছে অন্যান্য নৌকার আগে পৌছবার জন্য মেয়েটি দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে তাড়া দিচ্ছিল।

অন্য সব নৌকাকে পিছনে রেখে নৌকাটি জাহাজের গায়ে এসে লাগল সর্বপ্রথম। মেয়েটি আবুল হাসানের প্রতি দৃষ্টিপাত করল। তার নির্ভীক দৃষ্টি উপেক্ষা করে আবুল হাসান মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মেয়েদের অর্ধ-নগ্ন বসন তাঁর সাথীদের চোখেও দৃষ্টিকটু লাগছিল। জাহাজীদের উপেক্ষা অপমানজনক মনে হওয়ায় গৌরবর্ণ মেয়েটি স্থানীয় ভাষায় কি বললো কিন্তু জাহাজ থেকে কোন উত্তর এলো না।

হঠাৎ চীৎকার ধ্বনি শুনে আবুল হাসান নিচের দিকে চেয়ে দেখলেন। নৌকা থেকে আট দশ গজ দূরে সেই সুন্দরী মেয়েটি পানিতে ডুব দিচ্ছিল। তার চীৎকার শুনেও নৌকারোহীরা নির্বিকারে তার দিকে চেয়ে দেখছিল। আবুল হাসান প্রথমে দড়ির সিঁড়ি ফেলে দিলেন। কিন্তু তাঁর মনে হলো যে, মেয়েটির হাত-পা অসাড় হয়ে যাওয়ায় সে সিঁড়ি ধরতে পারছে না। তিনি তৎক্ষণাৎ পোশাক সমেত সমুদ্রে লাফিয়ে পড়লেন। মেয়েটি হঠাৎ পানিতে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং তিনি হতভম্ব হয়ে এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন। ইতিমধ্যে জাহাজের পাশে বহু নৌকা জড় হয়ে গিয়েছিল এবং দ্বীপবাসীরা উচ্চস্বরে হাসছিল। তিনবার ডুব দেয়ার পর নিরাশ হয়ে আবুল হাসান দড়ির সিঁড়ি ধরে উঠতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর এক সাথী জাহাজ থেকে ডেকে বললো- মেয়েটি ঐদিকে আছে, জাহাজের অন্যদিকে। সে ডুবছে। বোধ হয় তাকে কোন সামুদ্রিক মাছে ধরেছে।

স্থানীয় স্ত্রী-পুরুষেরা আবার সশব্দে হেসে উঠল। মেয়েটি জাহাজের অন্য দিকে কি করে গেল আবুল হাসান বুঝতে পারছিলেন না। বিব্রত হয়ে তিনি আবার ডুব দিলেন এবং জাহাজের তলা দিয়ে অপর দিকে পৌছলেন। সেখানে কেউ ছিল না। উপর থেকে তাঁর পূর্ব বর্ণিত সাথী চিৎকার করছিল- সে ডুবে গেছে। মাছ তাকে গিলে ফেলেছে।

নিরাশ হয়ে আবুল হাসান আবার অপর দিকে ফিরে এলেন। এবার লোকের উচ্চ হাসির মুখে তাঁর নিজের সঙ্গীও যোগ দিল। এক আরব বলে উঠল আপনি উঠে আসুন। সে আপনার চেয়ে ভাল সাঁতারু।

আবুল হাসান লজ্জিত হয়ে সিঁড়ি ধরলেন। কিন্তু এক পা উঠতেই তাঁর পা ধরে টেনে তাঁকে পানিতে ফেলে দিল। সামলিয়ে নিয়ে এদিক ওদিক চাইতে দেখতে পেলেন সেই মেয়েটি দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে।

আবুল হাসান যখন উপরে পৌছলেন তখন তাঁর সঙ্গীরা মেয়েটির সাথে হাসির রোল

শুনছিল।

আবুল হাসানের দিকে চেয়ে মেয়েটি আরবী ভাষায় বললো- আপনাকে ভিজতে হওয়ায় আমি বিশেষ দুঃখিত।

মেয়েটির মুখ থেকে আরবী কথা শুনে সকলের দৃষ্টি তার দিকে নিবন্ধ হলো। আবুল হাসান জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কি আরব?

একদিকে মাথা কাৎ করে উভয় হাতে চুল নিংড়িয়ে পানি ঝরাতে ঝরাতে সে বললো- হ্যাঁ, আমি আরব। বহুদিন থেকে আমরা আরবদের জাহাজের প্রতীক্ষা করছি। আপনি আপনাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি। আপনারা কি কি পণ্য এনেছেন?

এক আরব কন্যাকে এরূপ নির্লজ্জ বসনে দেখা আবুল হাসান ও তাঁর সাথীদের কাছে অসহ্য ঠেকছিল। হতবুদ্ধি হয়ে তারা একে অপরের দিকে চাওয়া চাওয়ি করছিল। প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করল- আপনারা কি কি মাল এনেছেন আমি জানতে চেয়েছিলাম। আপনারা বিব্রত কেন? আরব মেয়েরা কি সাঁতরাতে জানে না? আপনারা কী ভাবছেন? আচ্ছা, আমি নিজেই দেখে নিচ্ছি।

আবুল হাসান বললেন- দাঁড়াও। আমরা ঘোড়া এনেছি। আমি নিজেই তোমাকে দেখাচ্ছি। কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি এই দেখে যে, লংকা দ্বীপের আরবরা এখনো অন্ধকার যুগের আরবদের চেয়ে হীনতর জীবন-যাপন করছে। সভ্য লোকের পোশাক পরা এবং পুরুষদের সামনে মেয়েদের লজ্জা করার রীতি কি এদেরকে শেখায় নি?

রাগে মেয়েটির মুখ লাল হয়ে উঠল। সে বললো- এটা কি মানুষের পোশাক নয়?

না। মনে হচ্ছে তোমাদের ঘরে এখনো ইসলামের আলো পৌছেনি। একথা বলে আবুল হাসান একটি জুব্বা (জামা) তুলে মেয়েটির কাঁধে পরিয়ে দিলেন। এখন তুমি আমাদের জাহাজ দেখতে পার- তিনি বললেন।

আবুল হাসানের কথার চেয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্বারা অভিভূত হওয়ায় মেয়েটি বিনা আপত্তিতে জুব্বা দিয়ে নিজের নগ্ন বাহু ও হাঁটু ঢেকে নিল।

আবুল হাসানের পুঁজি ছিল পঞ্চাশটি আরবী ঘোড়া। একটি একটি করে মেয়েটি সব ক'টা ঘোড়া দেখে নিল। অবশেষে একটি ঘোড়ার পিঠে হাত রেখে বললো- আমি এ ঘোড়াটি কিনব। এর দাম কত?

আবুল হাসান বললেন- তোমার মধ্যে আরবদের বিশেষত্ব এখনো একটি বাকী রয়েছে। এদের সকলের মধ্যে এ ঘোড়াটিই সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু তুমি এর দাম দিতে পারবে না। এ ঘোড়াটি মেয়েদের চড়ার উপযোগীও নয়। ঘোড়াটি যেমনি সবল ও সুন্দর, তেমনি উদ্ধত।

মেয়েটি মুচকি হেসে বলল- বেশ, দেখা যাবে। আপনি জাহাজ এতো দূরে রেখেছেন কেন?

আবুল হাসান জবাব দিলেন- আমি এ দেশের সরকার থেকে অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন মনে করি।

মেয়েটি বললো- লংকার রাজা বহুদিন থেকে আরব জাহাজের আগমন প্রতীক্ষা করছেন। আপনি জাহাজ তীরে নিয়ে চলুন। ঐ দেখুন, রাজার নৌ-সেনাপতি নিজেই চলে এসেছেন।

আবদুশ শমসেরের সাথে ঘনিষ্ঠতার সূত্রে দিলীপ সিংহ আরবী ভাষা বেশ য়ায়ত্ত করে নিয়েছিলেন। জাহাজে উঠেই তিনি আরবী ভাষায় বললেন- আপনি জাহাজ এতো দূরে রেখেছেন কেন?

আবুল হাসানের পরিবর্তে মেয়েটি উত্তর দিল- এঁর ধারণা ছিল যে জাহাজ তীরে ভিড়বার আগে হয়তো রাজার অনুমতি দরকার।

দিলীপ সিংহ বললেন- আপনাকে দেখে মহারাজ অত্যন্ত খুশী হবেন।

মেয়েটি বললো- আমি যাচ্ছি। কিন্তু একথা যেন মনে থাকে যে ঐ সাদা ঘোড়াটি আমার। ওর জন্য যে দাম চাইবেন আমি তাই দেব। এ কথা বলে মেয়েটি জুব্বা খুলে এক আরবের কাঁধে ফেলে দিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিল।

॥ তিন ॥

আরবদের জাহাজ আগমনের বার্তা আবদুশ শমস পেয়েছিলেন। তিনি শহরের গণ্যমান্য লোকদের নিয়ে আবুল হাসান ও তাঁর সঙ্গীদের সাদর সম্বর্ধনা জানালেন এবং তাঁদেরকে নিজের ঘরে স্থান দিলেন। তাঁদের ঘোড়াগুলো রাখলেন নিজের আস্তাবলে। অল্পক্ষণের মধ্যেই পঞ্চাশটি ঘোড়ার জন্য ক্রেতা জুটে গেল দু'শ' আর প্রত্যেকেই অপরের চেয়ে বেশী দাম হেঁকে বসল।

দিলীপ সিংহ পরামর্শ দিলেন, রাজাকে দেখাবার আগে ঘোড়া বিক্রয় করা উচিত হবে না। সম্ভবতঃ তিনিই সবগুলো ঘোড়া কিনে নেবেন। আবদুশ শমসও দিলীপ সিংহের কথায় রায় দিলেন। এসব কথাবার্তা চলছিল ইতিমধ্যে রাজার দূত এসে হাজির হলো। বলল- মহারাজ আরব সওদাগরদের সাথে দেখা করতে ও তাদের ঘোড়া দেখতে চাচ্ছেন।

দিলীপ সিংহ দূতকে বললেন- তুমি গিয়ে মহারাজকে বল আমরা এখনিই আসছি।

একথা বলে তিনি আবুল হাসানকে বললেন- শেখ আবদুশ শমসের কন্যা একটি ঘোড়া নির্বাচন করেছেন। আমার মনে হয় ওটা এখানে রেখে যাওয়াই ভাল।

আবুল হাসান- বললেন শেখ যদি ঘোড়াটি নিজের জন্য রাখতে চান, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ওটা মেয়েদের চড়ার উপযোগী নয়। ঘোড়াটি অত্যন্ত উদ্ধত।

নেপথ্যে শব্দ হলো- না বাবা, উনি মনে করেন ওর দাম আমরা দিতে পারব না।

আবুল হাসান জাহাজে যে মেয়েটিকে দেখেছিলেন তাকে দেখতে পেলেন। এক হাতে লাগাম ও অপর হাতে চাবুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এবার সে আরবী মেয়ের বেশ পরিহিত ছিল।

আবুল হাসান একটু নরম হয়ে বললেন- আমার কথা বিশ্বাস না হয় তুমি নিজেই দেখে নাও। তুমি যদি এ ঘোড়ার লাগামও পরাতে পার তবে ঘোড়াটি তোমার পুরস্কার।

মেয়েটি দ্রুত আস্তাবলের দিকে অগ্রসর হলো। অন্য সকলেও সেদিকে এগিয়ে গেল। সব ঘোড়ার উপর একবার দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মেয়েটি সাদা ঘোড়ার দিকে অগ্রসর হলো। তাকে দেখেই ঘোড়া কান খাড়া করে দাঁড়ালো। মেয়েটি ঘোড়াকে আলগোছে থাপড় দিতেই ঘোড়াটি পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে গেল। তা দেখে অন্যান্য ঘোড়াও রশি ছিড়তে লাগল।

আবুল হাসান বললেন- থাম। এবং অগ্রসর হয়ে ঘোড়ার বাঁধন খুলে বাইরে নিয়ে এলেন। তারপর একটি গাছের সাথে বেঁধে বললেন- এবার আপনি সাহসের পরীক্ষা দিতে পারেন।

মেয়েটি অগ্রসর হয়ে হঠাৎ এক হাতে ঘোড়ার নিচের চোয়াল ধরে ফেলল এবং অপর হাতে আহত হিংস্র জন্তুর মত ক্রুদ্ধ ও লম্ফ-ঝম্ফে ঘোড়াটির মুখে লাগাম ঢুকিয়ে দিল। কৌতূহলী যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল তাদের বিস্ময় কাটিয়ে উঠবার আগেই মেয়েটি ঘোড়ার বন্ধন খুলে লাফ দিয়ে তার পিঠে চড়ে বসল। ঘোড়াটি কয়েকবার সামনের পায়ে ভর দিয়ে পিছনের পা ছুঁড়তে লাগল। তারপর লাফাতে লাফাতে তীরবেগে বাড়ী হতে বের হয়ে গেল।

শেখ আবদুশ্ শমস্ গর্বমিশ্রিত স্বরে বলে উঠলেন- আরব দেশে এমন ঘোড়ার এখনো জন্ম হয়নি যার উপর সলমা চড়তে পারে না। দুঃখের বিষয় আপনি বাজী হেরে গেলেন। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ঘোড়ার পূর্ণ মূল্য আপনি পাবেন।

আবুল হাসান বললেন- ওটা বাজী নয় পুরস্কারের কথা। পুরস্কারের কখনো দাম নেওয়া হয় না। সৌভাগ্য সে ঘোড়ার যে এমন সওয়ার পায়।

॥ চার ॥

দেখবার আগেই রাজা সবগুলো ঘোড়া কিনে নিবেন স্থির করেছিলেন। শাহী কোষাগার থেকে ঘোড়ার জন্য যে মূল্য দেওয়া হলো তা আরবদের প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশী। রাজা আবুল হাসানকে আরবদের নতুন ধর্ম এবং তাদের দিকবিজয় সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করলেন। দিলীপ সিংহ দোভাষীর কাজ করলেন। আবুল হাসান সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পর ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। রাজা ইসলামের বহুবিধ সৌন্দর্য স্বীকার করে নিয়ে পুনর্বার দেখা করার প্রতিশ্রুতি আদায় করে আবুল

হাসানকে বিদায় দেন।

আবদুশ্ শমসের ঘরে ফিরে আবুল হাসান জানতে পারলেন যে সলমা তখনো ফেরেনি, কয়েকজন লোক নিয়ে আবদশ্ শমস তার খোঁজে বের হয়েছে। যোহরের নামাজ পড়ে আবুল হাসান চিন্তিত মনে বাড়ীর উঠানে পায়চারী করছিলেন। এমন সময় সেই সাদা ঘোড়াটি খালি পিঠে অবাধে দৌড়ে ভেতরে প্রবেশ করল। ঘোড়ার মুখে লাগামও ছিল না।

আবুল হাসান নিজের সাথীদের বললেন- আল্লাহ্ জানে তার কি হয়েছে। ঘোড়াটি উদ্ধত বটে। কিন্তু ভূপতিত সওয়ারকে ফেলে আসার মত নয়। লাগামের রশি পায়ের নিচে এসে ভেঙ্গে যেতে পারতো, কিন্তু লাগাম খুলে পড়া সম্ভব নয়। আমি যাই দেখি।

শেখ আবদুশ্ শমসের ভৃত্যের কাছ থেকে অপর একটি লাগাম নিয়ে আবুল হাসান ঘোড়াতে যুতে নিলেন এবং ঘোড়ার নগ্ন পিঠে চড়ে বের হয়ে গেলেন। ঘোড়াকে নিজের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিলেন। ঘোড়ার চল দেখে বোঝা যাচ্ছিল তাকে খুব খাটানো হয়েছে। কয়েক ক্রোশ ঘন বনের ভেতর দিয়ে চলার পর ঘোড়াটি এক টিলার উপর উঠে একটি জলপ্রপাতের কাছে থেমে গেল। সেখান থেকে উপর দিকে যাবার আর পথ ছিল না। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক তাকাবার পর আবুল হাসান ঘোড়া থেকে নেমে তাকে এক গাছের সাথে বেঁধে রাখলেন। তিনি উচ্চস্বরে সলমাকে ডাকতে লাগলেন। অনেকক্ষণ খোঁজা-খুঁজির পর ক্লান্ত হয়ে তিনি জলপ্রপাতের কাছে এক পাথরের উপর বসে পড়লেন। সন্ধ্যা হেয় আসছিল। আবুল হাসান নামাজ পড়ে এক দুর্গম পথের কিছুদূর অগ্রসর হলেন। সেখানে পাহাড়ী নদী-জলপ্রপাত হয়ে নিচে পড়ছিল। কয়েক পা দূরে সলমা নদীর তীরে এক গাছের নিচে শুয়েছিল। আবুল হাসানের দৃষ্টি তার উপর যখন পড়ল তখন তিন চার গজ লম্বা এবং মানুষের উরুর মত মোটা একটি সাপ ঘাসের উপর মাথা তুলে তার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আবুল হাসান সলমা সলমা বলে চীৎকার করে দৌড়ে গেলেন এবং তার বাহু ধরে টানতে টানতে কিছুদূর সরিয়ে নিয়ে এলেন। মৃদু চীৎকার করে সলমা চোখ খুললো। শিকার হাতছাড়া হওয়ায় সাপটি হিস্ হিস্ করতে করতে ফণা ধরে রুখে দাঁড়াল। আবুল হাসান তরবারী কোষমুক্ত করে নিয়েছিলেন। তিনি তড়িৎবেগে পাশ থেকে সাপটিকে তরবারী দিয়ে আঘাত করে তার মাথা বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। নদীর পানিতে তলোয়ার ধুতে ধুতে আবুল হাসান বললেন- কি নির্বোধ তুমি! ঘুমোবার আর জায়গা পেলে না?

সলমা তখনো ভয়ে কাঁপছিল। সে বললো- আমি ক্লান্ত হয়ে এখানে বসেছিলাম। ঝিমুতে ঝিমুতে জানি না কখন শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। আগেও এখানে আমি কয়েকবার এসেছি। কিন্তু এরকম সাপ কখনো দেখিনি। ভাগ্যিস, আপনি এসেছিলেন। নইলে এতক্ষণে আমি সাপের পেটে পৌঁছে যেতাম। কিন্তু আপনি কি করে এখানে এলেন?

তুমি জান আমি কি করে এখানে এসেছি। কিন্তু তুমি ঘোড়াটিকে কেন ছেড়ে দিয়েছিলে বল তো?

মুচকি হেসে সলমা জবাব দিল- আমি তাকে কখন ছাড়লাম। সেই তো আমাকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল।

আবুল হাসান একটু কঠোর স্বরে বললেন- মনে হচ্ছে খুব খারাপ পরিবেশে তুমি লালিত হয়েছ। তোমার চরিত্রের মান অন্ধকার যুগের আরব-চরিত্রের চেয়ে আর কি করে ভাল হবে? কিন্তু হাজার দোষ সত্ত্বেও তারা অতিথির সাথে মিথ্যা কথা বলা ঘৃণ্য মনে করত। ঘোড়াটিকে খালি ফিরে যেতে দেখে আমার কখনো বিশ্বাস হয়নি যে, সে তোমাকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেছে। একে আমার আস্তাবলে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ঘোড়াটি উদ্ধত এবং অবাধ্য বটে কিন্তু সে প্রতারণা জানে না। সত্য বলো- তুমি নিজ হাতে এর লাগাম খুলে নাওনি এবং ওকে ধমকিয়ে তাড়িয়ে দাওনি?

সলমা লজ্জিত হয়ে চোখ নিচু করে উত্তর দিল- আপনি যখন খারাপ মনে করেন আমি প্রতিজ্ঞা করছি ভবিষ্যতে আর কখনো মিথ্যা বলব না।

তোমার চরিত্রে এমন কতগুলো বিষয় আছে যা আমি খারাপ জানি এবং প্রত্যেক মুসলমানেই তা খারাপ জানবে।

আপনি চাইলে আমার প্রত্যেক বদ অভ্যাস সংশোধন করতে আমি প্রস্তুত আছি। মেহমানকে খুশী করা আমার কর্তব্য। তাছাড়া আপনি আজ আমার জীবন বাঁচিয়েছেন।
আমাকে খুশী করার তোমার দরকার নেই। আমি চাই যে আল্লাহ্ তোমার প্রতি খুশী হোন। আল্লাহ্ যা ভাল জানেন তাই তোমার পছন্দ করা উচিত। তিনি যা খারাপ জানেন তাই বর্জন করা উচিত। অর্ধ-নগ্ন বসনে মেয়েদের পুরুষের সামনে বের হওয়া তিনি খারাপ জানেন।

সলমা উত্তর দিল- আপনার কথা মত আমি তো পোশাক বদলিয়ে ফেলেছি।

আবুল হাসান বললেন- পোশাকের চেয়ে মনের পরিবর্তন বেশী জরুরী; যাহোক এখন আর কথা বলার সময় নেই। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। তোমার পিতা খুব চিন্তিত আছেন। ঘোড়াটি ফিরবার আগেই তিনি তোমার খোঁজে বের হয়ে গিয়েছিলেন।

চাঁদনী রাত আবুল হাসান ও সলমা বন অতিক্রম করছিল। সলমা ঘোড়ার পিঠে এবং আবুল হাসান লাগাম ধরে আগে আগে যাচ্ছিলেন। পথে সলমা আবুল হাসানকে তাঁর বংশ পরিচয়, সমুদ্র যাত্রা ও সঙ্গীদের সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞেস করছিল; কিন্তু আবুল হাসানের ঔদাসীন্য বেড়ে যেতে লাগল। সলমা এটা আশা করেনি। সলমা বিব্রত ও লজ্জিত হলো। অবশেষে সে বললো- আমার জন্য আজ আপনাকে খুব কষ্ট পেতে হল। আমাকে মাফ করুন কিংবা শাস্তি দিন কিন্তু রাগ করবেন না। আমি অপরাধ করেছি। আমার হেঁটেই যাওয়া উচিত। আমি নেমে যাচ্ছি। আপনি ঘোড়ায় চড়ুন।

এবারও তার প্রত্যাশার বিরুদ্ধে আবুল হাসান নির্দয়ভাবে জবাব দিলেন- তুমি একটি নারী এবং কোন হিংস্র জন্তু তোমাকে আক্রমণ করতে পারে- এই ভয় না থাকলে আমি কিছুতেই এখন তোমার সাথে চলতাম না।

সলমা আহত মনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। পরে বললো- সাপটা আমাকে খেয়ে ফেললে আপনার দুঃখ হতো কি?

সেটা শুধু তোমার জন্য নয়। আমার সামনে অন্য কাউকে মেরে ফেললেও আমার তেমনি দুঃখ হতো।

আমার জন্য কেন আপনার প্রাণ বিপদে ফেলেছিলেন?

মানুষের প্রাণ রক্ষা করা মুসলমানের কর্তব্য বলে।

সলমা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। দূর থেকে কয়েকটি ঘোড়ার খুরের শব্দ পাওয়া গেল। আবুল হাসান বললেন- দেখ, এখনো তিনি তোমাকে খুঁজে ফিরছেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আবদুশ শমস ও তার সঙ্গীরা পৌঁছে গেল। মেয়েকে নিরাপদ দেখে তিনি বিস্তারিত ঘটনার বিবরণ নেওয়া দরকার মনে করলেন না। সলমার মুখে সাপের ঘটনা শুনে তিনি আবুল হাসানকে কৃতজ্ঞতা জানালেন।

॥ পাঁচ ॥

পরদিন প্রত্যূষে আবদুশ শমস নিজ বাড়ীর ছাদে অর্ধ-ঘুমন্ত অবস্থায় শুয়ে শুয়ে আযানের মধুর ধ্বনি শুনছিলেন। কিছুক্ষণ হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙ্গে চোখ খুললেন। সলমা তখনো গভীর নিদ্রায় মগ্ন। আবদুশ শমস তাকে জাগিয়ে দিয়ে প্রভাত বায়ু সেবন করার জন্য নিচে নেমে গেলেন।

আবুল হাসানের সাথীরা শিশির ভেজা ঘাসের উপর চাদর বিছিয়ে তাঁর পিছনে কাতার বেঁধে দাঁড়ান ছিল। আবুল হাসান সুমধুর স্বরে সূরা ফাতিহা পড়ে আরো কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন। কুরআনের শব্দাবলী আবদুশ শমসেরের মনে তরঙ্গ সৃষ্টি করল। তাঁর প্রতিবেশী কয়েকজন আরবও তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল। নিজ জাতির যুবকদের নতুন প্রার্থনা প্রণালী মনোযোগের সাথে দেখতে লাগল। রুকু এবং সিজদার পর দ্বিতীয় রাক'আত পর্যন্ত আবদুশ শমসেরের মনে এক আত্মহারা ভাবের উদয় হলো। আস্তে আস্তে নামাযীদের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হলেন। নিকটে গিয়ে সংকুচিত হয়ে থেমে গেলেন। কিন্তু যেন এক অদৃশ্য আকর্ষণে আবার দৌড়ে গিয়ে নামাযীদের কাতারে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর সাথীরা তাঁর অনুসরণ করল। নামায শেষ করে আবুল হাসান আবদুশ শমসকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আবদুশ শমসের চোখে আনন্দাশ্রু টলমল করছিল। আবুল হাসান ও তাঁর সাথীরা তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানালো।

আবদুশ শমস বললেন- আপনার ভাষায় এক যাদুকরী শক্তি ছিল। আমাকে আরো কিছু শোনান।

আবুল হাসান জবাব দিলেন- এ ত' আমার ভাষা নয়। আল্লাহর কালাম।

আবদুশ শমস্ বললেন- নিশ্চয় তা মানুষের বাক্য হতে পারে না। আমাকে শোনান।

আবুল হাসান নিজের সাথী তলহার প্রতি ইঙ্গিত করলেন। তলহা কুরআনের হাফিজ ছিল। অন্য আরবরা তাঁকে ঘিরে বসে গেল। তলহা সূরা য়াসীন পড়ে শোনালেন। কুরআনের পবিত্র বাণী এবং তলহার মর্মস্পর্শী মধুর স্বর আবদুশ্ শমস ও তাঁর সাথীদের মনে অপূর্ব ভাবের সৃষ্টি করল। তিলাওয়াত শেষে আবুল হাসান হযরত মুহম্মদের জীবনী এবং ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা করলেন এবং তাদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহবান জানালেন।

আবদুশ্ শম্স ও তাঁর সাথীরা অনেক দিন থেকে আরবদের মাহাত্ম্যের কাহিনী শুনে হযরত মুহম্মদের মহত্ত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আবুল হাসানের বক্তৃতার পর তাঁরা ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করলেন। কলিমা তওহীদ পাঠ করার পর আবদুশ্ শম্স নিজেই আবদুল্লাহ্ নাম পছন্দ করে নিলেন।

এতটা নারিকেল গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সলমা এসব ঘটনা দেখছিল। সংকুচিতভাবে অগ্রসর হয়ে বাপকে বললো- বাবা, মেয়েরাও কি মুসলমান হতে পারে?

তার পিতা মুচকি হেসে আবুল হাসানের দিকে তাকালেন। তিনি বললেন- আল্লাহর রহমত নারী পুরুষ সকলের জন্যই সমান।

সলমা বললো- তাহলে আমার নামও পালটে দিন। আমিও মুসলমান হতে চাই।

আবুল হাসান বললেন- তোমার এ নামই ঠিক আছে। তুমি কেবল কলিমা পড়ে নাও।

সলমা কলিমা পাঠ করল এবং সকলে হাত তুলে তার জন্য দু'আ করল।

আকাশে মেঘ জমছিল। হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সবাই এক ঘরে প্রবেশ করল। দ্বি-প্রহরে বৃষ্টি থেমে গেল। দিলীপ সিংহ এসে খবর দিলেন, মহারাজ আপনাদের জন্য প্রতীক্ষা করছেন।

সঙ্গীদের ওখানে ছেড়ে আবুল হাসান দিলীপ সিংহের সাথী হলেন।

॥ ছয় ॥

দ্বি-প্রহরের সময় আবুল হাসান ফিরে এসে সঙ্গীদের জানালেন যে, রাজা এবং কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আরবদের ঘোড়া কিনবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কাজেই চারদিনের মধ্যে আমাদের জাহাজ ফেরত যাত্রা করবে।

আবদুল্লাহ্ (আবদুশ্ শম্স) তাদেরকে আরো কিছুদিন থেকে যাবার অনুরোধ জানালেন। কিন্তু আবুল হাসান শিগগির ফিরে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনুমতি লাভ করলেন।

আবদুল্লাহ্ বললেন- ইসলাম সম্বন্ধে এখনো আমাদের অনেক কিছু জানবার বাকী আছে। যদি আপনি তলহাকে রেখে যান খুব ভাল হয়।

আবুল হাসান তলহার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন- ইনি রাযী হলে আমি সানন্দে তাঁকে রেখে যাব।

তলহা সাগ্রহে এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

পরদিন আবুল হাসানের সাথীরা জাহাজের পাল মেরামত করতে এবং খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদী সংগ্রহ করতে বের হলে গেল। দিলীপ সিংহ ও আবদুল্লাহর সাথে পরামর্শ করে আবুল হাসান নিজেদের সমস্ত পুঁজি দিয়ে আটটি হাতী কিনলেন এবং জাহাজের অবশিষ্ট স্থানে নারিকেল বোঝাই করে নিলেন।

সন্ধ্যার সময় আবুল হাসান আবদুল্লাহর বাগানে পায়চারি করছিলেন। এমন সময় পেছনে পদশব্দ শুনতে পেলেন। ফিরে দেখলেন সলমা দাঁড়িয়ে আছে। দু'দিন আগে যে মুখ আনন্দে উৎফুল্ল ছিল, আজ তা বিষাদ মলিন দেখাচ্ছিল। যে চোখ আঁধার রাতের উজ্জ্বল তারকার চেয়েও বেশী মনোহর ছিল, আজ তা অশ্রুসজল।

কিছুটা উদাসীনভাবে তিনি জিজ্ঞেস করলেন- সলমা, তুমি এখানে কি করছ?

আবুল হাসানের বিরূপ ভাব দেখে আত্ম-সংবরণের চেষ্টা সত্ত্বেও তার অশ্রু বাধা মানল না। তার কম্পমান ওষ্ঠ থেকে বিষন্ন ও বেদনা-মাখা স্বরে বের হয়ে এল- আপনি পরশু চলে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ, কিন্তু তোমার কি হলো? তুমি কাঁদছ কেন?

কিছু না, কিছু না।

অশ্রুসিক্ত মুখের বিষন্ন ম্লান হাসি আবুল হাসানের মনে দাগ না কেটে পারল না। মুখে বললেন- সলমা, তুমি আগের মতই রয়ে গেছ। ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও আমি তোমার মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখছি না। অনাত্মীয় পুরুষের সামনে বের হওয়া এখন তোমার পরিহার করা উচিত। লজ্জা মুলমান মেয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ।

আপনি এখনো আমার উপর রেগে আছেন। আপনার কথামত আমি পোশাক বদলিয়েছি। নামায পড়ছি পরশু থেকে। ঘরের বাইরে পা দিচ্ছি না। কোনো মুসলমানের সামনে আসাও কি আমার নিষিদ্ধ?

হাঁ, এটাও নিষিদ্ধ। আমি তলহাকে রেখে যাচ্ছি। মুসলমান মেয়ের কর্তব্য সম্বন্ধে সে তোমাকে শিক্ষা দেবে, তুমি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পাবে।

সলমা জবাব দিল- আমার অন্য কোন শিক্ষার দরকার নেই। আপনি যে আদেশ দেবেন তাই আমি শুনব। আপনার ইঙ্গিতে আমি পাহাড় থেকে লাফ দিতে এবং হাত পা বেঁধে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত আছি।

আবুল হাসান বললেন- আমার সন্তুষ্টি যদি তোমার এতই কাম্য হয়ে থাকে তবে শোন, তুমি আপাদমস্তক নিজেকে ইসলামী সাঁচে ঢেলে নাও-এর বেশী আমি কিছু চাই

না। মুসলমানের প্রতি কর্ম ও বাসনা কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে- কোনো মানুষের সন্তুষ্টি নয়। কলিমা পাঠ করার পর তুমি এক অসীম প্রচেষ্টা ও সাধনার জগতে প্রবেশ করেছ। এ জগতে প্রবেশকারীদের মনে বিষাদ বা চোখে অশ্রুর স্থান নেই। মুসলমানের জন্য জীবন এক মহান পরীক্ষার ক্ষেত্র। তার মন এমন বলিষ্ঠ হওয়া চাই যে, আল্লাহর অন্য জীবনের উচ্চতর কামনা ও বাসনা উৎসর্গ করতে পিছু-পা হবে না। শরাঘাতে বুক জর্জরিত হলেও মুখ দিয়ে উহু শব্দটি বের হবে না। তুমি আরব দেশে গেলে হয়ত এই দেখে বিস্মিত হবে যে মুসলমান মেয়েরা নিজেদের স্বামী, ভাই এবং পুত্রকে নিজ হাতে রণসাজে সাজিয়ে বিদায় দিচ্ছে। তাদের চোখে অশ্রু দেখা তো দূরের কথা তাদের কপালে রেখাও দেখতে পাবে না। এর একমাত্র কারণ এই যে, তারা খোদার সন্তুষ্টিতে দুনিয়ার সমস্ত খুশীর উপরে স্থান দিয়েছে। তুমি যদি আমাকে খুশী করার জন্য ইসলাম কবুল করে থাক তাহলে আমার দুঃখের সাথে স্বীকার করতে হবে যে, তুমি ইসলামের কিছুই বোঝনি। যদি আল্লাহকে খুশী করতে চাও তবে ঘরে যাও। আমি তলহাকে পাঠাচ্ছি। সে আজ থেকেই তোমাকে কুরআন পড়া শেখাবে। আমি চাই আমি যখন ফিরে আসব তখন আমার সাঁতার জ্ঞানের পরীক্ষা নেয়ার জন্য তীর হতে এক মাইল দূরে সমুদ্রের মধ্যে আমার অভ্যর্থনা করতে যাবে না এবং আমাকে বন ও পাহাড়ে তোমাকে খুঁজে বেড়াতে না হয়। আবদুশ শমসের নাম পরিবর্তনের সাথে সাথে তার বাড়ির আমূল পরিবর্তন হয়েছে এবং সেখানে এক মুসলমান কন্যা প্রতিপালিত হচ্ছে- তা দেখলে আমি খুশী হব।

সোৎসাহে সলমা জিজ্ঞেস করল- আপনি কখন ফিরবেন?

দিন ঠিক করা সম্ভব নয়। তবে আমার ইচ্ছা ঘোড়া ক্রয় করে ফিরে আসব। কিন্তু যদি জিহাদ করতে কোথাও যেতে হয় তাহলে হয়ত আর ফিরে আসা হবে না।

সলমার চেহারা নৈরাশ্যে মলিন হয়ে গেল। অশ্রুপূর্ণ চোখে সে বললো- না, না, এমন কথা মুখে আনবেন না। আল্লাহ্ নিশ্চয় আপনাকে ফিরিয়ে আনবেন।

তুমি দু'আ করতে থেকো। আল্লাহ্ চাহে তো আমি নিশ্চয় ফিরে আসব।

সলমা বলল- দু'আ? আপনি বলছেন কি? আমার দু'আ কবুল হলে আপনি যাবার নাম নিতেন না।

আবুল হাসান হঠাৎ অনুভব করলেন তিনি একটু বেশী কথা বলে ফেলেছেন। কণ্ঠস্বরে একটু কাঠিন্য মিলিয়ে তিনি বললেন- সলমা আরব দেশের সব নারী যদি তোমার মত শুভ দু'আ করতো তাহলে ইসলামের মশাল আরবের সীমার বাইরে যেত না।

সলমা লজ্জিত হয়ে ফিরে গেল। তার মুখ হতে বার বার বের হতে লাগল- আমি বড় নির্বোধ। আমি ও কথা কেন বলতে গেলাম।

কিছুক্ষণ পর সে বাড়ির ছাদে উঠল। সোনার থালার মত রক্তবর্ণ অস্তায়মান সূর্য

সমুদ্রে ডুব দেয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। আকাশে ভাঙা ভাঙা হালকা মেঘ স্বর্ণ রঙে রঞ্জিত হয়ে বেড়াচ্ছিল। ভেজা হাওয়া দোলায়মান নারিকেল পাতায় এক অপূর্ব রাগের সৃষ্টি করছিল। আশেপাশের সমস্ত দৃশ্য অতিক্রম করে সলমার দৃষ্টি সমুদ্রে আরবদের জাহাজের উপর কেন্দ্রীভূত হল। মনের মধ্যে এক অভিনব আন্দোলন অনুভব করল। দু'হাত তুলে দু'আ করতে লাগল- হে জল-স্থল-স্থাবর-জঙ্গলের প্রভু, আমাকে এক প্রকৃত মুসলিম নারীর ঈমান দান কর। আমাকে সরল পথ দেখাও। তিনি যখন ফিরে আসেন, তখন আমাকে দেখে যেন আর ক্রুদ্ধ না হন।

॥ সাত ॥

তৃতীয় দিন আকাশে মেঘ জমছিল। ছাদে উঠে সলমা সমুদ্রের দিকে দেখছিল। তীর থেকে দূরে আবুল হাসানের জাহাজ ঢেউয়ে দোলায়মান দেখাচ্ছিল। বাতাসের কয়েকটা জোর ঝাপ্টা বয়ে গেল এবং বৃষ্টিপাত শুরু হল। বৃষ্টিধারা বৃদ্ধির সাথে সাথে সলমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো। শেষ পর্যন্ত জাহাজটি দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। আত্ম সংবরণের চেষ্টা সত্ত্বেও তার চোখে জল ঝর ঝর করে পড়তে লাগল।

অশ্রুজল কপোল বেয়ে বৃষ্টি জলের সাথে মিশে গেল। বহুক্ষণ পর্যন্ত সলমা হাত তুলে দু'আ করতে লাগল- প্রভু, ওঁকে সমুদ্রের উদ্ধত তরঙ্গ থেকে রক্ষা করো।

আবুল হাসানের সাথে শেষ সাক্ষাতের পর থেকে সলমার মনোভাব ও চরিত্রে গুরুতর পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। আবুল হাসানের ঔদাসিন্য তার মনে বিশেষ বেদনা দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও তাঁকে সে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়েছিল। তার বিশ্বাস জন্মেছিল তার যে অভ্যাস আবুল হাসান অপছন্দ করেন তা নিশ্চয় খারাপ। তাই দ্বিতীয়বার সে কারো কাছে বেপর্দা বের হতে আর সাহস করেনি।

আবুল হাসান ও তাঁর সাথীরা যখন বন্দরের দিকে রওয়ানা হলো, তখন সলমা নিজের মনে তুমুল আলোড়ন অনুভব করল। কয়েকবার তার ইচ্ছা হলো দু'একটি কথা বলে আবুল হাসানের কাছ থেকে বিদায় নেবে, কিন্তু প্রতিবারই তার বুদ্ধি হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে বাধা দিল। সে বার বার নিজের হৃদয়কে প্রশ্ন করল- তার মনে কি তোমার জন্য স্থান আছে? আবুল হাসানের গত কয়েক দিনের কথাবার্তায় সে এ প্রশ্নের জবাব খোঁজে। তার মন কখনো নৈরাশ্যের অন্ধকারে ছেয়ে যায়, আবার কখনো আশার আলোকে জ্বলে উঠে।

আবদুল্লাহ্‌র শব্দ শুনে সে নিচে নেমে এলো। বৃদ্ধ পিতা প্রশ্ন করলেন- সলমা, বৃষ্টির মধ্যে তুমি উপরে কি করছিলে?

কিছু না বাবা, আমি.... সলমা কোন ছুতা বের করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তখন আবুল হাসানের কথা মনে পড়ে গেল। সে বলল- আমি ওঁর জাহাজ দেখছিলাম।

আব্দুল্লাহ্ বললেন- তিনি তো অনেকক্ষণ চলে গেছেন। তুমি যাও কাপড় বদলে

এসো। তলহা এখনি এসে যাবে। আমরা তার কাছে কুরআন পড়ব।

সলমা জিজ্ঞেস করল- আপনি তাঁকে কোথায় ছেড়ে এলেন?

পথে সে যায়েদের বাড়িতে রয়ে গেছে। এখনি চলে আসবে।

অল্পদিনের মধ্যেই তলহার শিক্ষার গুণ দেখা গেল। সলমা নিজের প্রতি পদক্ষেপ এখন আবুল হাসানের সন্তুষ্টির কথা না ভেবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কথা ভাবতে লাগল। তা সত্ত্বেও প্রত্যেক নামাযের পর সে আবুল হাসানের জন্যই সর্বপ্রথম দু'আ করতে থাকে।

ছয় মাস গত হয় কিন্তু আবুল হাসানের কোন খবর এলো না। সলমার উদাস ভাব অস্থিরতায় পরিবর্তিত হতে লাগল। প্রতি প্রভাত ও সন্ধ্যায় সে ছাদে উঠে সমুদ্রের দিকে দেখতে থাকে। বন্দরে আগত প্রতি জাহাজ তাকে দূর থেকে আবুল হাসানের আগমনীর সন্দেশ দিত। ভৃত্যকে রোজ কয়েকবার সে বন্দরে পাঠাতো। যখন সে নিরাশ দৃষ্টি নিয়ে ফিরে আসত, সলমা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করতো- তুমি ভাল করে দেখেছিলে? সম্ভবতঃ ওদের মধ্যে কোন আরব ছিল।

ভৃত্য উত্তর দিত- জাহাজটি অমুক স্থান থেকে এসেছে। আমি তন্ন তন্ন করে খোঁজ নিয়েছি। ওদের মধ্যে কোন আরব নেই।

আশা-নিরাশায় দোলায়মান ডুবন্ত মানব যে রূপ তৃণের আশ্রয় খোঁজে, তেমনি সে বলতো- তুমি মাল্লাদের জিজ্ঞেস করতে। হয়ত তারা পথে কোন বন্দরে আরবদের জাহাজ দেখেছে বা তাদের সম্বন্ধে কিছু শুনেছে?

ভৃত্য আবার দৌড়ে বন্দরে যেত। সলমা ভগ্ন আশার ধ্বংস স্তূপের উপর নতুন হর্ম্য প্রস্তুত করত। বৃদ্ধ ভৃত্যের বিষন্ন চেহারা পুনরায় নৈরাশ্যজনক খবর নিয়ে আসত এবং সলমার আশার প্রাসাদ চৌচির হয়ে পড়ে যেত। প্রতি প্রভাবে সে নতুন আশা নিয়ে বুক বাঁধত। সাঁঝের সূর্য যখন সমুদ্রের জলে ডুবে যেত, তার হৃদয়ে তখন গভীর অন্ধকার ঘনিয়ে আসত। তার অশ্রুজল তার বাগ মানত না।

বহুদিন পর্যন্ত সলমা তলহা বা নিজের বাপের কাছে তার মনের অবস্থা প্রকাশ করেনি। কিন্তু এক সন্ধ্যায় তার ব্যবহার দেখে তাঁদের মনে সন্দেহ জাগে। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল এবং আবদুল্লাহ্ ও তলহা বারান্দায় বসে কথাবার্তা বলছিলেন। সলমা ঘরের জানালায় বসে বৃষ্টি পড়া দেখছিল। কথায় কথায় আবুল হাসানের কথা এসে পড়ল। আবদুল্লাহ্ বললেন- আল্লাহ্ জানে তিনি এখনো ফিরছেন না কেন- আট মাস তো হয়ে গেল।

তলহা বললেন- আল্লাহ্ যতি তাঁকে সমুদ্রের বিপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন তবে তাঁর না আসার একমাত্র কারণ হতে পারে তিনি কোথাও জিহাদ করতে চলে গেছেন।

আবদুল্লাহ্ বললেন- আজ আমাকে দিলীপ সিংহ বলেছেন এখান থেকে তিন মাইল দূরে মালাবারের একটি জাহাজ ডুবে গেছে। শুধু একটি নৌকা পাঁচজন আরোহী নিয়ে কূলে পৌঁছেছে।

তলহা জিজ্ঞেস করলেন- জাহাজে কত লোক ছিল?

বোধ হয় বিশজন। জাহাজ তো বেশ বড় ছিল এবং তাতে অনেক পণ্যও ছিল। কি করে ডুবলো?

তীর নিকটে দেখে মাল্লা কিছুটা বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল। এক নিমজ্জিত প্রবাল শৈলে ধাক্কা লেগে জাহাজটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়।

সলমা পাশের ঘরে বসে নিজের চিন্তায় মগ্ন ছিল। মাত্র শেষের কথাটি তার কানে গেল। মুহূর্তের জন্য তার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন জমে গেল।

বারান্দা থেকে আবার আবদুল্লাহর শব্দ এলো-এসব মগ্ন শৈল বড়ই ভয়ংকর। প্রতি বছর এর কারণে বহু জাহাজ ডুবে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করে যে শৈলগুলো দেব মন্দির।

শোনামাত্র সলমার স্নায়ুতন্ত্রে এক ভীষণ উত্তেজনার তড়িৎপ্রবাহ বয়ে গেল। ঘর হতে বের হয়ে সে পিতার সামনে এসে দাঁড়াল। তার রক্তহীন ভয়-কাতর মুখের দিকে চেয়ে তার পিতা জিজ্ঞেস করলেন- মা, তোমার কি হয়েছে?

কিছুক্ষণ তার মুখ থেকে কোন শব্দ বের হলো না। তার বিষন্ন শোক-ম্লান উদাস দৃষ্টি যেন বলছিল- আমার কাছ থেকে যা লুকোবার চেষ্টা করছিলে তা আমি শুনে ফেলেছি।

তলহা বিস্ময়ে বলে উঠল- হাঁ মা, কি যে হয়ে গেল!

সলমার শুকনো ঠোঁট কাঁপছিল। বিষন্ন চোখে অশ্রু চক্ চক্ করছিল। সে বলল- বলুন তাঁর জাহাজ কখন ডুবেছে? আপনাকে কে বলেছে? এবং তিনি....? আপনি চুপ করে রইলেন কেন? আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু বলুন। আমি যে কোনো দুঃসংবাদ শুনতে প্রস্তুত আছি। .... শোকাচ্ছ্বাসে তার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছিল।

আবদুল্লাহ্ শংকিত হয়ে বললেন- আমরা মালাবারের এক জাহাজের কথা বলছিলাম। আজ দিলীপ সিংহ আমাকে বলছিলেন....।

তাঁকে বাধা দিয়ে সলমা বলে উঠল- না, না, আপনি আমাকে লুকোচ্ছেন। আমাকে মিথ্যা সান্ত্বনা দেবেন না। একথা বলে সলমা ফোঁপাতে ফোঁপাতে অন্য ঘরে চলে গেল।

বৃদ্ধ পিতা কিছু বুঝলেন- হয়তো বা বুঝলেন না। ক্ষমা-ভিক্ষার দৃষ্টিতে তলহার দিকে চেয়ে তিনি উঠে সলমার ঘরে গেলেন। সলমা বিছানায় মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

বৃদ্ধ পিতার মন অস্থির হয়ে পড়ল। তিনি সলমার পাশে বসে সস্নেহে তার মাথায় হাত রাখলেন। বললেন- মা, তোমার কি হয়েছে?

সলমা উঠে বসল, অশ্রু মুছে নিল। শোক সংবরণের চেষ্টা করতে করতে বলল- কিছু না বাবা, আমাকে মাফ করুন। ভবিষ্যতে কখনো আমাকে কাঁদতে দেখবেন না।

কিন্তু কাঁদবার কি কারণ ঘটল? এরূপ খবর তো আমরা রোজই শুনে থাকি। মালাবারের জাহাজ ডুবে যাওয়ার বিশেষত্ব কিসে?

সলমা ধীর চোখে পিতার দিকে চেয়ে কিছুটা শান্ত হল এবং বলল- আপনি সত্য বলছেন?

আবদুল্লাহ্ খানিকটা বিরক্ত স্বরে বললেন- আমাকে মিথ্যা বলার প্রয়োজন? এতদিন তো আমার কোন কথায় সন্দেহ কর নাই। বিশ্বাস না হয় তলহাকে জিজ্ঞেস করে দেখ?

সলমা লজ্জা ও অনুতাপে মাথা নত করল। বলল- বাবা, আমি মাফ চাচ্ছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি মনে করেছিলাম... আপনারা বুঝি আরবদের জাহাজের কথা বলছেন।

আল্লাহ্ না করুন, আরবদের জাহাজ সম্বন্ধে এরূপ দুঃসংবাদ পেলে মা তুমি কি মনে কর তোমার চেয়ে আমার কম দুঃখ হবে?

সান্ধ্য আহারের পর তলহা, আবদুল্লাহ্ ও তাঁর ভৃত্য 'ইশার নামায' পড়ছিলেন। ঝি বাসন মাজছিল। ইতিমধ্যে বাইরের দরজায় কে করাঘাত করল। সলমা ঝিকে বললো- বোধ হয় যায়েদ এবং কায়েস এসেছে। তুমি বাইরের দরজা বন্ধ করে দাওনি তো?

ঝি বললো- এমন বর্ষায় কে আর আসবে? আমি ফটক বন্ধ করে এসেছি। তাদের আসবার হলে মাগরিবের নামাযে আসতেন না নাকি? তা ছাড়া যায়েদ অসুস্থ। কায়েস বেচারা বৃদ্ধ। সে ঘরেই নামায পড়ে নেবে হয়তো।

কিন্তু কে যেন দরজায় করাঘাত করছে।

আপনার ভুল হয়ে থাকবে। বাতাসে দরজা নড়ছে বোধ হয়।

না, আমি কারো কণ্ঠস্বরও শুনতে পাচ্ছি।

হয়তো....। আমি যাচ্ছি।

সলমার বুক দুরু দুরু করছিল। ঘন অন্ধকারে চোখের সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। বিদ্যুতের ক্ষণিক আলোকে বৃষ্টি হতে আত্মরক্ষা করে ফটক পর্যন্ত পৌঁছুল।

ফটকের বাইরে থেকে কোন শব্দ না পেয়ে তার মন দমে গেল। নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে ভাবছে, এমন সময় কেউ সজোরে দরজা ধাক্কা দিতে দিতে চিৎকার দিল- কে আছেন?

মুহূর্তের জন্য সলমার পা যেন মাটিতে সেঁধে গেল। পরক্ষণেই সে লাফ দিয়ে অগ্রসর হলো এবং দরজা খুলে ছিল। সলমার সামনে এক দীর্ঘকায় ব্যক্তি দাঁড়িয়েছিল। দরজা খুলতেই সে জিজ্ঞেস করল- এটা আবদুল্লা'র বাড়ী?

সলমা জবাব দেয়ার আগেই বিদ্যুৎ চমকালো। আবুল হাসান সলমাকে চিনতে পেরেই ভেতরে প্রবেশ করলেন।

আবুল হাসান বললেন- আহা তুমি? আমার জন্য তোমাকে বৃষ্টিতে ভিজতে হলো বলে আমি দুঃখিত।

সলমা মনে মনে বলল- হায়, তুমি যদি জানতে এই বৃষ্টির ফোঁটাগুলো কত আনন্দদায়ক! তারপর আবুল হাসানকে বলল- চলুন।

আবুল হাসানের কণ্ঠস্বর শুনে তলহা ও আবদুল্লাহ্ তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। আবদুল্লাহ্ বলে উঠলেন- কে? কে?

আবুল হাসান বারান্দার সিঁড়িতে পা রেখে বললেন- জী, আমি। অসময়ে আপনাদের খামাখা কষ্ট দিলাম বলে দুঃখিত।

তলহা জিজ্ঞেস করলেন- বলুন সব ভাল তো? আপনার সাথীরা কোথায়? হাঁ, সব ভাল। আমি তাদেরকে জাহাজে রেখে এসেছি। আমার জানা ছিল না এখানে পৌঁছুতে আমাকে এতো ঝামেলা পোহাতে হবে। পথে একবার আছাড় খেলাম, দু'তিনবার পানিতে পড়ে গেলাম। আপনার বাড়ী মনে করে পাঁচ ছয় বাড়ীর কড়া নাড়লাম। এক বাড়ীতে কয়েকটি বিশ্বস্ত কুকুর আমাকে তাড়া করেছিল।

আবদুল্লাহ্ সলমাকে ডাকলেন। সলমা তখনো আত্ম-সংবিৎ ফিরে পায়নি। বারান্দার বাইরে দাঁড়িয়েছিল।

আজো বৃষ্টির ফোঁটা তার কপোলের অশ্রুধারা ধুয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু এ অশ্রু খুশীর অশ্রু। পিতার ডাক শুনে সে চমকে উঠল এবং তৎক্ষণাৎ বারান্দায় উঠে বললো- কি বাবা?

মা যাও তো, এঁর জন্য শুকনো কাপড় নিয়ে এসো এবং খাবার যোগাড় কর। অন্যান্য মেহমানদের জন্যও খাবার তৈরী কর। আমি তাদের ডেকে আনতে যাচ্ছি।

আবুল হাসান বললেন- আমাদের সবার খাওয়া হয়ে গেছে; আপনি কষ্ট করবেন না।

কাপড় বদলে আবুল হাসান তল্‌হা ও আবদুল্লাহ্'র সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললেন। তাঁর দেরীতে ফিরবার কারণ স্বরূপ তিনি বললেন বসরা থেকে তাঁকে এক অভিযানে আফ্রিকা যেতে হয়েছিল।

সাতদিন পর আবদুল্লাহ্'র সম্মতিক্রমে সলমা ও আবুল হাসান বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হলো।

॥ আট ॥

তিন বছরের মধ্যে আবুল হাসান শহরে একটি সুন্দর বাড়ী নির্মাণ করলেন। নিকটে একটি মসজিদও তৈরী করালেন। দেখাদেখি তার কতিপয় সঙ্গীও এই শহরে স্থায়ী আবাস গ্রহণ করলেন। আবুল হাসান ও তলহার প্রচেষ্টা ...

স্থানীয় অধিবাসীদের কয়েকটি পরিবার ইসলাম গ্রহণ করলো। মুসলমান ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য আবুল হাসান একটি মাদরাসাহ্ স্থাপন করে তল্‌হার উপর শিক্ষাদানের ভার অর্পণ করলেন।

আবদুল্লাহ'র সাহায্যে আবুল হাসান ব্যবসায়ে দ্রুত উন্নতি লাভ করেন। বিয়ের দ্বিতীয় বছরে তাঁর এক পুত্র এবং চতুর্থ বছরে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ছেলের নাম রাখেন খালিদ এবং মেয়ের নাম নাহীদ। দশম বছরে আর এক পুত্রের জন্ম হয়, কিন্তু তিন মাসের মধ্যেই মারা যায়।

খালিদের বয়স যখন সাত এবং নাহীদের পাঁচ, তখন সলমার পিতা কয়েক দিনের জ্বর ভোগের পর পরলোক গমন করেন।

আবুল হাসান ভাগ্যবান ছিলেন। তাঁর অর্থের অভাব ছিল না। স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে তাঁর প্রেম ও স্নেহ ছিল গভীর। কিন্তু এই প্রেম তাঁকে শৃংখলাবদ্ধ করে ঘরে আটকে রাখেনি। প্রায় প্রতি বছর হজ্ব করবার জন্য তিনি দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার বিপদ ও কষ্ট স্বীকার করতেন। পাঁচ পাঁচবার তিনি এশিয়া মাইনর ও আফ্রিকায় অভিযাত্রী মুজাহিদ ফৌজের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

জিহাদ বা হজ্ব থেকে ফিরে তিনি প্রত্যেকবার নিজ সন্তানদের ধর্মশিক্ষা ও যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে পরীক্ষা নিতেন। তীরন্দাজী, ঘোড়দৌড়, তলোয়ার চালনা এবং নৌচালন বিদ্যায় খালিদ পিতার উচ্চতম আশাপূর্ণ করতে সমর্থ হয়েছিল।

তীরন্দাজী ছাড়াও উদ্ধত ঘোড়া দৌড়াবার কৌশল নাহীদ বার বছর বয়সেই শিখে ফেলেছিল। পড়ালেখায় তার অসাধারণ মেধা তল্‌হা স্বীকার করতেন।

রাজার সঙ্গে আবুল হাসানের সম্পর্ক ছিল মধুর। মহারাণী অনেকদিন থেকেই সলমার সখীত্বে আবদ্ধ হয়েছিলেন। সপ্তাহে দু'একবার তিনি পাল্‌কী পাঠিয়ে মা ও মেয়েকে প্রাসাদে দাওয়াত করে নিয়ে আসতেন। রাজকুমারী নাহীদের সাথে এতই ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন যে মাঝে মাঝে নিজেই আবুল হাসানের বাড়ী চলে যেতেন।

রাজকুমার খালিদের চেয়ে বয়সে চার বছরের বড় ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি সব বিষয়ে খালিদকে আদর্শ বলে গ্রহণ করতেন।

একদিন দিলীপ সিংহ রাজার কাছে যুদ্ধবিদ্যায় খালিদের অসাধারণ কৃতিত্বের প্রশংসা করেন।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন- সে কি রাজকুমারের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারবে? দিলীপ সিংহ উত্তর দিলেন- মহারাজ, রাজকুমার আমাদের সকলের গর্বের বস্তু। অপর পক্ষে সে এক যোদ্ধার পুত্র।

কিন্তু তার বয়স তো খুব কম।

দিলীপ সিংহ জবাব দিলেন- আরব মায়েরা যদি শৈশবে নিজ সন্তানকে এভাবে শিক্ষা না দিতেন তা হলে আজ তাঁরা অর্ধেক দুনিয়া অধিকার করতে পারতেন না। আমি

শুনেছি আরব মায়েরা চৌদ্দ বছরের সন্তানকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেন।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন- খালিদের বয়স কত?

মহারাজ, প্রায় বার বছর হবে আর কি?

এদের সন্তানদের এমন কি গুণ রয়েছে যা আমাদের সন্তানদের নেই?

দিলীপ সিংহ বললেন- মহারাজ যদি অসন্তুষ্ট না হন তবে নিবেদন করতে পারি।

রাজা বললেন- বল।

মহারাজ, তাদের ও আমাদের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আমরা অসংখ্য দেবতার পূজারী। তাছাড়া দুনিয়ার যে শক্তিই আমাদেরকে ভীত করে, তাকেই আমরা দেবতার মর্যাদা দিয়ে থাকি। যেমন আমাদের পথে কোন দুর্লংঘ পর্বত পড়লে তাকে জয় করবার চেষ্টা না করে তাকে দেবতা মনে করে পূজা করা আরম্ভ করি। কিন্তু তারা কেবল এক আল্লাহকে মানে। তাঁকে ছাড়া পৃথিবীর যে কোন বৃহত্তম শক্তির কাছেও মাথা নত করা পাপ মনে করে। এছাড়া তাদের বিশ্বাস যে মানুষের অস্তিত্ব মৃত্যুর পরেই নিঃশেষ হয়ে যায় না, বরং মৃত্যুর পর তার এক নব জীবন শুরু হয়। আবুল হাসান একদিন আমাকে বলেছিলেন তাদের একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি খালিদ যখন শাম আক্রমণের জন্য অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন শামের শাসনকর্তা তাঁকে লিখেছিলেন যে, তুমি এক পর্বতের সাথে টক্কর লাগাতে চলছো। তোমার চল্লিশ হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে আমার কাছেই আড়াই লক্ষ সৈন্য রয়েছে- এবং তারা শ্রেষ্ঠ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত।

উত্তরে মুসলিম সেনাপতি লিখেছিলেন- আমি তোমার শক্তি সম্বন্ধে অবগত আছি। কিন্তু তুমি বোধহয় জান না, তোমার সৈন্যদের বেঁচে থাকার আগ্রহ যতখানি, আমার সৈন্যদের মৃত্যুবরণ করার আগ্রহ তার চেয়ে কম প্রবল।

রাজা বললেন- দিলীপ সিংহ, আমি চাই, রাজকুমারের যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষাদানের ভার আবুল হাসানের হাতে অর্পণ করি। তুমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ কর। তিনি যদি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন তবে তাঁকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে রাজি আছি।

দিলীপ সিংহের অনুরোধে আবুল হাসান রাজার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন কিন্তু পারিশ্রমিক নিতে অস্বীকার করলেন।

দু'বছর শিক্ষাদানের পর আবুল হাসান রাজাকে বললেন- এখন আপনার পুত্র যুদ্ধবিদ্যায় এদেশের যেকোন যুবকের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবেন।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন- তীরন্দাজী ও ঘোড় দৌড়ে রাজকুমার এখন খালিদের সমকক্ষ হয়েছে কিনা আমি জানতে চাই। আবুল হাসান জবাব দিলেন- যে বয়সে রাজকুমার খেলনা নিয়ে খেলা করতেন সে বয়স থেকে খালিদ তীর ধনুক চালাতে শুরু করে। যে বয়সে রাজকুমার ভৃত্যের কাঁধে চড়ে চলাফেরা করতেন সে বয়স থেকে খালিদ ঘোড়ার পিঠে বসতে শিখেছে। স্বভাবতই খালিদ একজন যোদ্ধা এবং রাজকুমার একজন শাহ্‌জাদা।

রাজকুমার তলোয়ার চালনায় কেমন?

তিনি খালিদের চেয়ে বয়সে বড়। কাজেই তাঁর বাহুও অধিকতর শক্তিশালী। আমি তাদের প্রতিযোগিতা করিয়ে দেখিনি। তবে আমার মনে হয় যে খালিদের তুলনায় রাজকুমার অল্পায়াসে তলোয়ার ঘোরাতে পারেন।

রাজা রাজপুত্রকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন- কেমন রাজকুমার, গুরুপুত্রের সাথে তলোয়ার চালনায় দু'হাত দেখাতে রাজি আছো?

রাজকুমার জবাব দিলেন- না বাবা, সে আমার ছোট ভাই। আমি হেরে গেলে লজ্জিত হব। সে হেরে গেলেও আমি লজ্জা পাব।

॥ নয় ॥

আবুল হাসানের বিয়ের পর আঠার বছর অতিবাহিত হয়েছে। এখন খালিদের বয়স ১৬ বছর এবং নাহীদের বয়স ১৪ বছর। খলীফা ওলীদ সিংহাসনে আরোহণের পর মুসলিম বিজয়- অভিযানের নতুন পর্যায় আরম্ভ হয়েছে।

একদিন সিন্ধী ব্যবসায়ীদের এক জাহাজ এলো। তাদের সাথে উসমানের এক খৃষ্টানও ছিল। সিন্ধুর ব্যবসায়ীরা লংকাবাসী আরবদের কাছে তুর্কিস্তান ও উত্তর আফ্রিকায় মুসলমানদের গৌরবময় বিজয় অভিযানের উল্লেখ করে। উসমানের ব্যবসায়ী এসব সংবাদের সত্যতা সমর্থন করে। আবুল হাসান ও কয়েকজন সঙ্গী হজ্বে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এখন হজ্বের ইচ্ছার সাথে জিহাদের আগ্রহ যুক্ত হলো।

রাজা বহিরাগত ব্যবসায়ীদের মুখে নতুন রাজ্যসমূহের খবর সাগ্রহে শুনতেন। মুসলমানদের নব নব বিজয় কাহিনী শুনে তিনি আবুল হাসানকে ডেকে খলীফা এবং ইরাকের শাসনকর্তাকে স্বর্ণ ও জওয়াহিরাতের কিছু কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

আবুল হাসান বললেন- আমি সানন্দে আপনার উপঢৌকন তাঁদের কাছে নিয়ে যাব।

সিন্ধুর ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্য বিক্রয় ও নতুন পণ্য ক্রয় করে ফিরে গেল। তাদের যাবার কিছুদিন পর আবুল হাসান ও তাঁর সাথীরা হজ্বে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। লংকা দ্বীপের নও মুসলিম ছাড়াও এ বছর হজ্বগামী আরবদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী ছিল।

তলহা ছাড়া তিনজন মাত্র আরব ব্যবসায়ী হজ্বগামীদের বাড়ীঘর দেখাশোনা করার জন্য রয়ে গেলেন। কোন কোন আরব ছোট ছোট শিশুদের তলহার তত্ত্বধানে রেখে স্ত্রীদের সাথে নিয়ে চলে গেলেন। অপর কয়েকজন স্ত্রী পরিবার রেখে চলে গেলেন।

আবুল হাসান স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া স্থির করেছিলেন। যাত্রার তিনদিন আগে সলমা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। কাজেই তার অভিপ্রায় পরিবর্তিত হয়।

ঈগল ছানার পাখা গজাবার পর যে রকম অস্থিরভাবে বাসায় বসে নীল আকাশে উড়বার স্বপ্নে বিভোর থাকে, খালিদ তেমনি কার্যক্ষেত্রে নিজের শৌর্যবীর্য ও কৃতিত্ব

দেখবার জন্য প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু সলমার রোগ তাকে ঘরে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য করল। আবুল হাসান প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি ফিরবার পরই তাকে আরব ভ্রমণে পাঠিয়ে দেবেন।

যাত্রার দিন সলমার ভীষণ জ্বর ছিল। অসহ্য কষ্ট সত্ত্বেও সে বিছানায় শুয়ে থাকতে পারল না। স্বামীকে বিদায় দেয়ার পূর্বে মিনতিপূর্ণ চোখে সে বলল- দেখুন আমি বেশ ভাল আছি। আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন। আপনার ওয়াদা ভুলবেন না।

বিষণ্ন স্বরে আবুল হাসান জবাব দিলেন- না সলমা, তা হয় না। জাহাজে মিয়াদী জ্বর তোমাকে ভীষণ কষ্ট দেবে। তুমি সুস্থ হয়ে উঠলে পরের বার তোমাকে সাথে করে নিয়ে যাব। তোমার শুশ্রূষার জন্য আমি খালিদ ও নাহীদকে রেখে যাচ্ছি। তলহাও তোমার দেখাশোনা করবে।

অশ্রুপূর্ণ চোখে সলমা আবার বলল- না, না আমাকে আপনার সাথে অবশ্যই নিয়ে যান। আপনার সাথে থাকলে আমি সব রকম কষ্ট সহ্য করতে পারি।

আবুল হাসান বললেন- সলমা, জিদ কর না। দেখ তোমার নাড়ী কেমন দ্রুত চলছে। জ্বরের চোটে তোমার মুখ লাল হয়ে গেছে। তুমি কখনো সমুদ্র যাত্রা করনি। আমি শীঘ্রই ফিরে আসব।

না, আমার মনে হচ্ছে এবার আপনার সফর খুব দীর্ঘ হবে। হয়ত আমি ততদিন প্রতীক্ষা করতে পারব না।

আবুল হাসান বিষণ্ন স্বরে বললেন- সলমা তুমি কাঁদছ? কয়েক বছর আগে তোমাকে আমি বলেছিলাম, মুসলিম নারীরা জিহাদ-যাত্রীদের বিদায়কালে অশ্রুবর্ষণ করে না।

এ কথায় যেন যাদুমন্ত্রের ফল হলো। সলমা অশ্রু মুছে ফেলে মুখে হাসি টেনে আনার চেষ্টা করে বললো- আমার দুঃখের কারণ এ নয় যে আপনি যাচ্ছেন বরং আপনি আমাকে ফেলে যাচ্ছেন বলেই আমার দুঃখ। আপনি যদি একবার আমাকে জিহাদের ময়দানে নিয়ে যেতেন তাহলে হয়ত আমার দুর্বলতা নিয়ে আর খোঁটা দিতেন না। আপনার সাথে আমি তীরের ঝড়ের মাঝে দাঁড়াতে পারি। কিন্তু আপনার প্রতীক্ষায় প্রতিদিন প্রভাত ও সন্ধ্যায় ছাদে উঠে সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকা অত্যন্ত কষ্টকর।

আবুল হাসান বললেন- কিন্তু এই ধৈর্যই নারীদের জিহাদ। পুরুষেরা যে কাজ যুদ্ধক্ষেত্রে করতে পারে না, নারীরা ঘরের মধ্যে বসেই তা করতে পারে। মেয়েরা খালিদ বা মুসান্না হতে পারে না। কিন্তু তারা মাতা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। আমাদের যোদ্ধারা আজ বাড়ি হতে বহু দূরদেশে যুদ্ধ করেছে। তাদের সাহস ও মনোবল সেই সব নারীই সুদৃঢ় রাখেন, যারা ধৈর্য ও সাহসের সাথে গৃহের মধ্যে মা, বোন ও স্ত্রীর দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করছেন। এদের উপর বিশ্বাস থাকায় যুদ্ধে রত সিপাহীদের মন কখনো ছোট ভাই বা সন্তানদের চিন্তায় অস্থির হতে পারে না। সলমা তুমিই বল, যে সিপাহীর মনে এরূপ চিন্তার উদয় হয় যে, তার স্ত্রী কেঁদে কেঁদে হয়ত অন্ধ হয়ে গেছে

কিংবা ছেলেমেয়েরা হয়ত পথে পথে মাথা খুঁড়ে মরছে, সে কি কখনো বীরের ন্যায় হাসিমুখে প্রাণ দিতে পারে? ধরো আমি যদি না-ই ফিরি, তুমি কি আরব দেশের অন্যান্য মাতার ন্যায় খালিদকে জিহাদে পাঠাবে না?

সলমা জবাব দিল- আপনি বিশ্বাস করুন, খালিদের কু-পিতা হওয়া যদি আপনি পছন্দ না করেন, তবে আমিও তার কু-মাতা হতে পছন্দ করব না। সন্ধ্যার সময় আবুল হাসানের জাহাজ যাত্রা করল।

সলমা নাহীদকে নিয়ে ছাদে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকাচ্ছিল। আত্ম সংবরণের চেষ্টা সত্ত্বেও তার অশ্রু বাধা মানল না।

নাহীদ বলল- আম্মা, আপনি বাবার কাছে ওয়াদা করেছিলেন, আমাদের সামনে কখনো অশ্রু ফেলবেন না।

চোখের জল মুছতে মুছতে সলমা জবাব দিল- হাঁ মা, কিন্তু হায়, এ যে আমার সাধ্যাতীত। তোমার বাপের তুলনায় আমার মন অত্যন্ত দুর্বল।

এ কথা বলে সলমা নীচে বসে পড়ল।

নাহীদ তার নাড়ীর উপর হাত রেখে বলল- আম্মা, আপনার এখনো জ্বর রয়েছে। আপনি বিছানায় শুয়ে পড়ুন।

লংকার রাজ দরবারে

॥ এক ॥

লংকা দ্বীপের মহারাজা সিংহাসনে আসীন। সিংহাসনের নীচে, দক্ষিণে ও বামে আবলুস কাঠের চেয়ারে সভাসদগণ পদ-মর্যাদানুসারে বসেছেন। রাজার ডান দিকের প্রথম কুরসী রাজকুমার উদয়রামের। রাজকুমার সুপুরুষ ও সম্ভ্রমশীল যুবক। চেয়ারের পিছনে কতিপয় রাজ-কর্মচারী করজোড়ে দন্ডায়মান। চোবদার প্রবেশ করে কুর্ণিশ করে নিবেদন করল- মহারাজ, দিলীপ সিংহ দরবারে হাজির হওয়ার অনুমতি চাইছেন।

রাজা ব্যস্ত হয়ে বললেন- দিলীপ সিংহ ফিরে এসেছে? আবুল হাসান ও তার সঙ্গীরা কোথায় গেল?

চোবদার জবাব দিল- তাদের কেউ ওঁর সঙ্গে নেই। এক আরব যুবক আছেন, তিনিও আপনার সাথে দেখা করতে চান।

রাজা অস্থির হয়ে বললেন- তাদের ডেকে নিয়ে এস।

চোবদার ফিরে আসার একটু পরেই দিলীপ সিংহ এক বিশ কি বাইশ বছরের আরব যুবকের সাথে দরবারে প্রবেশ করলেন। দিলীপ সিংহের হাতে একটা চাঁদির তশ্‌তরী ছিল- যার উপর ছিল একখানা ছোরা। ছোরার হাতল নানা রংগের জওয়াহিরাতে মোড়া ছিল। একটি স্বর্ণের কৌটাও চকমক করছিল। দরজা হতে সিংহাসন পর্যন্ত দিলীপ সিংহ তিনবার শির নত করে সম্মান প্রদর্শন করলেন। অগ্রসর হয়ে রাজার সামনে তশ্‌তরী হাতে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে রাজা, রাজকুমার এবং অন্যান্য সভাসদগণের দৃষ্টি তাঁর সাথী আরব যুবকের প্রতিই বেশী আকৃষ্ট হয়েছিল।

যে সময়ের কথা বলছি তখন মরুবাসী আরব জাতির ইতিহাসের স্বর্ণ-যুগ। কয়েক বছর পূর্বে ইসলামী বিজয় প্লাবনের সামনে অধর্মের সবচেয়ে শক্তিশালী কেল্লা নতি স্বীকার করেছে। তাদের বিজয় বাহিনী এক প্রবল বন্যার মত সমুদয় বাঁধা-বিঘ্নকে তৃণের ন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তুর্কিস্তান, আরমেনিয়া এবং উত্তর আফ্রিকার ময়দানে আরব অশ্বারোহীরা তীব্র বেগে অগ্রসর হচ্ছিল। বিজয়-প্লাবনের এক তরঙ্গ পূর্বদিকে মকরাণ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। তখন ছিল সেই যুগ, যখন পার্শ্ববর্তী রাজ্যের বাসিন্দারা প্রত্যেক আরবের চেহারায় সিকান্দরের ভাগ্য, আরিসত্যের প্রজ্ঞা এবং সুলায়মানের ঐশ্বর্য দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। ভূ-পৃষ্ঠের এক দরিদ্র জাতি ইসলামের ঐশ্বর্যে ধনবান হয়ে পৃথিবীর চোখে যে উচ্চ সম্মান লাভ করেছিল, তা আজ পর্যন্ত কোনো জাতির ভাগ্যে হয়ে ওঠেনি।

লংকার রাজ দরবারে যে যুবক দন্ডায়মান ছিল, তার বাপ-দাদারা ইয়ারমুক এবং

কাদিসিয়ার যুদ্ধে প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের দু'টি রাজশক্তিকে পরাজিত ও পদানত করেছিল। তার বলোদৃপ্ত ও বীরত্বব্যঞ্জক চেহারা দেখার পর তার চরিত্র সম্বন্ধে কোন কৌতুহল জাগে না। রাজা ও সভাসদগণ এক দৃষ্টিতেই তার বাহ্যিক ও আন্তরিক অসংখ্য সৌন্দর্যের গুণগ্রাহী হয়ে পড়েছিলেন। সে বীর পদক্ষেপে দরবারে অগ্রসর হতে লাগল। দর্শকদের চোখে তার দেহের প্রতিটি সঞ্চালন গভীর আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দিচ্ছিল। তার ওষ্ঠ সঞ্চালিত হতেই উপস্থিত সকলের সারা দেহ যেন শ্রবণেন্দ্রিয়ে পরিণত হল। 'আসসালামু আলায়কুম' সম্ভাষণে শব্দগুলো অনেকক্ষণ পর্যন্ত সভাসদদের কানে গুঞ্জরিত হল। রাজকুমার সহাস্যে 'ওআলায়কুমুস সালাম' বলে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সামন্তও উঠে দাঁড়ালেন। রাজকুমার করমর্দন করার জন্য হাত বাড়ালেন। অন্যান্য সরদারগণ দরবারের রীতি বিস্মৃত হয়ে একে একে অগ্রসর হয়ে আগন্তুকের সাথে করমর্দন করতে লাগলেন। রাজকুমার সাদরে তাঁকে নিজের পাশে বসালেন এবং ভাঙ্গা ভাঙ্গা আরবীতে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

রাজকুমার জিজ্ঞেস করলেন- আপনার নাম?

আগন্তুক জবাব দিল- যুবায়র।

আপনি কোথা থেকে আসছেন?

বসরা থেকে।

আবুল হাসান ও তাঁর সঙ্গীদের খবর পাওয়া গেছে কি?

যুবায়র উত্তর দিলেন- না, আমার ভয় হচ্ছে যে, 'পথে তারা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছেন।

রাজকুমারের চেহারা বিষণ্ন হয়ে গেল।

রাজা অনেকক্ষণ স্থির করতে পারলেন না যে, রাজকুমারের কথায় তার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত কি অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত। উপস্থিত সকলের দৃষ্টি সিংহাসনের পরিবর্তে আরব যুবক ও রাজকুমারের দিকে নিবদ্ধ ছিল। এই পরিস্থিতি রাজার কাছে অদ্ভুত ঠেকছিল। কিন্তু নিজের একমাত্র পুত্রের মুখে আরবী কথা শোনার আনন্দ তাঁর বিরক্তির চেয়ে প্রবলতর ছিল। অবশেষে তিনি বললেন- আপনার সাথে দেখা হওয়ায় অত্যন্ত আনন্দিত হলাম।

যুবায়র বললেন- ধন্যবাদ। লংকার রাজাকে আমাদের খলীফা এবং ইরাকের শাসনকর্তা সালাম পাঠিয়েছেন।

কথাটি আধা আরবী ও আধা লংকার ভাষায় বলা হল। রাজা ও যুবরাজের মুচকি হাসি দেখে সমস্ত সভাসদ হেসে উঠলেন।

রাজা বললেন- আপনি আমাদের ভাষা কোথায় শিখলেন?

যুবায়র দিলীপ সিংহের প্রতি ইঙ্গিত করে জবাব দিল- ইনিই আমার শিক্ষক। রাজা এবং সভাসদগণ এবার দিলীপ সিংহের প্রতি মনোযোগ দেওয়া দরকার মনে করলেন।

রাজা বললেন- হাঁ দিলীপ সিংহ, আবুল হাসানের খবর পাওয়া গেল?

দিলীপ সিংহ জবাব দিলেন- মহারাজ, এ বছর আমাদের দেশের কোন জাহাজ আরব দেশের কোন বন্দরে পৌঁছেনি। বসরা, মক্কা, মদীনা এবং দামেশ্‌কের প্রত্যেক স্থানেই তাদের কারো না কারো আত্মীয় স্বজন ছিল। কিন্তু, সকলেই বলেন তাঁরা হজ্বে পৌঁছেন নি। ফিরতি পথে আমি প্রতি বন্দরে তাঁদের খোঁজ নিয়ে এসেছি। কিন্তু মনে হচ্ছে সিন্ধু উপকূলে তাদের জাহাজ কোন বিপদে পতিত হয়েছে। মহারাজ খলীফা এবং ইরাকের শাসনকর্তাকে যেসব উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন তাও তাঁদের কাছে পৌঁছেনি। তা সত্ত্বেও তাঁরা মহারাজকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আমি তাঁদের পক্ষ থেকে এসব উপঢৌকন আপনার জন্য নিয়ে এসেছি। এই সোনার কৌটাতে একটি হীরক রয়েছে। ওটা দামেশ্‌কের বাদশাহ্ পাঠিয়েছেন; এবং এই খঞ্জরটি ইরাকের শাসনকর্তা পাঠিয়েছেন। আমি আটটি তাজী ঘোড়াও এনেছি। চারটি শ্বেত বর্ণের দিয়েছেন বাদশা; এবং অপর চারটি গাঢ় বাদামী রংয়ের পাঠিয়েছেন ইরাকের শাসনকর্তা। ঘোড়াগুলো রাজ আস্তাবলে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রাজা হাত বাড়িয়ে সোনার কৌটা খুলে নিয়ে অনেকক্ষণ উজ্জ্বল হীরকটি পর্যবেক্ষণ করলেন এবং পরে ছোরাটি নিয়ে হাতলের প্রশংসা করলেন। তারপর উভয় উপহার রাজকুমারের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে রাজা বললেন- দেখ রাজকুমার, এই উপহার এমন রাজার কাছ থেকে এসেছে, যাঁর লোহা সব লোহাকে কেটে ফেলে। যাঁর রাজত্বে বহু নদী, পর্বত ও সমুদ্র রয়েছে। যাঁর সৈন্যরা পাথরের কিল্লাকে মাটির ঢিবি মনে করে এবং ঘোড়ায় চড়ে নদী পার হয়ে যায়। এই খঞ্জর পাঠিয়েছেন ইরাকের শাসনকর্তা, যাঁর নাম শুনলে বড় বড় রাজারা ভয়ে কাঁপেন।

রাজকুমার অন্য চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তিনি উপহার দু'টি উজিরের হাতে তুলে দেন। লংকার সরল রাজা উপহারগুলোকে দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান বস্তুরূপে গণ্য করছিলেন। জিনিসগুলো পর পর সমস্ত সভাসদদের হাত ঘুরে আবার রাজার কাছে পৌঁছল। তিনি একবার খঞ্জরের হাতল পরীক্ষা করে, একবার কৌটা খুলে হীরকটি দেখেন। অবশেষে তিনি যুবায়রের দিকে তাকিয়ে বললেন- আমার ইচ্ছা হয় আপনাদের রাজাকে স্বচক্ষে দর্শন করি।

যুবায়র বলল- আমাদের কোন রাজা নেই।

রাজা স্মিত হেসে বললেন- আবুল হাসানও এ কথাই বলতেন- মুসলমান কাউকে রাজা বানায় না। আহা, বেচারা কত ভাল লোক ছিলেন। কর্মে বীর, কথায় অটল। তাঁর কন্যা কত গভীর শোক পাবে। আর সেই আবদুর রহমান এবং ইউসুফ কি ভদ্রলোক ছিলেন। বিধাতা জানেন, এ খবর শুনে তাঁদের পুত্র কন্যাদের কি অবস্থা হবে। আপনি তাঁদের সাথে দেখা করেছেন?

জ্বী না, আমি সোজা আপনার কাছে চলে এসেছি। যুবায়র পকেট থেকে একখানা

চিঠি বের করে রাজাকে দিতে দিতে বলল- এই চিঠিখানা বসরার শাসনকর্তা দিয়েছেন।

রাজা দিলীপ সিংহকে ইঙ্গিত করায় তিনি যুবায়রের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে খুলে রাজাকে তার অনুবাদ শোনাতে থাকেন।

'মহারাজকে বসরার শাসনকর্তা সালাম জানাচ্ছেন। আরব ব্যবসায়ীদের বিধবা স্ত্রী ও এতিম সন্তানদের প্রতি মহারাজের সুব্যবহারের জন্য তিনি কৃতজ্ঞ। তিনি ইচ্ছা করেন মহারাজা যেন এসব বিধবা নারী ও এতিম ছেলেমেয়েদেরকে বসরা পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। তিনি আপনার দূতের সাথে জনৈক সেনাপতিসহ এক জাহাজ পাঠাচ্ছেন। তিনি আশা করেন আপনি অতি শীঘ্র তাদের যাত্রার বন্দোবস্ত করবেন। বসরার শাসনকর্তা মনে করেন, আবুল হাসান ও তার সঙ্গীগণ ভারতের পশ্চিম উপকূলে কোন দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছেন। তাঁদের জাহাজ কোন জলদস্যু কর্তৃক নিমজ্জিত হয়েছে বলে সন্ধান পাওয়া গেলে অবিলম্বে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।'

চিঠির মর্ম শোনার পর রাজা কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকেন। যুবায়র রাজকুমারের দিকে তাকাল। কিন্তু অশ্রু-সজল চোখে ছাদের দিকে চেয়েছিলেন। যুবায়র বলল- আপনি অত্যন্ত বিমর্ষ হয়েছেন। মনে হচ্ছে আবুল হাসানের সাথে আপনার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল।

রাজকুমারের ঠোঁট কাঁপছিল। তাঁর অশ্রু-সংবরণের চেষ্টা ব্যর্থ হলো। কোন কথা না বলে তিনি আসন ত্যাগ করে পিছনের কামরায় চলে গেলেন।

আবুল হাসানের সাথে রাজার নিজেরও মৈত্রী সম্পর্ক ছিল। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ রাজার কাছেও কম শোকাবহ ছিল না। কিন্তু মুসলিম খলীফার দূতের উপস্থিতি তাঁকে আত্মসংবরণ করতে বাধ্য করে। রাজকুমার উঠে যাবার পর তিনি যুবায়র ও দিলীপ সিংহ ছাড়া সমস্ত সভাসদকে বিদায় দেন এবং যুবায়রকে বলেন- আবুল হাসানের সাথে রাজকুমারের গভীর বন্ধুত্ব ছিল। আমিও তাঁকে নিজের ভাইয়ের মত মনে করতাম। তাঁর মৃত্যুতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু এটা নিশ্চয় করে বলা চলে না যে, তিনি ও তাঁর সঙ্গীগণ মারাই গিয়েছেন। এও হতে পারে যে, জলদস্যুগণ তাঁদেরকে বন্দী করে রেখেছে। আমার সবচেয়ে বেশী দুঃখ হয় বেচারী নাহীদের জন্য। এখনো তার মায়ের শোক ভোলেনি। এখন এ আঘাত তার জন্য হবে অসহ্য।

যুবায়র জিজ্ঞেস করে- নাহীদ কে?

রাজা জবাব দেন- সে আবুল হাসানের একমাত্র কন্যা। আমিও তাকে নিজের কন্যার মত মনে করি। অত্যন্ত ভালো মেয়ে। তারপর দিলীপ সিংহকে লক্ষ্য করে বলেন- এঁকে অতিথিশালায় নিয়ে যান। দেখবেন এঁর যেন কোন কষ্ট না হয়। আমি রাজকুমারীকে ছেলেমেয়েদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য আবুল হাসানের বাড়ী পাঠাচ্ছি।

যুবায়র বলল- আমি সোজা এখানে চলে এসেছিলাম। সেই ছেলেমেয়ের সাথে এখনো দেখা হয়নি।

বেশ। দিলীপ সিংহ, এঁকে তাদের কাছে নিয়ে যান।

॥ দুই ॥

প্রাসাদের ফটকে দিলীপ সিংহ ও যুবায়র এক উনিশ-বিশ বছরের যুবককে দেখতে পেলেন। সে দিলীপ সিংহকে দেখতেই জিজ্ঞেস করল- একথা কি সত্য, আব্বার জাহাজ জিদ্দায় পৌঁছেনি?

দিলীপ সিংহ হাত বাড়িয়ে যুবককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন- খালিদ, আমি প্রতি শহরে ও প্রতি বন্দরে তাঁর খোঁজ নিয়েছি। দুঃখের বিষয় তাঁর কোন খবর পাইনি।

খালিদ বলল- আমি এখনি বন্দর হয়ে ফিরছি। কয়েকজন আরব জাহাজী বলছিল যে, তাঁর জাহাজ সিন্ধু উপকূলে ডুবে গেছে। আপনি দেবলের শাসনকর্তার কাছে খোঁজ নিলে হয়ত কোন খবর পেতেন।

দিলীপ সিংহ জবাব দেন- সিন্ধুর রাজা ও তাঁর সহকর্মীগণ বড়ই গর্বিত। আমার আশংকা ছিল, দেবলের শাসনকর্তা আমাকে কোন সন্তোষজনক জবাব দেবেন না। কাজেই আমি নিজে সেখানে যাইনি। মকরানের মুসলমান গভর্ণরকে বলেছিলাম তিনি যেন দূত পাঠিয়ে খবর নেন। দামেস্কে খলীফা এবং বসরায় হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের সাথে দেখা করে ফিরবার পথে আমি আবার মকরানের শাসনকর্তার সাথে দেখা করি। সিন্ধু থেকে তাঁর দূত ফিরে এসেছিল। তিনি আমাকে বলেন, দেবলের শাসনকর্তা সেই জাহাজের কোন খবর জানে না বলে জানিয়েছেন।

খালিদ বলল- আমি বন্দর থেকে সোজা এই পথেই এসেছি। আপনি কি এ খবর আমাদের সব বাড়ীতে পৌঁছিয়েছেন?

না, আমরা ওদিকে যাইনি। আমি একে মেহমানখানায় রেখে তোমার সাথে যাব।

খালিদ যুবায়রকে বলে- আপনার আতিথ্য আমাদেরই অধিকার। আপনি আমার সাথে চলুন। অন্ততঃ মেয়েরা ও শিশুরা আপনাকে দেখে সান্ত্বনা পাবে।

যুবায়র বললেন- চলুন, দিলীপ সিংহ।

তিনি জবাব দেন- যদি সঙ্গত মনে করেন তবে আপনি খালিদের সাথে আসুন। আমি ইতিমধ্যে আপনার অন্যান্য সাথীদের থাকার ব্যবস্থা করে আসি।

যুবায়র খালিদের সাথে চললেন। পথে তাকে জিজ্ঞেস করলেন- তুমি আবুল হাসানের ছেলে?

হাঁ, কিন্তু আপনাকে কে বলল?

আমি সারা পথ দিলীপ সিংহকে তোমাদের কথা জিজ্ঞেস করতে করতে এসেছি। তাঁর কথায় আমার মনে তোমার যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে- তুমি তার অনুরূপ। যে ধৈর্যের সাথে তুমি এই শোক সংবাদ গ্রহণ করেছ, তাতে আমি মুগ্ধ হয়েছি। সত্যিই তুমি খালিদ।

মুখে শুষ্ক হাসি টেনে এনে খালিদ বলল- আব্বাজান হজ্জে যাবার সময় আমি সাথে যেতে যিদ করেছিলাম। আম্মার অসুখের জন্য তিনি আমাকে সাথে নিতে পারেননি। সেই একদিন জীবনে আমি প্রথম কেঁদেছিলাম। আমার চোখে অশ্রু দেখে তাঁর বিশেষ দুঃখ হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন- বাবা খালিদ, কখনো কেঁদো না। আমি তোমার নাম সেই বীর মুজাহিদের নামে রেখেছি- আঘাতে রক্তাক্ত হওয়া সত্ত্বেও যার মুখ থেকে কখনো উঃ শব্দটি পর্যন্ত বের হয়নি।

॥ তিন ॥

শহরের এক কোনে নদীর তীরে আরব ব্যবসায়ীদের বস্তি। নদীর উভয় তীরে সবুজ শীর্ষ নারকেল গাছের সারি। কিছুক্ষণ চলার পর খালিদ এক পাথরের দেয়াল ঘেরা বাড়ীর দিকে দেখিয়ে বলল- এটাই আমাদের বাড়ী।

প্রাচীরের ভেতর নারকেল ও কলাগাছের ঘন বাগিচা ছিল। প্রস্তর নির্মিত ছোট দালানের সামনে বাঁশের ছাদ দেওয়া একটি চত্বর। এক সবুজ বেলগাছ তাকে ঢেকে রেখেছিল। বাতাস বন্ধ থাকায় গরম বাড়ছিল। যুবায়র ঘামে ভিজে গিয়েছিলেন। কাজেই খালিদ তাঁকে ঘরে না বসিয়ে চত্বরে বসাল।

যুবায়র বেতের মোড়ার উপর বসলেন। খালিদের ইশারায় একটি কালোপনা ছেলে তাঁকে পাখা করতে লাগল। ছেলেটির চোখে মুখে আনন্দের আভাস দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু যুবায়র খালিদকে বললেন- এ গরমের মধ্যে একে কষ্ট দেওয়া আমাদের উচিত নয়। একে বিশ্রাম করতে দাও।

ছেলেটি আরবী ভাষায় জবাব দিল- আপনি আমাদের মান্য অতিথি। আমাকে সেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন না।

যুবায়র বললেন- আচ্ছা, তুমি দেখি আরবী জান।

ছেলেটির পরিবর্তে খালিদ জবাব দিল- এ ছোটকাল থেকেই আমাদের এখানে আছে। আব্বাজান একে পালন করেছেন।

আরো পরিচয় দিতে গিয়ে বালকটি বলে- আমি মুসলমান। আমার নাম আলী। খালিদ স্থানীয় ভাষায় কিছু বলায় ছেলেটি পাখা রেখে দৌড়ে গিয়ে নিকটস্থ এক নারকেল গাছে উঠল এবং কয়েকটি ডাব পেড়ে আনল।

ডাবের পানি খেয়ে যুবায়র কিছুক্ষণ খালিদের সাথে কথাবার্তা বললেন। পিতার শোকাবহ পরিণামের খবর পাওয়া সত্ত্বেও খালিদ আরবদের সুবিদিত আতিথ্যের খাতিরে যুবায়রের প্রত্যেক কথায় মনোযোগ দিতে চেষ্টা করছিল। তবুও যুবায়র অনুভব করছিলেন যে তার মুখের হাসি অশ্রুপাত ও কান্নার চেয়েও মর্মান্তিক ছিল।

কথা বলতে বলতে খালিদ ওঠে কয়েকবার ফটকের দিকে চেয়ে আলীকে বললো- আলী, নাহীদ এখনো ফিরেনি? যাও তাকে ডেকে নিয়ে এস।

আলী বাইরে চলে গেলে খালিদ যুবায়রকে বললো- মহারাণী ও রাজকুমারী আমার বোনকে খুব ভালোবাসেন। আজ ভোরে তিনি নিজে এসে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। এ দুঃসংবাদ তাকে খুব কাবু করবে। সে আজো আম্মার কবরের কাছে রোজ যায়। আবার এখন ... এ পর্যন্ত বলে সে এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল।

যুবায়র সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন- তোমার মা কখন মারা গেছেন? দু'মাস হয় তিনি মারা গিয়েছেন। আব্বা হজ্বে যাবার পর ছ'মাস ম্যালেরিয়া জ্বরে ভোগেন। তবে আব্বাজানের নিখোঁজ হওয়াটাই তাঁর মৃত্যুর প্রধান কারণ। রোজ ভোরে ও বিকালে তিনি ছাদে উঠে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। দূরে কোন জাহাজ দেখা গেলে তাঁর মুখ আনন্দোজ্জল হয়ে উঠত। খবর নেয়ার জন্য তিনি আমাকে বন্দরে পাঠাতেন। আমি নিরাশ হয়ে ফিরলে দূর থেকে আমাকে দেখেই তাঁর চোখ উল্টে যেত। জীবনের শেষ সন্ধ্যায় তাঁর সিঁড়িতে পা রাখার শক্তিও ছিল না। তাঁর জিদ মত আমরা তাঁর চৌকি ছাদে নিয়ে যাই। বালিশে ভর করে তিনি অনেকক্ষণ সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকেন। দুর্ভাগ্যবশত সেদিন কোন জাহাজ দেখা গেল না। মাগরিবের নামাযের আযান শুনে আমি নিচে নেমে নিকটস্থ মসজিদে চলে যাই। ফিরে এসে দেখি তাঁর শ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। তাঁর চোখ খোলা ছিল। মনে হচ্ছিল যেন তিনি দূর চক্রবালে কোন জাহাজ দেখছেন। নাহীদের মুখে শুনেছি, তার শেষ কথা ছিল- নাহীদ, তোমার বাবা আসবেন, নিশ্চয়ই আসবেন। তিনি অবিশ্বাসী নন। বরং আমি অবিশ্বাসী, তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে পারলাম না।

যুবায়র তাঁর বাইশ বছরের জীবনে তীর বর্শা ছাড়া অন্য বিশেষ কিছু দেখেননি। তিনি ছিলেন এক নির্ভীক নাবিক। ঝড়ের সঙ্গে তাঁর মিতালী। কোমল মধুর বাক্যালাপের সাথে তাঁর পরিচয় কম। খালিদের কথা তাঁর মর্মস্পর্শ করে। তা সত্ত্বেও তিনি উপযুক্ত সান্ত্বনার কথা খুঁজে পান না। তিনি শুধু বলেন- খালিদ, তোমার মায়ের শোকাবহ মৃত্যুতে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। হায়, আমি যদি এ শোকের অংশ নিয়ে তোমার বোঝা খানিকটা লাঘব করতে পারতাম।

আলী দৌড়ে এসে বলল- তিনি আসছেন।

অজ্ঞাতসারেই যুবায়রের দৃষ্টি দরজার দিকে আকৃষ্ট হল। ভাইয়ের পাশে একটি অপরিচিত পুরুষকে দেখে নাহীদ থমকে দাঁড়ায় এবং মুখের ঘোমটা টেনে দেয়। এক মুহূর্ত থেমে সে আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে থাকে।

যুবায়রের কানে একটি মর্মান্তিক প্রশ্ন আঘাত হানে- সত্যিই কি আব্বাজান- শোকোচ্ছাসের দরুণ কথা শেষ হয় না।

যুবায়র নারী সৌন্দর্য ও মহিমার এক অবিস্মরণীয় ঝিলিক দেখে নিয়েছিলেন। তাঁর নয়ন এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। নাহীদ মুখে ঘোমটা টেনে দেয়ার পূর্বেই যুবায়র দৃষ্টি নত করে নিয়েছিলেন।

পিতা-মাতার দৃষ্টান্ত ও পরিবেশের প্রভাবে যুবায়র ছিলেন বিশেষ লাজুক। গভীর আত্ম-প্রত্যয়ে তাঁর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। শৈশবেই পিতার সাথে তিনি দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করেছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে তাকে অভিজ্ঞ নাবিক বলে গণ্য করা হত। দূর বিদেশে তিনি ভিন্ন জাতির এমন সব প্রগলভ মেয়েদের দেখেছেন যাদের মোহিনী দৃষ্টি প্রতিদান খুঁজে বেড়ায়। শাম-ফিলিস্তীনে বহু সপ্রশংস দৃষ্টি তাঁর পৌরষপূর্ণ সৌন্দর্যের গুণ গ্রহণ করেছে। কিন্তু যে যুগের শালীন ও সম্ভ্রান্ত যুবকদের ন্যায় তিনি দৃষ্টি নত রাখতে অভ্যস্ত ছিলেন।

দিলীপ সিংহের সাথে জাহাজ ভ্রমণের সময় যুবায়র প্রত্যেকটি আরব সন্তান সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন করে তাদের একটি মানসিক চিত্র এঁকে রেখেছিলেন। দিলীপ সিংহের কাছে আবুল হাসান ও তাঁর ছেলেমেয়ে সম্বন্ধে যা শুনেছিলেন তাতে তিনি বুঝেছিলেন যে এর চেহারা, গঠন, চরিত্র এবং আকৃতি-প্রকৃতিতে অন্য সবার চেয়ে ভিন্ন হবে। তাঁর আকর্ষণের প্রথম কারণ ছিল এটাই। খালিদের মুখে পরে যা কিছু শুনেছেন তাতে তার কৌতূহল আরো বৃদ্ধি পায়। এর পরে আলী নাহীদকে ডাকতে গেল। তাঁর মনে একটু ব্যাকুলতা জন্মে। তবে তাঁর কৌতূহলের প্রধান কারণ ছিল যে এরা তাঁরই স্বজাতীয় বিপন্ন আরব সন্তান।

বালিকা পুনরায় বলল- আমাকে জবাব দিন। একথা কি সত্যি? আমার কাছ থেকে কি লুকাচ্ছেন? আমি শুনে ফেলেছি।

খালিদ উঠে দাঁড়িয়ে বললো- নাহীদ, তকদীরের বিরুদ্ধে কিছুই করা সম্ভব নয়। শোক সংবরণের প্রয়াস করতে করতে যুবায়র বললেন- দুঃখের বিষয় আমি কোন খোশ খবর আনতে পারিনি।

নাহীদ নীরবে ঘরের দিকে অগ্রসর হল। ধীরে ধীরে কয়েক পা এগিয়ে সে দৌড়ে এক কামরায় ঢুকে পড়ল।

খালিদ এক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পরে যুবায়রের দিকে তাকিয়ে বলল- আমি এখুনি আসছি।

খালিদ দৌড়ে নাহীদের ঘরে প্রবেশ করল। নাহীদ বিছানায় মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। সস্নেহে তার বাহু ধরে এবং মাথায় হাত বুলিয়ে খালিদ বলল- নাহীদ, সবর কর।

আলী কিছুক্ষণ অসাড় হয়ে যুবায়রের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে ঘরের দিকে অগ্রসর হল। দরজা থেকে নাহীদের কান্নার শব্দ তার কানে আসায় দুনিয়ার সবকিছু তার কাছে বিস্বাদ ও বিষণ্ণ মনে হতে লাগল। ভীত চকিত হয়ে সে ঘরে প্রবেশ করল। সভয়ে খালিদের বাহু ছুঁয়ে সে জিজ্ঞেস করল- নাহীদ আপা কাঁদছেন কেন?

খালিদ তার সজল চোখের দিকে তাকিয়ে সস্নেহে তাঁর কাঁধে হাত রেখে বলল- আলী, আব্বাজান আর ফিরে আসবেন না।

মর্মান্তিক চিৎকার করে বালক বলে উঠল- না, না এমন কথা কখনো মুখে আনবেন না। তিনি নিশ্চয় আসবেন।

খালিদ যুবায়রের দিকে তাকিয়ে বলল- ইনি দিলীপ সিংহের সাথে এসেছেন। তাঁর জাহাজ ডুবে গেছে।

আলীর চোখ থেকে অশ্রুর বন্যা ভেঙ্গে পড়ল। ঠোঁট কামড়িয়ে কান্না রোধ করার চেষ্টা করতে করতে সে বের হয়ে গেল। মনের দুঃখ হাল্‌কা করার জন্য সে এমন এক স্থান খুঁজছিল যেখানে কেউ তার কান্নার শব্দ শুনতে পাবে না। কিন্তু বের হয়েই সে প্রতিবেশীর একদল লোকের সামনে পড়ে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আবালবৃদ্ধবণিতা সমস্ত আরব এসে খালিদের উঠানে জড় হল। লোকের গোলমাল শুনে খালিদ বাইরে এলো। একসঙ্গে সকলেই তাকে নানাবিধ প্রশ্ন করতে লাগল।

তল্‌হা সবাইকে শান্ত করে খালিদকে জিজ্ঞেস করলেন- জাহাজ ডুবে যাওয়ার খবর কি সত্যি?

খালিদ মাথা নেড়ে জানাল- সত্যি।

তিনি যুবায়রের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন- আপনিই কি এ খবর এনেছেন?

যুবায়র জবাব দিলেন- দুঃখের বিষয় আমি মৃত্যু সংবাদ বহন করে আনতে পারিনি।

তল্‌হা জিজ্ঞেস করলেন- কি করে জাহাজ ডুবল?

যুবায়র জবাব দিলেন- তা জানা যায়নি।

যুবায়র বিধবা এতিমদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে সান্ত্বনা দিলেন এবং আরবদেশে ফিরে যাওয়া সম্বন্ধে তাদের মতামত জানতে চাইলেন।

বিধবা নারী এবং এতিম শিশুরা সবাই একবাক্যে ফিরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করল।

যুবায়র অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে কথাবার্তা বললেন। অবশেষে আসরের নামাযের আযান শুনে অন্যান্যদের সাথে মসজিদের দিকে অগ্রসর হলেন।

তল্‌হার অনুরোধে যুবায়র ইমামতি করলেন। তাঁরা মসজিদ থেকে বের হয়ে দেখেন রাজকুমার ও দিলীপ সিংহ অপেক্ষা করছেন। খালিদকে দেখে রাজকুমারের কালো চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। অগ্রসর হয়ে তিনি খালিদকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

দিলীপ সিংহ যুবায়রকে বললেন- মহারাজ আপনাকে স্মরণ করেছেন। খালিদ, তুমিও চলো।

যুবায়র বললেন- কিছুক্ষণ আগেই তো তার সাথে দেখা করে এসেছি। কোন বিশেষ কথা আছে কি?

আবুল হাসেমের মৃত্যু সংবাদ মহারাজকে অভিভূত করেছিল। তখন তিনি আপনার সাথে ভাল করে কথা বলতে পারেন নি। যুবায়র বললেন- মনে হচ্ছে রাজকুমারও তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর অশ্রু এখনো শুকায়নি।

দিলীপ সিংহ বললেন- হ্যাঁ রাজকুমারও খুব শোক পেয়েছেন। আবুল হাসান তাঁরও বিশেষ প্রিয় ছিলেন।

॥ চার ॥

রাজ প্রাসাদে যাবার পথে যুবায়র বহু লোকের এক মিছিল দেখতে পেলেন। দিলীপ সিংহ বললেন- মহারাজ আপনার উপঢৌকন ও ঘোড়া পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন। তাঁর হুকুমেই এই ঘোড়ার মিছিল বের করা হয়েছে। এ রাজ্যের বড় বড় মান্য লোকদেরকে ঘোড়ার লাগাম ধরে বাজারের ভেতর দিয়ে চলার সম্মান দেয়া হয়েছে। আবুল হাসানের মৃত্যু শোক না থাকলে হয়ত রাজা নিজেই এ মিছিলে অংশগ্রহণ করতেন।

কাছে গিয়ে যুবায়র দেখতে পেলেন যে রাজ দরবারে যে আটজন সভাসদ সামনের আসনে বিরাজমান ছিলেন তাঁরাই ঘোড়ার লাগাম ধরে জনতার পুরোভাগে চলেছেন। ঘোড়াগুলোকে যে দোশালা পরান হয়েছে তা মূল্যবান পাথর দ্বারা অলংকৃত।

রাজকুমারের মৃদু হেসে যুবায়রের দিকে চেয়ে বললেন- আপনাদের দেশেও কি ঘোড়াকে এরূপ সম্মান করা হয়?

যুবায়র জবাব দিলেন- না, আমরা ঘোড়ার দানা পানির দিকে বেশী লক্ষ্য রাখি।

দিলীপ সিংহ বললেন- আসলে আমরা ঘোড়ার সম্মান করছি না বরং যারা ঘোড়া পাঠিয়েছেন তাঁদের সম্মান করছি।

আকাশে মেঘ জমছিল। বাতাস সুশীতল হয়ে আসছিল। রাজা প্রাসাদের দ্বিতীয় মহলে এক জানালার কাছে বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়েছিলেন। যুবায়র ও তাঁর সাথীদের পদশব্দ শুনে ফিরে তাকালেন এবং দাঁড়িয়ে যুবায়রের সাথে করমর্দন করলেন। পরে খালিদকে সম্বোধন করে বললেন- বৎস, তোমার পিতার মৃত্যুর সংবাদে আমি দুঃখিত। আমার মনে হয় তাঁর জাহাজ ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে গেছে। কিন্তু যদি প্রমাণিত হয় যে কেউ আক্রমণ করে তাঁর জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে, তাহলে আক্রমণকারীর শাস্তির জন্য আমার সমস্ত হাতী এবং সব জাহাজ বসরার শাসনকর্তার হাতে আমি সমর্পণ করব।

সামনের কুরসীর দিকে ইশারা করে রাজা আসন গ্রহণ করলেন। যুবায়র এবং খালিদও বসে পড়ল। দিলীপ সিংহ দাঁড়িয়ে রইলেন।

রাজা দিলীপ সিংহের দিকে তাকিয়ে বললেন- বসো। তুমি অতি মহৎ কাজ করেছ। কাল থেকে তুমি সভাষদগণের পুরোভাগে রাজকুমারের পাশে বসবে।

দিলীপ সিংহ অগ্রসর হয়ে রাজার পদধূলি নিলেন এবং আসন গ্রহণ করলেন। রাজা যুবায়রকে সম্বোধন করে বললেন- আমি বসরার শাসনকর্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করতে চাই না। তবে যদি আরব সন্তানদের নিঃসহায় মনে করে আপনি নিয়ে যেতে চান, তো আমার মনে খুব দুঃখ হবে। আমি তাদেরকে নিজের সন্তানরূপে গণ্য করি। এখানে থাকলে তাদের সমস্ত ব্যয় রাজকোষ হতে বহন করা হবে। আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। তাদের যদি এখানে কোন অসুবিধা হয় তাহলে আপনি অবশ্যই

তাদের নিয়ে যাবেন।

এখানে তাদের কোন অভিযোগ নেই। আমি নিজ সরকার এবং সমস্ত আরবদের পক্ষ থেকে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কিন্তু আমাদের স্বজাতীয় এতিম সন্তানগণ স্বদেশ থেকে এতদূরে পড়ে থাকবে তা' আমরা চাই না। এদের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-দীক্ষা স্বদেশেই সম্ভব। পরে যদি এরা চায়, তবে এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন- আপনি সবাইকে নিয়ে যেতে চান?

না, তলহা এবং কয়েকজন ব্যবসায়ী এখানে থাকবেন।

কিন্তু খালিদ ও তার বোন এখানে থাকবে তো?

না, তারাও আমার সাথে যাবে।

রাজকুমার বিষণ্ণ স্বরে বললেন- না, না। তা হতে পারে না। আমি তাদের যেতে দেব না। খালিদকে আমি নিজের ভাই করে নিয়েছি।

আর নাহীদ আমার বোন- পিছনের কামরার পর্দার আড়াল থেকে মেয়েলী কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। সঙ্গে সঙ্গে একটি চৌদ্দ-পনের বছরের মেয়ে রাজার সামনে এসে দাঁড়াল। রাজকুমারের মতই তার বর্ণ শ্যামল। কিন্তু মুখের গড়ন তার চেয়ে লালিত্যমাখা এবং চোখ তেজোব্যঞ্জক উজ্জল ছিল। খালিদের দিকে তাকিয়ে সে বললো- ভাই মা তোমাকে ডেকেছেন।

খালিদ ওঠে পাশের ঘরে চলে গেল। মেয়েটি চলচে চলতে রাজার দিকে চেয়ে বলল- বাবা, আপনি এদের কথা শুনবেন না কিন্তু।

রাজা যুবায়রের দিকে তাকিয়ে বললেন- দেখলেন তো?

যুবায়র বললেন- বেশ, আমি তাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিচ্ছি। কিছুক্ষণ পরে খালিদ নত মুখে ফিরে এসে বসে পড়ল। রাজা তাকে বললেন ইনি সিদ্ধান্তের ভার তোমার উপরই ছেড়ে দিয়েছেন। এখন বল, এখানে থাকতে চাও কি না?

খালিদ জবাব দিল- আমাদের প্রতি আপনার অনুগ্রহ অসীম। দুনিয়ার আরাম আয়েশ যদি আমার লক্ষ্য হত তাহলে আমি কখনো আপনার কাছ থেকে সরে যেতাম না। কিন্তু বর্তমানে আমাদের জাতি দূর দূরান্তে জিহাদে লিপ্ত আছে। আমার শিরায় এক মুজাহিদের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। আমি শুনেছি বর্তমান প্রয়োজনের খাতিরে আমার চেয়ে কম বয়সী ছেলেও জিহাদে যাচ্ছে। আমি সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকতে চাই না।

নতমুখে কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর রাজা বললেন- বৎস, তুমি আবুল হাসানের পুত্র। তুমি যদি মনস্থির করে থাক, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস দুনিয়ার কোন শক্তি তোমাকে বাধা দিতে পারবে না। ধন্যই সেই জাতি যার মায়েরা তোমার মত পুত্র জন্ম দেয়।

খালিদ বললেন- আমি চাই যে আপনি খুশী হয়ে আমাকে অনুমতি দিন।

রাজা জবাব দিলেন- আবুল হাসানের পুত্রের আনন্দ আমার অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে না।

॥ এক ॥

দশদিন পর। ভোর বেলা। বন্দরে দু'টি জাহাজ যাত্রার জন্য প্রস্তুত। এক জাহাজে যুবায়র বিধবা নারী ও এতিম শিশুদের নিয়ে যাচ্ছিলেন। অপর জাহাজে দিলীপ সিংহ রাজার পক্ষ থেকে হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ এবং খলিফা ওলীদের জন্য হাতী, মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য এবং বিভিন্ন রকমের উপঢৌকন নিয়ে যাচ্ছিলেন। হাতীর সংখ্যা দশ।

রাজা ও যুবরাজ যুবায়র ও তাঁর সাথীদের বিদায় দেয়ার জন্য বন্দরে এসেছেন। বিধবা নারী এতিম শিশুদের প্রত্যেককেই ইতিপূর্বেই তিনি মূল্যবান উপহার দিয়েছিলেন। যুবায়রকে তিনি কয়েকটি জিনিস দিয়েছিলেন। কিন্তু যুবায়র কেবল গন্ডারের চর্মে নির্মিত একটি ঢাল গ্রহণ করেন। রাণী অনেক যিদ করে নিজের বহুমূল্য মুক্তার মালা নাহীদের কণ্ঠে পরাতে পেরেছিলেন। বিদায়ের দিন রাজকুমারী নাহীদের বাড়ীতে এসে বহু চেষ্টা করে স্বীয় হীরক অঙ্গুরীয় তার আঙুলে পরিয়ে দিয়েছিলেন।

বিদায়ের পূর্বক্ষণে বন্দরে এসে রাজকুমার খালিদকে সজল চোখে আলিঙ্গন করেন এবং নিজের মুক্তামালা তার গলায় পরিয়ে দেন।

জাহাজের পাল খুলে দেয়া হল। বাতাসের ধাক্কায় জাহাজ ধীরে ধীরে তীর থেকে সরে যেতে লাগল। শহরবাসী অশ্রু-সজল করুণ নয়নে অতিথিদের বিদায় দিল।

মেয়েদের জন্য জাহাজের একটি প্রশস্ত কামরা নির্দিষ্ট ছিল। তাছাড়া ডেকের উপরও ঘেরাও দিয়ে তাদের জন্য পৃথক চলাফেরার স্থান করে দেওয়া হয়। খালিদ চারদিকে ঘুরে মাল্লাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করছিল। পাটাতনের উপর আলীর সাথে দাঁড়িয়ে নাহীদ তীরে অবস্থিত দীর্ঘ, সবুজ-শীর্ষ নারকেল গাছের দিকে তাকিয়েছিল- যার ছায়ায় তার মুধুর শৈশব কেটেছে।

প্রভাত গিয়ে সন্ধ্যা এল। লংকার উপকূল দিক চক্রবালে কেবল একটি সরু সবুজ রেখায় পরিণত হল। ক্রমে ক্রমে ঘণায়মান সাঁঝের আঁধারে সে রেখাটি অদৃশ্য হয়ে গেল। পৈতৃক দেশ ছেড়ে যাবার বেদনা আলীর মনকেও বিষণ্ন করেছিল। কিন্তু খালিদ ও নাহীদের সঙ্গে যাবার আনন্দ তার দুঃখকে ছাপিয়ে উঠেছিল।

রাত্রিবেলা আকাশ পরিষ্কার থাকায় নারী ও শিশুরা পাটাতনের উপর খোলা হাওয়ায় শুয়েছিল। নাহীদ বহুক্ষণ পর্যন্ত আকাশের উজ্জল তারকার দিকে চেয়েছিল। ঘেরার অপরদিকে খালিদ যুবায়র এবং মাল্লাদের সাথে আলাপ করছিল।

হাশিম নামক একটি আট বছরের ছেলে নাহীদের কাছে শুয়েছিল। তার মা নেই।

বাপ আবুল হাসানের সাথে নিখোঁজ হয়েছে। হাশিম উঠে বসল এবং অন্ধকারে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। নাহীদ জিজ্ঞেস করল- হাশিম, কি হয়েছে।

যে বলল- আলী কোথায়?

সে খালিদের কাছে মাল্লাদের সঙ্গে কথা বলছে।

আমি তাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করে আসছি। এই বলে সে অন্ধকারে আস্তে আস্তে আলীর কাছে চলে গেল। সে আলীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল- আলী, জাহাজ ডুবে গেলে কি হয়?

আলী সরলভাবে জবাব দিল- সমুদ্রের তলায় চলে যায়।

মাল্লারা তা শুনে খিলখিল্ করে হেসে উঠল।

হাশিম বলল- বাঃ, এ তো আমিও জানি। আমি জিজ্ঞেস করি, লোকগুলো কোথায় যায়?

লোকগুলোকে মাছে খেয়ে ফেলে।

মিথ্যা কথা। মানুষে ত মাছ খায়।

আলী আবার বলে- মাটির উপর মানুষে মাছ খায় কিন্তু সমুদ্রে মাছ মানুষ খায়।

হাশিম কিছু বুঝল কিছু বুঝল না। ফিরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

॥ দুই ॥

কিছুদিন পর জাহাজটি মালাবার উপকূলের কাছ দিয়ে চলছিল। পথে খাদ্য ও মিঠা পানি সংগ্রহের জন্য পশ্চিম উপকূলের বিভিন্ন বন্দরে নোঙর করতে হয়েছিল। এ পর্যন্ত যাত্রীদেরকে কোন বিপদে পড়তে হয়নি। মালাবারের এক বন্দরে কয়কজন আরব ব্যবসায়ী যুবায়রকে অভ্যর্থনা করেন এবং দূর দূর যাত্রী ক্লান্ত পথিকদেরকে কয়েকদিন বিশ্রামের সুযোগ দেন। ইতোমধ্যে লংকারাজ্যের মূল্যবান উপঢৌকনের খবর বহু দূর-দূরান্তে প্রসারিত হয়।

বিদায়ের দিন বন্দরের হাকিম যুবায়র এবং দিলীপ সিংহের সাথে দেখা করে তাদের পথে জলদস্যুর বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে উপদেশ দেন। দিলীপ সিংহ উত্তর দেন, আপনি চিন্তা করবেন না। আমাদের জাহাজে যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে।

তৃতীয় দিন উভয় জাহাজের মাস্তুলে অবস্থিত প্রহরী উত্তর চক্রাবালের দিক থেকে অপর দু'টি জাহাজের আগমনবার্তা জ্ঞাপন করে। উভয় জাহাজের চালকগণ ব্যস্ত হয়ে পাটাতনের উপর এসে দাঁড়ান। দিলীপ সিংহের জাহাজ আগে যাচ্ছিল। তিনি জাহাজ থামিয়ে যুবায়রের জাহাজের অপেক্ষা করেন। উভয় জাহাজ কাছাকাছি হলে দিলীপ সিংহ বলেন- আগন্তুক জাহাজ দু'টি জলদস্যুদের নাও হতে পারে। তবুও আত্মরক্ষার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আপনার জাহাজ পশ্চিম দিকে নিয়ে চলুন। আমিই

এদের ব্যবস্থা করব।

যুবায়র জবাব দিলেন- না, বিপদের মুখে আপনাকে একা ফেলে যেতে পারব না।

দিলীপ সিংহ বলেন- আপনার সাহস সম্বন্ধে আমার মোটেই সন্দেহ নেই। কিন্তু শিশুদের প্রাণ রক্ষা করা আমাদের সর্বপ্রথম দায়িত্ব।

যুবায়র জবাব দেন- যদি এরা সত্যিই জলদস্যু হয় তবে সম্ভবতঃ পশ্চিমদিক থেকেও আমাদের পথ বন্ধ করবে। তা'হলে পালাবার চেয়ে সম্মুখ যুদ্ধ করা কম বিপজ্জনক হবে। তাছাড়া বন্ধুদের বিপদের মুখে ফেলে পলায়ন করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

যা আপনার ইচ্ছা। তবে অন্ততঃ মেয়েদের নীচে চলে যেতে হুকুম দিন। একথা বলে দিলীপ সিংহ নিজের সঙ্গীদের নির্দেশ দানে রত হলেন।

যুবায়র খালিদকে বললেন- খালিদ, তুমি মেয়েদের ও শিশুদের নিয়ে নিচে চলে যাও।

উভয় জাহাজের মাল্লাগণ প্রস্তুত হয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুক জাহাজের দিকে তাকিয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পর দিলীপ সিংহ একটি জাহাজের কাল পতাকা চিনতে পেরে চিৎকার দিয়ে বলেন- এগুলো জলদস্যুদের জাহাজ। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

যুবায়র নিজ সঙ্গীদিগকে সম্বোধন করে বলেন- ভাইসব, এই নারী ও শিশুগণ আমাদের কাছে আমানত। এদেরকে নিরাপদে বসরা পৌঁছাবার দায়িত্ব আমাদের। আমি এখন যে যুদ্ধ প্রণালী অবলম্বন করতে যাচ্ছি, এ দায়িত্ব আমাদের উপর না থাকলে সে প্রণালী অন্যরূপ হতো। এক ভয়ংকর কাজের জন্য আমি তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন বীর স্বেচ্ছাসেবক চাই।

সর্বপ্রথম খালিদ ও পরপর প্রত্যেক মাল্লা স্বীয় নাম পেশ কর। যুবায়র বলেন- এ কাজের জন্য দু'জন শ্রেষ্ঠ সাঁতারুর প্রয়োজন। আমি এ কাজের ভার ইব্রাহীম এবং উমরের উপর অর্পণ করছি।

যুবায়রের নির্দেশ মত উভয় জাহাজ থেকে দু'টি নৌকা সমুদ্রে নামান হলো। তাদের সাথে পাল বেঁধে দেয়া হলো। হাতীর খোরাকের জন্য দিলীপ সিংহের জাহাজে অনেক লুকানো ঘাস ছিল। কয়েক বোঝা ঘাস মাল্লারা নৌকায় নামিয়ে দিল। ইব্রাহীম এবং উমর হাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে নৌকায় আরোহণ করল। এরপর যুবায়র ও তাঁর সাথীগণ ধনুক ও কামান সাজিয়ে আক্রমণকারী জাহাজের অপেক্ষা করতে লাগলেন। অগ্রগামী জাহাজের লক্ষ্য দিলীপ সিংহের চেয়ে যুবায়রের জাহাজের দিকেই বেশী ছিল। উমর ও ইব্রাহীমের নৌকাগুলো দীর্ঘ চক্কর নিয়ে আক্রমণকারী জাহাজগুলো পেছনের দিকে পৌঁছে গিয়েছিল।

যুবায়র এদিক-ওদিক দৌড়ে নিজ সাথীদেরকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। প্রথম তীর বর্ষণ হানাদারদের পক্ষ থেকেই এলো। সাঁ করে একটি তীর যুবায়রের গা ঘেঁষে চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে এক নারী কণ্ঠস্বর তাঁর কানে গেল- আপনি কোন নিরাপদ স্থানে বসে পড়ুন। আমরা শত্রুবাণের পাল্লার মধ্যে এসে পড়েছি।

যুবায়র চমকে পিছনে তাকিয়ে দেখেন নাহীদ তীর-ধনুক হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চক্ষু ছাড়া তার সমস্ত মুখ ঘোমটা ঢাকা। যুবায়র বলেন- তুমি এখানে কি করছ? নিচে যাও।

নাহীদ শান্ত স্বরে জবাব দেয়- আপনি আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমি তীর চালাতে জানি। একথা বলে সে অগ্রসর হয়ে এক সৈনিকের কাছে বসে পড়ল।

কিছুক্ষণ তীরের যুদ্ধ চলল।

কিছুক্ষণ তীরের যুদ্ধ চলল। আরো নিকটে পৌঁছে দস্যুগণ জ্বলন্ত বাণ নিক্ষেপ করতে লাগল। অন্যদিকে যুবায়রের নির্দেশ মত ইব্রাহীম এবং উপর স্ব স্ব নৌকা সোজা দস্যুদের জাহাজের দিকে চালিয়ে যাচ্ছিল। নিকটে পৌঁছে তারা জ্বলন্ত মশালের সাহায্যে শুকনো ঘাসে আগুন ধরিয়ে দিল। নিজেরা পানিতে লাফিয়ে পড়ল। দস্যুদল ফাঁদ হাতে করে প্রতিদ্বন্দ্বী জাহাজে লাফিয়ে পড়বার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে নৌকার দিকে মনোযোগী হলো। বাতাসের প্রবল ঝাপটায় আগুনের শিখা জাহাজের পালে লেগে গেল। দিলীপ সিংহের প্রতিদ্বন্দ্বী দস্যু জাহাজ একটু দূরে ছিল। কাজেই সে জাহাজ থেকে যারা ঝাঁপ দিয়েছিল তারা দিলীপ সিংহের তীরন্দাজদের বাণে বিদ্ধ হতে লাগল। কিন্তু যুবায়রের জাহাজ আক্রমণকারীগণ খুব নিকটে পৌঁছে গিয়েছিল। দস্যু-জাহাজে আগুন লেগে যাওয়ায় দস্যুরা দড়ির ফাঁদের সাহায্যে যুবায়রের জাহাজে লাফিয়ে উঠতে চেষ্টা করছিল। আগুনের আশংকায় যুবায়র নোঙর তোলার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আট দশ জন দস্যু যুবায়রের জাহাজে এসে পড়েছিল। যুবায়ররের সাথীরা ভাল করে তাদের খবর নিচ্ছিলেন। হঠাৎ দস্যু জাহাজ থেকে একটি বাণ এসে যুবায়রের বাম বাহুতে বিদ্ধ হলো। নাহীদের ধনুক থেকে একটি বাণ বের হয়ে এক দস্যুর বুকে বিদ্ধ হলো।

যুবায়র বললেন- শাবাশ। নাহীদ ফিরে দেখে যুবায়র ধনুক রেখে দিয়ে বাহু হতে বাণ বের করার চেষ্টা করছেন। নাহীদ তাড়াতাড়ি নিজের কামান রেখে দিয়ে এক হাতে যুবায়রের বাহু ধরল এবং অপর হাতে তীরটি টেনে বের করে নিল। তীর বের হতেই যুবায়রের বাহু হতে রক্তধারা বইতে লাগল। নাহীদ হাতের আস্তিন গুটিয়ে হঠাৎ নিজের ঘোমটা ছিঁড়ে ক্ষতস্থান বেঁধে দিল।

যুবায়রের জাহাজ ফাঁদের পাল্লা থেকে দূরে চলে এসেছিল। জ্বলন্ত জাহাজের মাল্লারা অনন্যোপায় হয়ে পানিতে ঝাঁপ দিচ্ছিল। যুবায়র পুনরায় ধনুক তুলে বলেন- নাহীদ এবার তুমি মেয়েদের কাছে যাও এবং তাদেরকে সান্ত্বনা দাও। আল্লাহর ফযলে আমরা জয়লাভ করেছি।

নাহীদ যেতে যেতে থেমে জিজ্ঞেস করল- আপনার কষ্ট হচ্ছে না তো? না, এ সামান্য

সামান্য যখম। তুমি ভেবো না। বলতে বলতে অজ্ঞাতসারে তাঁর দৃষ্টি নাহীদের মুখের উপর পড়ল। বীরত্বের তেজ তার মুখের লালিত্য আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। নাহীদ অকস্মাৎ অনুভব করল যে তার ঘোমটা নেই। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সে নিচে অন্যান্য নারীদের কাছে চলে গেল।

জ্বলন্ত জাহাজ থেকে কয়েকজন লোক নেমে নৌকায় আরোহণ করল। এক ব্যক্তি, যাকে দস্যুদের নেতা মনে হচ্ছিল, সে শ্বেত পতাকা দোলাতে লাগল। যুবায়র ইঙ্গিতে তীরন্দাজদের নিরস্ত করলেন। উমর ও ইব্রাহীম স্ব স্ব কাজ সমাধা করে জাহাজের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। আগুনের আশংকা থেকে নিরাপদ হয়ে যুবায়র জাহাজের নোঙর ফেলে রজ্জুর সিঁড়ি নামাতে আদেশ দিলেন।

উমর ও ইব্রাহীম জাহাজে উঠে এলো। দিলীপ সিংহের সাথীরা নিমজ্জমান শত্রুর উপর তখনো তীর চালাচ্ছিল। খালিদ ওদিকে যুবায়রের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তিনি তাদেরকে নিরস্ত হতে ইঙ্গিত করলেন। দস্যুরা কিছু আশ্বস্ত হয়ে রুজ্জর সিঁড়ি দিয়ে জাহাজে উঠতে লাগল। সর্বশেষে দস্যু সর্দারের নৌকা উভয় জাহাজের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। একটি বয়স্ক ভীষণকায় লোক যার অর্ধেক দাড়ি পেকে গিয়েছিল, আহত শার্দুলের ন্যায় জাহাজের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল।

সে জাহাজে একটি নব যুবক ও একটি মেয়ের প্রতি যুবায়রের দৃষ্টি পতিত হলো উভয়ের গড়ন, চেহারা ও পোশাক দস্যুদের থেকে ভিন্নতর ছিল।

ভীষণাকৃতি লোকটিকে দস্যু সর্দার মনে করে যুবায়র তার প্রতি ইঙ্গিত করলেন। মাল্লারা দাঁড় বেয়ে নৌকাটি জাহাজের নিকট নিয়ে আসল। আরোহীগণ একে একে রজ্জুর সিঁড়ি দিয়ে জাহাজে উঠে এলো। মেয়েটির চেহারায় রোগ যাতনার চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। সুবেশী পুরুষটি তার হাত ধরে সাহায্য করছিল এবং সে সাবধানে ধীরে ধীরে সিঁড়ির উপর পা রাখছিল।

জাহাজে পৌঁছে যুবকটি এক অজানা ভাষায় কিছু বলে দস্যুদের প্রতি অঙ্গুলি প্রদর্শন করল। তার ভাষা না বুঝেও যুবায়র অনুভব করলেন যে, সে দস্যুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

যুবায়র নিজের সাধ্যমত সিন্ধী ও লংকার ভাষা মিলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিলেন। যুবক ও মেয়েটি তাঁর মিত্রতা অনুভব করে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। বালিকা কিছু বলতে চাচ্ছিল কিন্তু শোকোচ্ছ্বাসে তার কণ্ঠস্বর আটকে গেল। অশ্রুপূর্ণ নয়নে সে যুবায়রের দিকে তাকাল। বালিকার বয়স চৌদ্দ কি পনর বছর মনে হচ্ছিল। সুন্দর চেহারার মধ্যাহ্নের ফুলের ন্যায় মলিন হয়ে গিয়েছিল। যুবায়র পুনরায় উভয়কে সান্ত্বনা দিলেন। সবশেষে দস্যু সর্দার জাহাজে পৌঁছল। তার চোখে অনুতাপের অশ্রুর পরিবর্তে প্রতিশোধের বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল।

অল্পক্ষণের মধ্যে দিলীপ সিংহ যুবায়রের জাহাজে এসে পৌঁছলেন। আসা মাত্র তিনি

দস্যু সর্দারকে মারবার জন্য চাবুক ধরলেন। কিন্তু যুবায়র অগ্রসর হয়ে তাঁর হাত ধরে বাধা দিলেন। দিলীপ সিংহ যুবায়রের আস্তিন রক্তাক্ত দেখে জিজ্ঞেস করলেন- আপনি আহত হয়েছেন?

যুবায়র জবাব দিলেন- অতি সামান্য ক্ষত।

সুবেশী যুবক দিলীপ সিংহের মনোযোগ আকর্ষণ করে তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপে রত হলো। পরে দিলীপ সিংহ দস্যু সর্দারকে কয়েকটি কথা বললেন। তারপর আরবী ভাষায় যুবায়রের সাথীদেরকে বললেন- নৌকায় একটি সিন্দুক আছে, তুলে নিয়ে এসো। চন্দন কাঠের ছোট সিন্দুকটি রশি বেঁধে মাল্লারা উপরে নিয়ে এলো। দিলীপ সিংহ ঢাকনা তুললেন। উপস্থিত সকলে বিস্মিত হয়ে দেখল- সিন্দুকটি স্বর্ণ, মুক্তা ও জওয়াহিরাতে পরিপূর্ণ।

যুবায়র এর রহস্য জানতে চাইলে দিলীপ সিংহ সুবেশী যুবককে আরো কতকগুলো প্রশ্ন করলেন। যুবক তখন নিজের কাহিনী বর্ণনা করল।

॥ তিন ॥

যুবকের নাম জয়রাম। কাঠিয়াওয়াড়ের এক সম্ভ্রান্ত রাজপুত বংশে তার জন্ম। খ্যাতি ও প্রতিপত্তির সন্ধানে প্রথম যৌবনেই সে সিন্ধু দেশে গমন করে। ব্রহ্মণাবাদের এক মেলায় তীর নিক্ষেপে অপূর্ব কৌশল প্রদর্শন করে সিন্ধু রাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাজা তাকে সৈন্য বিভাগে একটি সামান্য চাকরী দিয়ে নিজের কাছে রাখেন। দু'বছর চাকরীর পর জয়রাম দেবলের শাসনকর্তার সহকারী পদ লাভে সমর্থ হয়। দেবলে পৌঁছার এক সপ্তাহের মধ্যেই বাড়ী হতে তার পিতার মৃত্যু ও মাতার অসুখের খবর পেয়ে কয়েক মাসের ছুটি নিয়ে কাঠিয়াওয়াড়ে পৌঁছে। বাড়ী পৌঁছার দশদিন পর তার মাতা মারা যান। বাড়ীতে তখন তার ছোট বোন মায়াদেবী ছাড়া আর কেউ ছিল না। আত্মীয়দের উপদেশ ও মায়াদেবীর অশ্রুপাতের ফলে তাকে সিন্ধু দেশে ফিরে যাবার সংকল্প পরিত্যাগ করতে হয়। কিন্তু চার মাস ঘরে বসে থাকার পর এরূপ নিষ্কর্ম জীবনে তার বিতৃষ্ণা ধরে যায়। একদিন কাঠিয়াওয়াড়ের রাজদরবারে পৌঁছে চাকরীর আবেদন করে।

এ সময় সিন্ধুর রাজা স্বীয় প্রতিপত্তি প্রসারের অভিপ্রায়ে প্রতিবেশী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোকে বিরক্ত করা আরম্ভ করলেন। স্বাধীন রাজা ও সামন্তগণ তার প্রাধান্য স্বীকৃতির প্রমাণ স্বরূপ তাঁকে নিজ নিজ রাজত্বের একাংশ প্রদান করছিল। সিন্ধু-রাজের পক্ষ থেকে কাঠিয়াওয়াড়ের রাজার কোন আশু বিপদের আশংকা ছিল না বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যেকোন মূল্যে সিন্ধু রাজের বন্ধুত্ব অর্জনে প্রস্তুত ছিলেন।

জয়রামকে নিজ দরবারে কোন চাকরী দেবার পরিবর্তে সিন্ধুতে তার প্রভাব ও সম্ভ্রমের সুযোগ গ্রহণ করা তিনি শ্রেয়ঃ মনে করেন। ফলে তাকে স্বর্ণ ও মণি-মাণিক্যের এক সিন্দুকসহ সিন্ধু রাজের দরবারে পাঠিয়ে দেন। জয়রামের বিশ্বাস ছিল যে রাজা

দাহির তাকে ফিরে আসতে দেবেন না। কাজেই একমাত্র বোন মায়াদেবীকে একা ঘরে ফেলে যাওয়া সংগত মনে করল না। মায়াদেবীও তার সাথে চলে যাবার জন্য যিদ ধরে। তার চাচাত ভাইয়ের হাতে ঘরদোরের ভার দিয়ে তারা সিন্ধু যাত্রা করে। কিন্তু কাঠিয়াওয়াড় এবং সিন্ধুর মাঝে তাদের জাহাজ জলদস্যু দ্বারা আক্রান্ত হয়। তার সঙ্গীরা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেও দস্যুদের কাছে পরাজিত হয়। দস্যুরা মণিমুক্তার সিন্দুক দখল করে নেয় এবং জয়রাম ও মায়াদেবী ছাড়া অন্যান্য সবাইকে তীরে নিয়ে ছেড়ে দেয়। দস্যু সর্দার মনে করেছিল যে, জয়রাম ও মায়াদেবী কাঠিয়াওয়াড় রাজের আত্মীয়। কাজেই এদেরকে বাঁচাতে রাজা অনেক টাকা দিতে রাযী হবেন। সেই জন্য সে কাঠিয়াওয়াড় উপকূলের এক অনাবাদী স্থানে নোঙর করে রাজার সাথে দরাদরি করবে স্থির করেছিল। কিন্তু এক গুপ্তচর লংকার জাহাজ আগমনের সংবাদ তাকে দেয়। কাজেই সে কাঠিয়াওয়াড় ছেড়ে মালাবারের দিকে অগ্রসর হয়।

বিবরণ শুনে যুবায়র আর একবার জয়রাম ও তার বোনকে অভয় দান করেন। তিনি বলেন- এ দস্যুরা যেমন আপনাদের কাছে অপরাধী তেমন আমাদের কাছেও অপরাধী। এদের কি শাস্তি হওয়া উচিত তা আমি এখনো স্থির করিনি। তবু আমি জানতে চাই এরূপ অপরাধীকে আপনাদের দেশে কি শাস্তি দেওয়া হয়।

জয়রাম উত্তর দিল- এরূপ অপরাধীর জন্য আমাদের বা আপনাদের আইনে দয়ার কোন স্থান নেই। কিন্তু আমার একটু বক্তব্য আছে। এদের সাথে যখন আপনার যুদ্ধ শুরু হয় তখন আমাদেরকে জাহাজের এক কোণায় এরা বন্দী করে রাখে। জাহাজে আগুন লাগার পরও আমাদেরকে তারা সেখানেই আটকে রাখতে চেয়েছিল। নিজের জন্য হয়ত আমি এদের দয়া ভিক্ষা করতাম না। কিন্তু আমার বোনের জন্য আমাকে দুর্বল হতে হয়। নৌকাতে তুলবার আগে এরা আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে যে আমি আপনার কাছে এদের জীবন রক্ষার সুপারিশ করব। কিন্তু আমি একথা বলতে চাই না, এদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হোক। আমি এদেরকে কেবল মৃত্যুদন্ড থেকে রক্ষা করতে চাই। কিন্তু যতদিন এদের সৎপথে ফিরে যাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত না হওয়া যায় ততদিন এদেরকে বন্দী রাখা আবশ্যক।

অসুখের দরুণ মায়াদেবী বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। ভাইয়ের কাছে সে কিছু বলে। জবাব দেবার আগেই দিলীপ সিংহ বললেন- আহা, আপনার বোন অসুস্থ তা আমাদের জানা ছিল না। বাবা খালিদ, তুমি একে তোমার বোনের কাছে নিয়ে যাও।

খালিদ অগ্রসর হলো। মায়াদেবী ভাইয়ের দিকে তাকাল। জয়রাম দিলীপ সিংহকে জিজ্ঞেস করলো- এ জাহাজে মেয়েলোকও আছে?

জ্বী হাঁ, আপনার বোনের কোন অসুবিধা হবে না। হাঁ মা তুমি যাও, বিশ্রাম করো গিয়ে।

॥ চার ॥

জাহাজগুলো পুনরায় যাত্রা করার আগে দস্যু সর্দার ছাড়া অন্য সব বন্দীদেরকে দিলীপ সিংহের জাহাজে নেওয়া হলো। যুবায়র দিলীপ সিংহকে সতর্ক করে দিলেন যে, শাস্তি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত বন্দীদের সাথে যেন কোন রকম দুর্ব্যবহার না করা হয়। তাদের সৎ ব্যবহারের জামিন স্বরূপ দস্যু সর্দারকে যুবায়র নিজের জাহাজে রেখে দিলেন। বোনের অসুখের দরুণ জয়রাম ও যুবায়রের জাহাজে থাকা পছন্দ করল।

খালিদ মায়াদেবীকে নাহীদের কাছে পৌঁছিয়ে দিল। নাহীদ তাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। অন্য আরব নারীরা তার কাছে এসে জড় হলো। প্রথম দর্শনে মেযবান ও মেহমানদের মাঝে শুধু ইশারাতেই সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতার বিনিময় হলো।

স্বীয় জাহাজে যাবার পূর্বে দিলীপ সিংহ জয়রামকে বললেন- আপনার হয়ত খাবার কষ্ট হবে। আমি কিছুদিন মুসলমানদের সাথে থেকে ছুৎমার্গে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। আমরা সবাই এক সাথেই খাই। আমার সঙ্গে এমন কেউ নেই যে মুসলমানদের সাথে খায়নি। তা সত্ত্বেও আমার নিজের একজন লোক এখানে রেখে যাচ্ছি। সে আপনাদের উভয়ের খাবার পাক করবে। আপনার মেযবান আপনার অনিচ্ছায় কখনো তাঁর সাথে খেতে আপনাকে বাধ্য করবেন না।

দিলীপ সিংহ যুবায়রকে কয়েকটি কথা বুঝিয়ে দিয়ে নিজের জাহাজে চলে গেলেন। তিনি পৌঁছবার আগেই তাঁর সাথীরা স্ব স্ব ভোঁতা ক্ষুর দ্বারা পাঁচজন চুলপাকা দস্যুর মাথা, দাড়ি, মোচ এবং ভ্রু কামিয়ে দিয়েছিল। একজন দস্যুকে গঠন ও চেহারায় অন্যান্যদের চেয়ে একটু সম্ভ্রান্ত মনে হচ্ছিল। তার অর্ধেক দাড়ি, একদিকের গোঁফ এবং অর্ধেক মাথা কামিয়েই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

নাহীদ এবং অন্যান্য আরব নারীরা মনে প্রাণে মায়াদেবীর সেবা-শুশ্রূষা করছিল। নাহীদ লংকা দ্বীপ থেকে ম্যালেরিয়া জ্বরের কিছু ঔষধপত্র সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। তা ব্যবহার করে মায়াদেবী তিন চার দিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলেন।

বাহুর ক্ষতকে সামান্য মনে করে যুবায়র প্রথম প্রথম মোটেই আমল দেন নি। কিন্তু ভিজে হাওয়ার দরুন তৃতীয় দিন তাতে পুঁজ দেখা দেয় এবং বেদনা ও জ্বরের আতিশয্যে তাঁকে শয্যা গ্রহণ করতে হয়।

দিলীপ সিংহ কয়েকবার নিজের জাহাজ ছেড়ে যুবায়রের শুশ্রূষা করবার জন্য আসেন। আলী, খালিদ ও হাশিম, নাহীদ ও অন্যান্য আরব নারীদেরকে অহরহ তার অবস্থা সম্বন্ধে খবর পৌঁছায়। জয়রাম সর্বদা তাঁর কাছে বসে থাকে। নারীসুলভ সূক্ষ্ম অনুভূতির দ্বারা মায়াদেবী নাহীদের মনোকষ্টের কারণ বুঝেতে পেরেছিল। ভাইয়ের উপস্থিতিতে সে মাঝে মাঝে যুবায়রকে দেখে যেত। ফিরে এসে ইঙ্গিতে এবং দু'একটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা আরবী শব্দের সাহায্যে নাহীদকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করতো। দিন-রাত আরব নারীদের মধ্যে থেকে সে ক্রমে দু'একটি আরবী শব্দ শিখছিল।

এক সন্ধ্যায় যুবায়রের অবস্থা একটু আশংকাজনক হয়ে পড়েছিল। দিলীপ সিংহ এসে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে মলম লাগিয়ে পট্টি বেঁধে দিলেন। রাত্রি বেলায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং বায়ু প্রবল ছিল। মাল্লারা স্ব স্ব নির্দিষ্ট স্থানে কর্তব্যরত ছিল। জয়রাম, খালিদ ও আলী যুবায়রের দেখাশোনা করছিল।

আরব নারীগণ এশার নামায পড়তে উঠলে মায়াদেবী তার ভাইয়ের কাছে যুবায়রের অবস্থা জানতে চলে গেল। নামায শেষ করে নাহীদ যখন যুবায়রের আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা করছিল, খালিদ এসে খবর দিল তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছেন।

জনৈক বয়স্কা মহিলা বললেন- ঝড়ের আশংকায় সব পুরুষেরা কাজে ব্যস্ত। ওঁর কাছে এখন আমাদেরই যাওয়া উচিত।

সব মেয়েরা যুবায়রের কাছে গেল। মায়াদেবী তাদের দেখে তার ভাইকে ইঙ্গিত করলো এবং সে বের হয়ে গেলো। কয়েক রাত জয়রাম চোখ মুদতে পারে নি। বের হয়েই সে জাহাজের এক কোণায় শুয়ে গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন হলো।

মাঝ রাতে যুবায়রের জ্বর খানিকটা উপশম হলো। নাহীদ ও মায়াদেবী ছাড়া অন্য সব মেয়েরা ফিরে গেলো। খালিদ ও আলী সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লো।

রাত ত্রিপহরের সময় যুবায়র চোখ খুললেন। মোমবাতির আলোতে মায়াদেবী ও নাহীদকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন- আপনারা এখানে কেন? যান, বিশ্রাম করুন গিয়ে।

নাহীদের ম্লান মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সে জিজ্ঞেস করলো- এখন আপনি কেমন আছেন?

আমি এখন ভাল আছি। একটু পানি দিন।

মায়াদেবী উঠে সুরাহী থেকে পানি ঢেলে পেয়ালাটি নাহীদের হাতে দিল। নাহীদ হকচকিয়ে একহাতে যুবায়রের মস্তক তুলে ধরল এবং অপর হাতে পানির পেয়ালা তাঁর ঠোঁটের কাছে এগিয়ে দিলো।

পানি খেয়ে যুবায়র পুনরায় বালিশে মাথা রেখে নাহীদকে বললেন এর ভাই আমার জন্য অনেক কষ্ট করেছেন। তিনি এখন কোথায়?

তিনি বাইরে ঘুমুচ্ছেন।

আপনারাও গিয়ে ঘুমিয়ে পড় ন। আমি এখন বেশ আছি। দিলীপ সিংহের নতুন মলম বেশ কাজ করেছে।

কয়েকদিন পর যুবায়র চলাফেরার উপযোগী হলেন। আরবদের চরিত্র জয়রামকে বিশেষ ভাবিয়ে তুলেছিল। যুবায়রের সঙ্গে তার মিত্রতা বিশ্বাসের চরম সীমা অতিক্রম করে সখ্যে পরিণত হয়েছিল। যুবায়রের কাছে তিনি আরবদের আধুনিক ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। আরবদের নতুন ধর্মে মানবীয় সাম্যের মতবাদ প্রথমতঃ তার মনে খটকা লাগিয়েছিল। কিন্তু যুবায়রের প্রচারের ফলে শীঘ্রই তাকে

স্বীকার করতে হয় যে, সারা দুনিয়ার শান্তি রক্ষার জন্য সমস্ত জাতির পক্ষে প্রত্যেক জাতির সমান অধিকার স্বীকার করা অপরিহার্য। মানবের মর্যাদা, বর্ণ, রক্ত বা বংশের উপর নির্ভর করে না, বরং তার চরিত্র ও কাজের উপর। প্রথম প্রথম জয়রাম পানাহারের ব্যাপারে মুসলমানের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতেন, কিন্তু কিছুদিন যুবায়রের সংস্পর্শে থাকার পর স্পর্শদোষ তার কাছে হাস্যকর প্রতীয়মান হলো। একদিন তার বোনের সাথে পরামর্শ না করেই তিনি যুবায়রের সাথে খেতে বসে গেলেন।

মায়াদেবীর মনেও এক মানসিক বিপ্লব ঘটেছিল। কিন্তু তার বেলায় এর কারণ ছিল অন্যরূপ। তিনি ইসলামের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ অবগত হননি। কিন্তু আরব নর-নারীদের ব্যবহার তাকে মুগ্ধ করেছিল। তার মত আত্মাভিমানী রাজপুত কন্যাকে তারা এক মুহূর্তের জন্যও অনুভব করতে দেয়নি যে তিনি কোন বিজাতীয় লোকদের দয়ার উপর বাস করছেন। মুসলমান মাল্লারা তাঁকে দেখলে স্বসম্ভ্রমে দৃষ্টি নত করে নিতো। প্রথমদিন হতেই তিনি অনুভব করেন এদের দৃষ্টি তাঁর ভাইয়ের দৃষ্টি থেকে পৃথক নয়।

রোগের সময় নারীদের সেবা-শুশ্রূষাও তাকে মুগ্ধ করে, কিন্তু খালিদের ব্যবহারই তাঁকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করে। কেন যেন তাঁর চোখ খালিদকে দেখতে এবং তার কণ্ঠস্বর শুনতে উৎসুক থাকত। অথচ কাছে আসলে চোখ তুলে তাকাতে সাহস হত না। খালিদ বেপরোয়াভাবে ফিরে চলে যেতো এবং মায়া বহুক্ষণ পর্যন্ত নিজের বুকের ধড়ফড়ানি শুনতে থাকতেন। সময় সময় নিজের অদ্ভুত কল্পনার জন্য নিজেকেই শাসন করতেন।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে তিনি নিজের সঙ্গেই তর্ক করতেন- এ সমবয়সী ছেলেটিকে তিনি কেন সমীহ করে চলেন। ভবিষ্যতে তিনি তাকে ঘৃণা, তুচ্ছ ও অবহেলা করবেন মনস্থ করতেন। প্রত্যুষে আযান শুনে যখন আরবগণ নামাযে দাঁড়াত, মায়াদেবী তখন এসব প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও জাহাজের পাটাতনের উপর চলে যেতেন। এক পাশে দাঁড়িয়ে সুনীল সমুদ্রের ঢেউ দেখে চিত্তবিনোদনের প্রয়াস পেতেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে বিরক্তি ধরে যেতো এবং ঘুরে নামাযীদের দেখতে থাকতেন। অজ্ঞাতসারেই তার দৃষ্টি খালিদের উপর নিবদ্ধ হতো। হয়ত খালিদের উপস্থিতির দরুণই নামাযীদের রুকু ও সিজদা তার ভালো লাগতো। নামাযের পর হাত তুলে খালিদ যখন প্রার্থনা করতো, তাঁর চোখে তা অত্যন্ত মধুর লাগতো।

ইসলামের প্রতি তাঁর প্রথম আকর্ষণ এ কারণে হয় যে, তা খালিদের ধর্ম। খালিদের ভাষা বলেই তিনি আরবী ভাষা শিখতে চেষ্টা করেন।

॥ এক ॥

দস্যু সর্দারের পায়ে বেড়ি লাগিয়ে রাখা হয়েছিল। দিলীপ সিংহের নির্দেশ ছিল, তাকে যেন কোন রকম বিশ্বাস না করা হয়। দু'বেলা তার খাবার পৌঁছিয়ে দেয়ার ভার ছিল আলীর উপর। আলী সর্বদাই ভাবতো হয়ত তার পেট ভরেনি।

যুবায়রের ব্যবহার তার কাছে অপ্রত্যাশিত ঠেকছিল। যুবায়র রোজ দু'একবার তার কাছে যেতেন। প্রথমে তিনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা সিন্ধীতে তার সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করেন; কিন্তু তিনি শীঘ্রই জানতে পারলেন সে অনায়াসে আরবীতে কথা বলতে পারে।

একদিন সে যুবায়রকে বলল মৃত্যুর অপেক্ষায় বেঁচে থাকা অত্যন্ত কষ্টকর। যদি আমাকে দয়া করতে না চান তবে আমার প্রাপ্য শাস্তি তাড়াতাড়ি দিলেই আমি সুখী হব।

যুবায়র জবাব দিলেন- তোমার বৃদ্ধ বয়সের উপর আমার কৃপা হয়। কিন্তু মুক্ত হয়ে তুমি আবার দস্যুতা আরম্ভ করবে না- সে সম্বন্ধে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত স্থির নিশ্চয় না হতে পারি, ততক্ষণ তোমাকে কয়েদ থেকে ছাড়া সম্ভব নয়।

সে জবাব দিল- আমার জাহাজ ডুবে গেছে। বাকী জীবন বনে লুকিয়ে কাটানো ছাড়া এখন আর আমি কি করতে পারি?

দস্যু সর্বত্রই বিপদ সৃষ্টি করতে পারে। তুমি সমুদ্রে জাহাজ লুট করতে। ডাঙ্গায় লোকের বাড়ীতে ডাকাতি করবে। আমি যদি তোমাকে বসরা নিয়ে যাই সেখানে সম্ভবত তোমার হাত কেটে দেয়া হবে। তোমার বিচার জয়রামের হাতে ছেড়ে দিলে বাকী জীবন তোমাকে জেলের কুঠুরীতে কাটাতে হবে।

দস্যু সর্দার জবাব দিল- আপনার সরকারের কথা কিছু বলতে পারি না। কিন্তু আমি অবশ্যই বলবো আমাকে শাস্তি দেয়ার কোন অধিকার দেবল সরকারের নেই।

তা কেন?

কারণ এই যে, গত ক'বছর ধরে আমি সমুদ্রে জাহাজে আরোহণ করে যা করছি, সিন্ধু রাজও সিংহাসনে বসে তাই করছেন। পার্থক্য শুধু এই যে, তাঁর কর্মচারীরা দুর্বল ও দরিদ্রের শোষণ করে এবং আমার সাথীরা ছোট ছোট নৌকার পরিবর্তে কেবল বড় জাহাজ লুট করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ের ব্যবসা একই। তবে আমাদের নাম ভিন্ন। আমি ডাকাত আর তিনি রাজা। তাঁর পিতাও তাঁর মত রাজা ছিলেন, কিন্তু আমার পিতা ডাকাত ছিলেন না। আমি নিজেও ডাকাত হতাম না, কিন্তু রাজার অত্যাচার আমাকে

ডাকাত বানিয়েছে। যা হোক এসব কথা বলে কোন ফল নেই। আপনি বিজয়ী এবং আমি পরাজিত। কিন্তু আমি এটুকু প্রার্থনা করব যে সিন্ধু-রাজের কৃপা ও দয়ার উপর না ছেড়ে আপনি আমাকে যে শাস্তি দিতে চান দিন।

যুবায়র বললেন- আমি তোমার পূর্ণ কাহিনী শুনতে চাই।

কিছুক্ষণ ভেবে দস্যু সর্দার সংক্ষেপে তার কাহিনী এরূপ বর্ণনা করল ঃ-

॥ দুই ॥

আমার নাম গংগু। সিন্ধু নদীর তীরে এক ছোট গ্রামে আমার জন্ম হয়। পিতার ন্যায় আমিও জেলের জীবিকা অবলম্বন করি। বিশ বছর বয়সে আমার পিতা-মাতার মৃত্যু হয়। আমাদের গ্রামে এক বালিকা ছিল। নাম লজ্জাবতী। ছিলও সে লজ্জাবতী। তার চক্ষু হরিণ নয়নের চেয়েও অধিকতর মনোহর এবং তার কণ্ঠস্বর কোকিলের চেয়েও মধুর ছিল। লোকে তার নাম দিয়েছিল জলপরী। গ্রামে এমন যুবক ছিল না, যে লাজুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু সে শুধু আমাকেই ভালবাসত। তার পিতা ছিল সরল প্রাণ। একবার বর্ষায় নদীর স্রোত অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে। লজ্জাবতীর পিতা পণ করল, যে ব্যক্তি সাঁতরিয়ে নদী পার হতে পারবে তার সঙ্গেই সে মেয়ের বিয়ে দেবে। গাঁয়ে ভালো ভালো সাঁতারু ছিল। কিন্তু বর্ষায় নদীর অবস্থা দেখে কেউ পানিতে ঝাঁপ দিতে সাহস করল না। লাজুর জন্য আমি প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলাম। আমি শর্ত পূর্ণ করি। কয়েকদিন পরেই লজ্জাবতীর সাথে আমার বিয়ে হয়।

আমরা উভয়ে সুখী ছিলাম। অধিকাংশ সময় নৌকাতেই কাটাতাম। আমি মাছ ধরতাম আর সে ভাত রাঁধত। রাত্রে আমরা হাসতাম, গাইতাম। তারার ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়তাম। সে ছিল এক অপূর্ব সুখের জীবন।

এ পর্যন্ত বলার পর গংগুর চোখে অশ্রু উথলে উঠলো। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ফুঁপিয়ে কেঁদে আবার তার কাহিনী শুরু করল-

কিন্তু কালচক্র লাজুকে আমার কাছ থেকে চিরকালের জন্য ছিনিয়ে নিল। আমার জানা ছিল না নীচ জাতীয় দুর্বল লোকের পক্ষে সুন্দরী স্ত্রী রাখা পাপ। আমাদের গ্রাম থেকে এক ক্রোশ দূরে সে অঞ্চলের মোড়ল শহরে বাস করত। কয়েকজন সিপাই নিয়ে সে একদিন নদীর পাড়ে আসে এবং তাদেরকে নদী পাড় করে দিতে আমাকে আদেশ করে। নৌকায় উঠে সে নির্লজ্জভাবে লাজুর দিকে পাপ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। তার প্রশ্নের উত্তরে আমাকে বলতে হয় সে আমার পত্নী। সে বলে ওঠে- একে জেলের মেয়ে বলে মনে হয় না। তুমি কোথা থেকে একে এনেছ? আমি তার কোন জবাব দেইনি। অপর তীরে পৌঁছে সে বলে- সন্ধ্যায় আমি ফিরে আসব। তুমি ততক্ষণে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। কিন্তু সে সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসে এবং আমি তাকে নদীর পার করে দেই। আমার নাম জেনে নিয়ে সে চলে যায়। এর পরে গ্রামের জেলেদের মাছ ধরা

দেখার ছলে সে মাঝে মাঝে আমাদের গ্রামে আসতে থাকে। লোকের সাথে ভালভাবে মিশত বলে গ্রামবাসী খুশী হত। লাজু একদিন আমাকে বলে মোড়লের উদ্দেশ্য ভালো নয়। সে আমার দিকে কুদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

এক সন্ধ্যায় লাজু যথারীতি নৌকায় ভাত রাঁধছিল। মোড়ল ঘোড়ায় চড়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল কোন তাজা মাছ আছে কিনা। থাকলে নিয়ে এস। কিছুক্ষণ আগে আমি দু'টি বড় মাছ ধরেছিলাম। তাই নিয়ে এলাম। মাছ নিয়ে তার সঙ্গে যেতে সে আমাকে আদেশ দিল। শহর বেশী দূরে ছিল না। আমি লাজুকে বললাম- রান্না শেষ হতে না হতেই আমি ফিরে আসব।

আমি তার ঘোড়ার পিছে পিছে হেঁটে যাচ্ছিলাম। পথে ঝোঁপের আড়াল থেকে দশজন লোক বের হয়ে আমাকে হঠাৎ আক্রমণ করল। আমি তাদের হাত হতে মুক্ত হবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম। কিন্তু একজন আমার মাথায় লাঠি মারায় আমি অচেতন হয়ে পড়ে গেলাম। এরপরে যখন আমার চেতনা ফিরে এল তখন আমি এক অন্ধকার কুঠরীতে আবদ্ধ।

॥ তিন ॥

দু'দিন পর্যন্ত আমি ক্ষুধা তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে থাকি। তৃতীয় দিনে কুঠরীতে দরজা খোলা হয়। লজ্জাবতী তিনজন লোকসহ কুঠরীতে প্রবেশ করে। একজনের হাতে সামান্য আহার্য ও পানি ছিল এবং দু'জনের হাতে নগ্ন তরবারি। লাজুর চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। তার চোখ দেখে মনে হচ্ছিল, অশ্রুর সমস্ত পুঁজি নিঃশেষিত হয়ে গেছে। তার উপর চোখ পড়তেই ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে গেলাম। আমার মনে হচ্ছিল লাভ দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরি। কিন্তু আমার হাত-পা বাঁধা ছিল। লাজু সিপাইদের দিকে তাকালো। তারা তলোয়ার দিয়ে আমার বন্ধন-রজ্জু কেটে দিয়ে বাইরে চলে গেল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম- লাজু, তুমি এখানে কি করে এলে? ঠোঁট কামড়িয়ে কান্না রোদ করে সে আমার গলা জড়িয়ে ধরে। কিন্তু সে অকস্মাৎ ভীত হয়ে আমাকে ছেড়ে দিল এবং দরজার দিকে তাকাতে লাগল। সে আমাকে বললো আমি চলে আসার কিছুক্ষণ পরে, কয়েকজন লোক গিয়ে নৌকা আক্রমণ করে এবং তাকে ধরে মোড়লের কাছে নিয়ে যায়। আমার অবস্থা তার জানা ছিল না। অসৎ জীবন যাপন করার চেয়ে সে জীবন বিসর্জন দেওয়া শ্রেয় মনে করছিল। কিন্তু মোড়ল তাকে আমার বন্দীদশার কথা বলে ভয় দেখায় যে, সে যদি অসতী জীবন যাপন করতে রাজি না হয় তবে তার স্বামী বন্দী অবস্থায় ক্ষুৎ পিপাসায় তিলে তিলে শুকিয়ে মারা যাবে।

সে এসেছিল আমাকে বলতে- গংগু তুমি মুক্ত। তুমি চলে যাও এবং মনে করো তোমার লাজু মরে গেছে। সে নিজের সতীত্বের বিনিময়ে আমার মুক্তি ক্রয় করেছিল। কিন্তু আমি তাকে ভুল বুঝেছিলাম। আমি মনে করেছিলাম সে গরীব জেলের নৌকা

ছেড়ে ধনীর প্রাসাদে বাস করতে চায়। আমি রাগে অন্ধ হয়ে তাকে ভর্ৎসনা করি ও কটু কথা বলি। এমন কি কয়েকটি থাপ্পড়ও মারি। প্রস্তর মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে সে আমার সব অত্যাচার সহ্য করে। সে শুধু বলে- গংগু অসতী জীবনের মৃত্যুই আমি শ্রেয়ঃ মনে করি। আমি এখানে এসেছি শুধু এই জন্য আমার জীবনের চেয়ে তোমার জীবন আমার কাছে অধিকতর প্রিয়। ভগবানের দোহাই, তুমি যাও। এ সুযোগ হারিয়ো না। তুমি মুক্ত হয়ে হয়তো এই জালিমের হাত থেকে আমাকে বাঁচাবার কোন ব্যবস্থা করতে পারবে।

তার অশ্রু ও কান্না আমার ভুল সন্দেহ ভেঙ্গে দিলো। আমি তাকে আবার গলায় জড়িয়ে নিলাম। তাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম আমি শিগ্‌গীর ফিরে আসব। আমি এই কুটীরের ইট একটি একটি করে খসিয়ে ছাড়ব।

বন্দীশালার দরজা আবার উন্মুক্ত হলো। সিপাহীদের পরিবর্তে সে পিশাচ প্রবেশ করল। তার হাতে নগ্ন তরবারি না থাকলে আমি নিশ্চয় তাকে আক্রমণ করতাম। সে লাজুকে বলল- এখন বলো তুমি কি স্থির করলে। এর জীবন তোমার হাতে।

লাজু উত্তর দিলো- আমি যদি আপনার শর্ত মানি, তাহলে আমার স্বামী জীবিত ও নিরাপদে শহর থেকে যে বের হয়ে যেতে পারবেন, তার প্রমাণ কি?

সে বলে- আমি কথা দিচ্ছি।

অশ্রু ফেলতে ফেলতে লাজু তার সাথে চলে গেল। চারজন সিপাই আমাকে শহরের বাইরে নিয়ে এল। তাদের হাতে নগ্ন তলোয়ার ছিল। মোড়লের প্রতিজ্ঞার উপর আমার বিশ্বাস ছিল না। শহরের বাইরে নদীর ধারে ধারে অনেকদূর পর্যন্ত ঘন বন ছিল। সেখানে পৌঁছার পর এক ব্যক্তি হঠাৎ পিছন থেকে আমার উপর আঘাত হানে। আমি আগে থেকেই প্রস্তুত থাকায় এক পাশে সরে গিয়ে বেঁচে যাই। তখন চারজন এক সঙ্গে আমাকে আক্রমণ করে। কিন্তু দৌড়ে আমি তাদের চেয়ে ক্ষিপ্র ছিলাম। কাজেই বনের মধ্যে ঢুকে এক ঘন ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে থাকি। তারা কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে নিরাশ হয়ে ফিরে যায়।

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে নদীর তীরে পৌঁছলাম। আমার নৌকা আগুনে জ্বলছিল। সেখানে চার সিপাই তীরে দন্ডায়মান ছিল। এসব ঘটনায় আমার মত শান্তি-প্রিয় লোককেও পিশাচে পরিণত করে। আমি গ্রামে দৌড়ে গিয়ে চিৎকার করে উঠলাম। আমার কণ্ঠস্বরে এক প্রভাব ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই কয়েকজন যুবক লাঠি ও কুড়াল নিয়ে এসে আমার সাথে জুটল। আমাদের দেখে সিপাইরা হতবুদ্ধি হয়ে দৌড় দিল। কিন্তু কাউকে জীবন্ত ফিরে যাবার সুযোগ দিলাম না। তাদের হত্যা করে লাশ নদীতে ফেলে দিলাম। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত জেলেদের কুড়ি-পঁচিশটি বস্তি থেকে প্রায় দু'শ যুবক সংগ্রাম করলাম। তৃতীয় প্রহরে মোড়লের গৃহের উপর আক্রমণ করলাম। শহরবাসী তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়েছিল। কেউ তার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হলো না। তার জন্য কয়েক সিপাই বাধা দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু অধিকাংশ পরের ঘরে আশ্রয় নিল। আমি মোড়লকে পাকড়াও করে লাজুর কথা জিজ্ঞেস করলাম। প্রত্যেক

প্রশ্নের উত্তরে সে জবাব দিতে লাগল- আমি নিরপরাধ। ভগবানের দোহাই, আমাকে ছেড়ে দাও।

আমি মশাল দেখিয়ে তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ভয় দেখলাম। তখন সে গৃহের এক নিচের ঘরে আমাকে নিয়ে গেল। বিছানায় লাজুর লাশ দেখে আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম। সে করজোড়ে বলতে লাগল আমি তাকে হত্যা করিনি। সে নিজেই ছাদ হতে লাফ দিয়ে পড়েছে। তুমি সিপাইদের জিজ্ঞেস করতে পার। ভগবানের দোহাই, আমার উপর দয়া কর।

আমি জ্বলন্ত মশাল তার চোখে ঢুকিয়ে দেই এবং কুড়াল দিয়ে কোপাতে কোপাতে তাকে খন্ড-বিখন্ড করে ফেলি।

এরপর থেকেই আমি ডাকাতে পরিণত হই। আমার মনে কারো জন্য দয়া ছিল না। আমি সর্দারের গৃহ লুট করি। রাজার সৈন্যরা ডাঙ্গায় আমাদের কাবু করতে চাওয়ায় আমি নদী পথে সমুদ্রের দিকে যাত্রা করি। দেবল বন্দর থেকে রাত্রি বেলায় আমি দু'টি জাহাজ চুরি করি। তারপর এ পর্যন্ত আমি অনেকগুলো জাহাজ লুট করেছি। যারা রাজা ও মোড়লদের সাহায্য করে তাদের প্রত্যেককে আমি শত্রু মনে করি। প্রত্যেক ধনীর মধ্যে আমি সেই পিশাচ মোড়লের আত্মা দেখতে পাই। প্রত্যেক উচ্চ প্রাসাদে লজ্জাবতীর উৎপীড়িত আত্মা প্রতিশোধের জন্য চিৎকার করছে শুনতে পাই।

যুবায়র বললেন- ঐ মেয়েটির মর্মন্তুদ মৃত্যুর জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত। মোড়লের সঙ্গে তোমার যুদ্ধ ন্যায়সঙ্গতই মনে হবে। একজনের অত্যাচারের প্রতিশোধ তুমি অন্যের উপর নিতে চাও কোন যুক্তিতে? তুমি আমাদের জাহাজ আক্রমণ করেছিলে। কিন্তু এতে কোন মোড়ল আরোহী ছিল না। এতে ছিল কতগুলো এতিম শিশু এবং বিধবা নারী।

গংগু বললো- আমি দুঃখিত। কিন্তু অপর জাহাজের উপর লংকারাজের পতাকা উড্ডীয়মান ছিল এবং আপনি তার সহায়ক ছিলেন। তা সত্ত্বেও আপনার জাহাজে নারী ও শিশু আরোহী ছিল জানা থাকলে আমি কখনো আক্রমণ করতাম না। কয়েক মাস আগেই এই সাগরে আপনার দেশীয় আর একটি জাহাজ দেখেছিলাম। তাতে পুরুষদের সাথে কয়েকজন নারীও ছিল- কেবল এই কারণেই তা আমি ছেড়ে দেই।

খালিদ এ কথা শুনে চিৎকার দিয়ে বললো- তাতে কি কয়েকজন লংকাবাসী নাবিকও ছিল?

হাঁ।

তাহলে সেটা আব্বার জাহাজ ছিল। এ পর্যন্ত তার কোন পাত্তা নাই। তুমি মিথ্যা কথা বলছ। তুমি তাঁর জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছ।

গংগু জবাব দিল- আমি জাহাজটি ডুবিয়ে দিয়ে থাকলে একথা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল না।

সে জাহাজে হাতীও ছিল?

হাঁ।

তুমি একথাও জান না জাহাজটি কোথায় নিমজ্জিত হয়েছে?

শুধু এটুকু জানি জাহাজটি দেবল পর্যন্ত নিরাপদে পৌছে গিয়েছিল।

যুবায়র জিজ্ঞেস করলেন- এ সমুদ্রে তোমার দল ছাড়া আর কোন দস্যুদল আছে কি?

হাঁ।

এটা কি সম্ভব দেবলের শাসনকর্তা জাহাজটি লুট করেছেন?

হাঁ, আমি আগেই বলেছি ডাঙ্গায় ডাকাত জলদস্যুর চেয়ে অধিকতর নির্দয়।

॥ চার ॥

উপরোক্ত কথোপকথনের পর যুবায়র গংগুর প্রতি আরো বেশী মনোযোগ দিতে লাগলেন। জয়রাম অদ্ভুত মানসিক সংঘাতে ক্ষুব্ধ ছিলেন। গংগুর কাহিনী যুবায়রের ন্যায় তাঁকেও অভিভূত করেছিল। কিন্তু রাজভক্ত সৈনিকের মত তিনি রাজার দোষ ধরা বা সমালোচনা করা অসংগত মনে করতেন। ব্যক্তিগত অভিযোগের ফলে প্রজাদের মধ্যে কেউ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে সে অধিকার তিনি স্বীকার করতে পারছিলেন না। রাজ-সত্তার পবিত্রতা ও প্রজার চির আনুগত্যে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তা সত্ত্বেও শান্তি রক্ষার প্রতিশ্রুতি নিয়ে যুবায়র যখন গংগুর বন্ধন মুক্ত করে দিলেন জয়রাম তখন আপত্তি করেন নি।

যুবায়রের সাহচর্যে কিছুদিন বাস করে, গংগু নিজের ভাবধারায়, বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করল। রোম ও ইরানের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রাথমিক যুদ্ধের ইতিহাস উল্লেখ করে কয়েকদিনের মধ্যে যুবায়র প্রমাণ করে দেখালেন পৃথিবীতে একমাত্র ইসলামই এমন শাসন ব্যবস্থা স্থাপন করতে সক্ষম যা জবরদস্তী, অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারী শাসনের মুলোচ্ছেদ করতে পারে। দস্যুবৃত্তি অবলম্বনের পর, গংগু সমস্ত সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্মবিশ্বাস পরিহার করেছিল। পৃথিবী একটি অসীম হ্রদ যাতে বড় বড় মাছ ছোট মাছগুলোকে গিলে খায় এই ছিল গংগুর ধারণা। নিজেকে ছোট মাছ মনে করে, সে প্রত্যেক বড় মাছের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিল। মুসলমানগণ পৃথিবীর কয়েকটি বৃহৎ মৎস্যকে পরাজিত করায় তাদের সাথে গংগুর সহানুভূতি ছিল। যুবায়র একদিন তাকে বলেন- তুমি অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাচ্ছো। অথচ তোমার হাতিয়ার অত্যাচারীর হাতিয়ার থেকে ভিন্ন নয়। তারা তোমার নৌকা পুড়িয়েছিল। তুমি তাদের জাহাজ জ্বালাচ্ছ। উভয়ের ভিত্তিই অত্যাচারের উপর স্থাপিত। যেমন অনেক নিরপরাধ লোক তাদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়, তেমনি তোমার অত্যাচারে বহু নিরপরাধ লোক

নিষ্পেষিত হয়। তুমি নিজেই স্বীকার করেছ তোমাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উভয়ের কারো কাছেই শান্তি, ন্যায় ও সুবিচারের কোন আইন নেই। যতদিন তোমাদের কারো কাছে ন্যায় ও সুবিচারের আইন না থাকবে, ততদিন তোমাদের তরবারী পরস্পরকে আঘাত করতেই থাকবে। এক তলোয়ার ভোঁতা হয়ে যাবে অপর তলোয়ার তুলে নেবে। এক কামান ভেঙ্গে যাবে অপর কামান বানিয়ে নেবে। কিন্তু অত্যাচারের বিরুদ্ধে যারা সত্য ও ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করে তারা প্রতিদ্বন্দ্বীর তরবারী শুধু ভোঁতাই করে না বরং চিরকালের জন্য কেড়ে নেয়। রোম ও ইরানের বিরুদ্ধে আরবদের বিজয় প্রকৃতপক্ষে অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় ও সত্যের বিজয়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সুবিচারের বিজয়। ইরান, মিসর ও শামের যেসব লোক কাল সত্যোপাসকদের অস্তিত্ব নিঃশেষ করার জন্য দাঁড়িয়েছিল, আজ আফ্রিকা ও তুর্কিস্তান থেকে অত্যাচারী শক্তি বিলোপ সাধনে তারা আমাদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করছে।

গংগু অভিভূত হয়ে জিজ্ঞেস করে- আমিও কি আপনাদের সাথে যোগ দিতে পারি?

যুবায়র মুচকি হেসে বললেন- দস্যু হিসেবে নয়। পথহারা কাফিলাকে অপহরণ করা আমাদের কাজ নয়। বরং তাদেরকে সঠিক পথ দেখানো। যে ব্যক্তি নিজেই বিপথগামী সে সত্যের নিশান বরদার হতে পারে না।

গংগু লজ্জিত হয়ে বলে- আমি যদি দস্যুবৃত্তি চিরতরে পরিত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা করি আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন কি?

আমি সানন্দে তোমাকে বিশ্বাস করব।

আমাকে মুক্তিও দিবেন?

যুবায়র জাবাব দিলেন- তুমি যদি এরূপ শর্ত কর তবে তার অর্থ এই হবে যে তুমি স্বীয় কুকর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে আত্ম-সংশোধনের জন্য দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করছ না বরং মুক্তি লাভের লোভে।

কিন্তু আমি তওবা করলে আপনি আমাকে কাপুরুষ মনে করবেন না তো?

মোটেই না। তওবা করা অত্যন্ত সাহসের কাজ।

তাহলে আমি আপনার কাছে দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা করছি।

আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। তোমার সাথীদের দায়িত্ব যদি তুমি নিতে চাও তাহলে আমি তাদেরকেও মুক্তি দেব এবং যেখানে চাও তোমাদের নামিয়ে দেব।

গংগু জবাব দিল- আমার সাথীরা শুধু আমার জন্যই দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেছে। এদের অধিকাংশ আমার নেতৃত্ব ছাড়া এরূপ কাজে সাহস করবে না। সিন্ধুর কোন অনাবাদী স্থানে এদের নামিয়ে দিলে এরা আবার মৎস্যজীবির পেশা অবলম্বন করবে। এরা বহুদিন যাবত আমার সাথে আছে। এদেরকে কেউ চিনতেও পারবে না। তবে তাদের মধ্যে চারজন গোঁয়ার-গোবিন্দ। তাদের সম্বন্ধে আমি আপনাকে কথা দিতে পারব না। আমার নিজের উপরও আমার দৃঢ় বিশ্বাস নেই। আপনি আমাকে [illegible] দিলে

হয়ত কোন অত্যাচারীকে দেখে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাবে এবং আমি আবার অত্যাচার ও পাপের পথ গ্রহণ করবো। আপনি যদি আমাকে সাথে করে নিয়ে যান, তবে হয়ত আপনাদের দেশে থেকে আপনাদের মতই মানুষ হতে পারব। যে চরি জনের কথা আপনাকে বলেছি তারা যদি আমার মত এ জাহাজে থাকত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তারাও আপনার কথায় সৎ পথে ফিরে আসত। আপনি অনুমতি দিলে আমার সাথীদের সাথে দেখা করব।

॥ পাঁচ ॥

পরদিন জাহাজটি এক দ্বীপের কাছে নোঙর ফেলে। যুবায়ের গংগুকে সাথে নিয়ে দিলীপ সিংহের জাহাজে গেলেন। গংগু তার সাথীদের কাছে সিন্ধী ভাষায় এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেয়। মুক্তির সুসংবাদে তাদের মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠে। কিন্তু গংগু যখন বলে সে চিরদিনের জন্য দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করে তাদের সাহচর্য ত্যাগ করার সংকল্প করেছে, তখন তাদের কয়েকজনের আনন্দ বিষাদে পরিণত হয়। একে একে গংগু কয়েকজনের কাছ থেকে সদাচারের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। কিন্তু তিনজন মন স্থির করতে না পেরে পরস্পরের দিকে তাকাতে থাকে। যে লোকটির অর্ধেক দাড়ি ও গোঁফ মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এদের মধ্যে সে লোকটিও ছিল।

গংগু তাদের দিকে তাকিয়ে বলে- কালু, বসু ও মোতি, তোমরা কিছুদিন আমার সাথে থাকবে। পরে যুবায়রকে সম্বোধন করে বলে- আমি এদের পক্ষ থেকে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব নিচ্ছি। দিলীপ সিংহের সাথে পরামর্শ করে যুবায়র তাদের বন্ধন মুক্ত করার আদেশ দিলেন।

কালু, বসু ও মোতি গংগুর সঙ্গে যুবায়রের জাহাজে চলে এল। বসুর অদ্ভুত চোহারা দেখে সব আরব তার চতুর্দিকে জড় হল। আলী, আত্মসংবরণ করতে না পেরে উচ্চস্বরে হেসে ফেলল। দৌড়ে গিয়ে মেয়েদের কাছে বসুর চেহারার বর্ণনা দিল। সে যখন ফিরে এল তখন হাশিম এবং আরো কয়েকজন বালক তার সাথে এল। বিস্মিত হয়ে সকলেই বসুর দিকে চেয়ে রইল। হাশিম শিশু-সুলভ সারল্যের সাথে অগ্রসর হয়ে জিজ্ঞেস করল- তোমার মুখের বাম দিকে দাড়ি গোঁফ গজায় না?

সমস্ত আরব হেসে উঠল। আলীর হাসির শব্দ ছিল সবার উপরে। গংগু হেসে হাশিমকে কোলে তুলে নিল।

সন্ধ্যার সময় খালিদ যুবায়রকে বলে- নাহীদ মনে করে আব্বার জাহাজের খবর গংগু নিশ্চয় জানে। সে নিজে গংগুকে কয়েকটি প্রশ্ন করবার জন্য জিদ ধরেছে।

যুবায়র উত্তর দিলেন- আমার মনে হয় গংগুর কথা আমাদের বিশ্বাস করা উচিত।

খালিদ বলে- নাহীদের বিশ্বাস গংগু জাহাজের খবর না জানালেও তার সন্ধান করতে আমাদের সাহায্য করতে পারবে। কাল সে স্বপ্ন দেখেছে। সে বলছে আব্বাজান জীবিত আছেন।

জিজ্ঞেস করায় ক্ষতি নেই। কিন্তু তার প্রতি কোন সন্দেহ প্রকাশ না করাই ভাল হবে। তুমি তোমার বোনকে নিয়ে এস। আমি গংগুকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

দিলীপ সিংহ গংগুকে নিয়ে এলেন। নাহীদের সাথে মায়াদেবীও আসলেন। নাহীদের মুখ কালো ঘোমটায় ঢাকা ছিল। সে মায়াদেবীর কানে কানে কিছু বলল। মায়াদেবী সম্মতিসূচক মাথা নাড়ালে সে নিজের হার খুলে তার হাতে দিয়ে দিল।

মায়াদেবী হারটি গংগুর সামনে রাখতে রাখতে বললেন- কয়েকদিন আগে আপনি এর পিতার জাহাজের কথা বলেছিলেন। যদি এর পিতার সন্ধান দিতে পারেন তবে এ হার আপনার পুরস্কার।

গংগু দুঃখ ও লজ্জায় সংকুচিত হয়ে সজল চোখে পর পর খালিদ ও যুবায়রের দিকে তাকাল। পরে নাহীদকে লক্ষ্য করে বলল- মা, আমি অতটা নীচ নই।

নাহীদ তার অশ্রু দেখে অভিভূত হয়ে বলল- আপনি ভুল বুঝেছেন। আপনার প্রতি আমাদের কোন সন্দেহ নেই। আপনি আমাদের সাহায্য করুন শুধু এই আমাদের কামনা।

তার জন্য আমাকে হার দেয়ার প্রয়োজন নেই। আমি যুবায়রের দয়ার প্রতিদান দিতে অক্ষম। কোন জলদস্যু সে জাহাজ লুট করে থাকলে আমি অবশ্যই জানতাম। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে দেবল বন্দরের কাছাকাছি দেবলের শাসনকর্তাই জাহাজটি লুট করেছে।

নাহীদ বলে- আমার মন সাক্ষ্য দিচ্ছে আমার পিতা জীবিত আছেন।

গংগু বলে- তিনি জীবিত থাকলে সিন্ধুর কোন কারাগারে বন্দী আছেন যেখান থেকে মৃত্যুর আগে কেউ মুক্তি পায় না। কিন্তু আমি তাঁর সন্ধান নেয়ার দায়িত্ব নিচ্ছি। তাঁর সন্ধান পেলে আমি মকরাণের শাসনকর্তাকে খবর পাঠিয়ে দেব।

তারপর যুবায়রের দিকে ফিরে বলল- আপনি আমাকে দেবল বন্দরে নামিয়ে দিন। জয়রাম আমার সাহায্য করলে অতি শীঘ্র আমি তাঁর সন্ধান বের করতে পারব।

মায়াদেবী বললেন- আমি আমার ভাইয়ের পক্ষ থেকে তোমাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করার বচন দিচ্ছি। দেবলের শাসনকর্তা তাঁর বন্ধু। ভাইয়ের কাছ থেকে তিনি কিছু লুকাতে পারবেন না।

গংগু বলে- শাসক কারুর বন্ধু হতে পারে না। দেবলের শাসককে আমি ভালরূপে চিনি।

একথা বলে সে যুবায়রকে সম্বোধন করে বলে- আপনি দেবল বন্দরে জাহাজ

ভিড়াবার ইচ্ছা রাখেন?

যুবায়র জবাব দেন- আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু জয়রামের নির্বন্ধাতিশয্যে আমি সেখানে দু'দিন থাকব স্থির করেছি।

গংগু কিছুক্ষণ ভেবে বলল- সিন্ধুর রাজা এবং দেবলের শাসনকর্তার কাছে জয়রামের প্রতিপত্তির খবর আমার জানা নেই। এমনি আপনাকে সিন্ধু উপকূলের কাছ দিয়ে যেতেও পরামর্শ দিতাম না।

যুবায়র জবাব দিলেন- সিন্ধুবাসীদের সাথে আমাদের সম্পর্ক তত খারাপ নয়। কিছুকাল পূর্বে আবুল হাসান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে মকরাণের শাসনকর্তা সেখানে গিয়েছিলেন। রাজা তাঁর সাথে সদম্ভ ব্যবহার করেছে বটে কিন্তু তাঁর উপর কোন রকম হস্তক্ষেপ করতে সাহস করেনি।

গংগু বলল- তাঁর জাহাজ হয়তো খালি ছিল। কিন্তু আপনার জাহাজে হাতী আছে। সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য তাঁর হাতীর বিশেষ দরকার। তাছাড়া আপনার সাথে স্ত্রীলোক রয়েছে যাদের প্রতি তিনি কোন সম্ভ্রম পোষণ করেন না।

॥ এক ॥

গংগু, কালু, বসু এবং মোতি ছাড়া অন্য সব বন্দীদের দেবল হতে কয়েক ক্রোশ দূরে এক অনাবাদী স্থানে নামিয়ে দেয় হল। গংগু আবুল হাসানের সন্ধান নেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। গুজরাটী ব্যবসায়ীর বেশে সে নিজের তিন সাথীকে নিয়ে দেবল বন্দরে অবতরণ করা স্থির করেছিল। এই কাজে জয়রাম গংগুকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও তিনি বারবার যুবায়রকে আশ্বাস দিচ্ছিলেন সিন্ধু সরকার কখনো এরূপ কাজ করতে পারেন না। আবুল হাসানের জাহাজ দেবলের আশে পাশে লুণ্ঠিত হয়ে থাকলে দেবলের হাকিম বা রাজা নিশ্চয় তা জানেন না।

যুবায়র জবাব দেন- আমার সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। তবে আমি নাহীদের মনের খটকা দূর করতে চাই। সন্ধ্যার কিছু আগে জাহাজটি দেবল বন্দরে নোঙর করল। মায়াদেবী সমস্ত আরব স্ত্রীলোককে নিজ গৃহে নিয়ে যেতে জিদ করতে লাগলেন। জয়রাম সব নাবিকদের দাওয়াত দিলেন। গংগু দিলীপ সিংহের কানে কানে কিছু বলল। তিনি জয়রামকে পরামর্শ দিলেন- আপনি কয়েক মাস পরে দেবলে ফিরে আসছেন। হয়ত আপনার পূর্বের বাড়ী এখন অন্যের দখলে আছে। এও সম্ভব যে দেবলের শাসনকর্তা এদেরকে শহরে প্রবেশের অনুমতি দিতে আপত্তি করতে পারেন।

জয়রাম জবাব দেন- তাঁর কি আপত্তি থাকতে পারে? তিনি নিজেই আপনাদের আতিথ্য করতে জিদ করবেন। আপনার সাহায্য ছাড়া কাঠিয়াওয়াড়ের বহুমূল্য উপঢৌকনগুলো রাজার কাছে পৌঁছতে পারতো না। বরং রাজার আতিথ্যের উপর আপনাদের অধিকার জন্মেছে।

যুবায়র জবাব দিলেন- আপনি শহরের গভর্নরের সাথে দেখা করে আসুন। তারপর আপনার সাথে যেতে আমাদের কোন আপত্তি থাকবে না।

মায়াদেবী বলেন- ভাই, আপনি যান। আপনার বাড়ী যদি অপর কেউ দখল করে থাকে তা হলে অত্যন্ত অসুবিধা হবে। আপনি অতিথিদের থাকার ব্যবস্থা করে আসুন। ততক্ষণে আমি বোন নাহীদের কাছে থাকব।

জয়রাম বন্দর থেকে একটি লোক ডেকে তাকে উপহারের সিন্দুকটি তুলতে হুকুম দিলেন। তিনি সোজা দেবলের গভর্নর প্রতাপ রায়ের প্রাসাদের পথ ধরলেন। কাঠিয়াওয়াড়ের উপঢৌকনের কথা ছাড়া জয়রামের অন্য কাহিনীর প্রতি প্রতাপ রায় কোন মনোযোগ দিলেন না। কিন্তু যখন তিনি বললেন যে, লংকার জাহাজ তাঁকে

জলদস্যুর কবল থেকে বাঁচিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে, তখন প্রতাপ রায় চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন- যে জাহাজে লংকার রাজা আরবদের জন্য হাতী পাঠাচ্ছেন এ সে জাহাজ নয় তো?

হ্যাঁ। কিন্তু এ খবর আপনি কি করে জানলেন?

সে কথা পরে হবে। আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও। এ জাহাজে আরবী নারী ও শিশুরা রয়েছে?

হ্যাঁ। এ জাহাজ ইতিমধ্যেই জলদস্যুদের দু'টি জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে। তার অর্থ এই যে, জাহাজ দু'টি অস্ত্রশস্ত্রে সম্পূর্ণ সজ্জিত। বন্দর থেকে যাত্রা করে চলে যায়নি তো?

না। আমি তাদেরকে দু'দিন আমার অতিথি হিসেবে রাখতে চাই। তারা আমার অত্যন্ত উপকার করেছেন। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি এঁদেরকে শহরে এনে রাখতে আপনার কোন আপত্তি নেইতো?

আপত্তি? মোটেই না। তারা সারা জীবন আমাদের অতিথি হয়ে থাকবেন। জাহাজ দু'টি লুট করে যাত্রীদেরকে বন্দী করার অনুমতি আজ মহারাজ থেকে পেয়েছি।

সে মুহূর্তে যদি সেখানে বজ্রপাতও হতো তবুও বোধ হয় জয়রাম এতটা বিস্মিত হতেন না। কয়েক মুহূর্ত তিনি সংবিৎহীন পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। অবশেষে তিনি আত্ম-সংবরণ করে বলে উঠলেন- আপনি পরিহাস করছেন।

তিক্তস্বরে প্রতাপ রায় জবাব দিলেন- আমি অপোগণ্ড বালকের সাথে পরিহাস করতে অভ্যস্ত নই। সিন্ধী ব্যবসায়ীদের মারফতে এ জাহাজ দু'টির আগমনবার্তা আমরা পেয়েছি। মহারাজের হুকুম যে জাহাজ দু'টি বলপূর্বক অপহরণ করা হোক। উপঢৌকনের সিন্দুকের চেয়ে মহারাজ এঁকে বেশী খুশী হবেন যে ধনরত্ন পরিপূর্ণ দু'টি জাহাজ এখানে নিয়ে এসেছে।

জয়রাম চিৎকার করে বললেন- না, এ কখনো হতে পারে না। এঁরা আমাদের অতিথি, আমাদের মিত্র এবং উপকারক।

প্রতাপ রায় ধমক দিয়ে বললেন- সাবধানে কথা বল। তুমি ভুলে যাচ্ছ কোথায় দাঁড়িয়ে আছ।

জয়রাম তবু বললেন- এটা অমানুষের কাজ। তুমি এমন এক জাতির শত্রুতা ক্রয় করছ যারা সিন্ধুর ন্যায় বহু রাজ্যকে পদানত করেছে। যারা মহারাজকে এ কুপরামর্শ দিয়েছে তারা তাঁর শত্রু। আমি যাচ্ছি। অতিথির রক্ষা রাজপুতের ধর্ম।

রাজদ্রোহী হয়ে তুমি কোথাও যেতে পার না- বলতে বলতে প্রতাপ রায় প্রহরীদের ডাক দিলেন। মুহূর্তে নগ্ন তরবারী নিয়ে চারজন প্রহরী জয়রামকে ঘিরে দাঁড়াল। জয়রাম নিজের তলোয়ার কোষমুক্ত করার অবসর পেলেন না।

প্রতাপ রায় বললেন- তোমাকে কিছুক্ষণ বন্দী থাকতে হবে। বন্দর থেকে ফিরে এসে তোমাকে মুক্ত করে দেব। কাল তোমাদের মহারাজের কাছে পাঠিয়ে দেব। তুমি যদি তোমার অতিথিদের প্রাণ রক্ষা করাতে পার তাহলে আমি তাদের মুক্তি দেব। কিন্তু তোমাকে খুশী করার জন্য আমি মহারাজের আদেশ অমান্য করতে পারব না।

প্রহরীরা জয়রামকে প্রাসাদের এক কুঠরিতে বন্ধ করে রাখল। কিছুক্ষণ দরজায় ধাক্কা দিয়ে, মাথা কুটে ও চীৎকার করে জয়রাম চুপ করে বসে রইল। তার বোনের কথা মনে পড়ায় আবার সে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। নিজের তলোয়ার বের করে সে দরজায় আঘাত করতে লাগল। তলোয়ার ভেঙ্গে গেল কিন্তু শক্ত দরজার কিছু হল না। তলোয়ারের ভাঙ্গা ফলক তুলে নিজের বুকে বসিয়ে দিতে চাইল। কিন্তু কিসের চিন্তা তাকে বাধা দিল। অস্থিরভাবে সে কুঠরিতে পায়চারী করতে লাগল। আবার তার কি মনে হলো। সে প্রহরীদের ডেকে নানা প্রকার প্রলোভন দেখাতে লাগল। কিন্তু কেউ ভ্রূক্ষেপ করল না। রাজার কাছে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার ভয় দেখাল। উত্তরে প্রহরীদের হাসির শব্দ শোনা গেল মাত্র।

॥ দুই ॥

জয়রামের শহরে যাবার কিছুক্ষণ পর গংগু তার তিনজন সাথীসহ সন্ধ্যার অন্ধকারে বিদায় নিল এবং শহরের দিকে যাত্রা করল। বন্দর হতে নগর প্রায় দু'ক্রোশ দূরে ছিল। শহরে পৌছেই তারা দেখল- পনর বিশজন ঘোড়সোওয়ার এবং তাদের পিছনে প্রায় দেড়শ' পদাতিক সৈন্য বন্দরের দিকে চলেছে। গংগুর টনক নড়ে উঠল। সঙ্গীদের নিয়ে সে একপাশে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সিপাইরা চলে গেলে সে তার সঙ্গীদের বলল- সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে নগরপতি বন্দরের দিকে যাচ্ছেন। তাদের গতিবেগ হতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এদের উদ্দেশ্য খারাপ। আমাদের ফিরে যেতে হবে।

কালু বলল- এরা যদি সত্যই খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে যায় তবে আমরা ফিরে গিয়ে কি করতে পারব? তাদের তো জাহাজের নোঙর তুলে পাল খোলার অবসরও হবে না। আমাদের নিজের পথ দেখা উচিত।

গংগু বলল- তুমি যদি আমার সাথে যেতে না চাও সে তোমার ইচ্ছা। কিন্তু আমি নিশ্চয় যাব। বন্দু ও মোতি, তোমরা যদি চাও তোমরাও যেতে পার।

উভয়ে সমস্বরে বলে উঠল- না, আমরা তোমার সাথে আছি।

কালু লজ্জিত হয়ে বলল- আমিও আপনার সাথেই আছি। কিন্তু আমরা কি করতে পারি?

গংগু জবাব দিল- সে আমরা ওখানে পৌছে দেখব।

মোতি বলল- মনে হচ্ছে জয়রাম নিজের উপকারীদের প্রতারণা করেছে। গংগু বলল-

হয়তো তাই। কিন্তু তার উদ্দেশ্য খারাপ থাকলে নিজের বোনকে ছেড়ে গেল কেন।

বসু বলল- সেটা বুঝা কষ্টকর নয়। তার বোনকে এ জন্য রেখে গেছে যে তার চলে যাবার পর আরবরা বন্দরে অবস্থান করার মত পরিবর্তন না করে। আমার তো মনে হয়, মেয়েটিও এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। দেখতে কত সরল। জাহাজে সেই আরব মেয়েটিকে সে বোন বলে ডাকতো।

গংগু বলল- আর জয়রাম খালিদকে ছোট ভাই বলতো। যখন যুবায়র অসুস্থ ছিল। সে সারাদিন রাত তার কাছে বসে থাকত। মিথ্যুক, প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক! একবার তাকে পেলে হয়। কিন্তু সে মেয়েটি? কালু, সে যেন আমাদের হাতছাড়া না হয়। তাকে ধরতে পারলে অনেক কাজ করিয়ে নিতে পারব। চল, শিগগির। কথা বলার সময় নেই।

যথাসাধ্য দ্রুতগতিতে গংগু ও তার সাথীরা বন্দরের দিকে অগ্রসর হলো।

॥ তিন ॥

আরব নাবিকগণ জাহাজের উপর মাগরিবের নামায পড়ে দু'আ করছিল। দিলীপ সিংহ নিজের জাহাজ থেকে তাদের জাহাজে এসে তাদের মনোযোগ তীরের দিকে আকর্ষণ করলেন। যুবায়র ও তাঁর সাথীরা তীরে সশস্ত্র সৈন্য সমাবেশ দেখে বিস্মিত হলেন। চারজন লোক এক নৌকা করে জাহাজে এসে সিন্ধী ভাষায় জানাল- দেবলের শাসনকর্তা প্রতাপ রায় আপনাদেরকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছেন।

প্রতাপ রায়ের বার্তাবাহকদের দিলীপ সিংহ জিজ্ঞেস করলেন- কিন্তু জয়রাম কোথায়?

সে উত্তর দিল- তিনি মহারাজ প্রতাপ রায়ের সাথে দেখা করার পর আপনাদের আতিথ্যের ব্যবস্থা করার জন্য স্বগৃহে চলে গিয়েছেন। মহারাজ স্বয়ং আপনাদের অভ্যর্থনার জন্য এসেছেন।

দিলীপ সিংহ আরবী ভাষায় যুবায়রকে বললেন- এটা নিশ্চয় প্রতারণা। কিন্তু এখন অবতরণ করা ছাড়া আমাদের আর উপায় নেই।

যুবায়র জবাব দিলেন- আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে দেবলের শাসনকর্তা এত সিপাই নিয়ে কেন এসেছেন? কিন্তু জয়রাম আমাকে প্রতারণা করবে আমি তা মনে করি না। তার বোন এ জাহাজে রয়েছে।

দূত পুনরায় জিজ্ঞেস করল- আমি মহারাজের কাছে কি জবাব নিয়ে যাব?

যুবায়র উত্তর দিলেন- আমরা তোমাদের সাথে আসছি।

যুবায়র ও দিলীপ সিংহ নৌকাযোগে তীরে পৌঁছলেন। দিলীপ সিংহ প্রতাপ রায়কে মাথা নত করে অভিবাদন করলেন। কিন্তু যুবায়র মাথা নত না করায় প্রতাপ রায়

বললেন- তাহলে তুমি আরববাসী গুরুজনকে সম্মান করা তোমাদের অভ্যাস নেই।

দিলীপ সিংহ উত্তর দিলেন- মানুষের কাছে মাথা নত করা এঁদের ধর্মানুসারে পাপ।

প্রতাপ রায় জবাব দিলেন- আমাদের কাছে থেকে এরা মানুষের সামনে মাথা নত করতেও শিখবে।

দিলীপ সিংহ বললেন- তার অর্থ?

প্রতাপ রায় উত্তর দিলেন- কিছু না। তোমাদের জাহাজে কি আছে?

দিলীপ সিংহ বললেন- জয়রাম নিশ্চয় আপনাকে সব বলেছে। আমাদের আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন?

জয়রাম যা বলেছে তা যদি সত্যি হয় তবে এ জাহাজ এখান থেকে যেতে পারবে না।

জাহাজ এখান থেকে যেতে পারবে না? তা কেন?

রাজার আদেশ।

দিলীপ সিংহ চারদিকে তাকালেন। যুবায়র ও তাঁর পাশে সশস্ত্র সৈন্যের চক্র সংকীর্ণ হয়ে এসেছিল। তিনি আরবী ভাষায় যুবায়রকে অবস্থাটা বুঝিয়ে বললেন। যুবায়রের নির্দেশ মত তিনি প্রতাপ রায়কে বললেন- এগুলো সিন্ধুর অসহায় নাবিকদের নৌকা নয়- যার উপর আপনি ইচ্ছামত অত্যাচার করতে পারেন। এগুলো আরবদের জাহাজ। এতে সেই জাতির বধূ ও কন্যাগণ আরোহী আছেন যারা উদ্ধত ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ঝড়ের মত পতিত হয় এবং মেঘের মত ঢেকে ফেলে। আকাশের বজ্রাঘাতে যারা ভয় পায় না। তারাও এদের অসি হতে আশ্রয় ভিক্ষা করে। প্রতাপ রায় ক্রোধান্ধ হয়ে তলোয়ার বের করলেন। দিলীপ সিংহ ও যুবায়র তলোয়ার টানার চেষ্টা করলেন কিন্তু কতকগুলো নগ্ন অসি এবং চকচকে বর্শা তাঁদের বাধা দিল। প্রতাপ রায় বললেন- তোমাকে, সিন্ধী মনে হচ্ছে। কিন্তু তোমার শিরায় কোন্ কাপুরুষ, প্রতারক ও ইতরের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে।

দিলীপ সিংহ জবাব দিলেন- অতিথিকে প্রতারণা করা পৃথিবীর জঘন্যতম শঠতা ও ইতরামী। আমার বলতে বাধবে না যে, তুমি...

দিলীপ সিংহের কথা শেষ হবার পূর্বেই প্রতাপ রায়ের অসির অগ্রভাগ তাঁর বুকে বিদ্ধ হয়। তিনি আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান। যুবায়র নত হয়ে তাঁকে হাতে ধরেন। শিউরে উঠে, তিনি যুবায়রের দিকে তাকিয়ে বললেন- ভাই যুবায়র, তোমার সাথে আমার যাত্রা শেষ হয়ে গেল। আমি মনের মধ্যে এক ভারী বোঝা নিয়ে যাচ্ছি। আমি অজ্ঞানতার আঁধারে পালিত হয়েছিলাম। আবুল হাসান আমাকে মানুষ করেছিল। তুমি আমার মনে ইসলামের জন্য গভীর মমতা সৃষ্টি করেছিলে। কিন্তু কেন জানি না এ পর্যন্ত আমি আমার মনের কথা প্রকাশ করতে ঘাবড়িয়েছি। লোকের দৃষ্টির আড়ালে আমি

নামায পড়েছি। গোপনে রোযা রেখেছি। কিন্তু প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা করতে সংকুচিত হয়েছি। আমি স্থির করেছিলাম বসরা পৌঁছে কলমায়ে তওহীদ পড়ে নেব। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা অন্যরূপ। আমার জন্য দু'আ করো। আমাকে ভুলে যেয়ো না। নাহীদের জন্য আমার বড় দুঃখ হয়। নির্দয়ভাবে শত্রুর হাত থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন। হাঁ... আমাকে ভুলে যেয়ো না। আমার জন্য দু'আ কর।

আর একবার হাত-পা খিচে দিলীপ সিংহ চোখ বন্ধ করলেন। কয়েকবার কলমায়ে তওহীদ উচ্চারণ করলেন। তাঁর স্বর ক্রমেই ক্ষীণ ও অস্পষ্ট হয়ে উলটিয়ে যাওয়া নয়ন এমন দেশের স্বপ্ন দেখছিল যেখান থেকে কোন যাত্রী ফিরে আসে না। দিলীপ সিংহ চির নিদ্রায় নিদ্রিত হলেন।

যুবায়র বলে উঠলেন- 'আমরা আল্লাহর এবং তাঁরই কাছে, ফিরে যাই'- (ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাহি রাজি'উন)। দিলীপ সিংহের মস্তক মাটিতে রেখে দিয়ে ঘৃণার চোখে প্রতাপ রায়ের দিকে তাকালেন।

সৈন্যরা নৌকায় উঠে তীর বর্ষণ করতে করতে জাহাজের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। প্রত্যুত্তরে জাহাজ থেকেও তীর বর্ষিত হচ্ছিল। যুবায়রের জন্য পলায়নের পথ বন্ধ ছিল। প্রতাপের ইঙ্গিতে আট-দশ জন সৈনিক তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে রজ্জু দ্বারা বেঁধে মাটিতে ফেলে দিল। যুবায়র বিমর্ষ নয়নে জাহাজের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

॥ চার ॥

জাহাজের উপর নাহীদের সাথে অন্যান্য আরব নারীরাও পুরুষদের পাশাপাশি আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করছিল। হাশিম বেশীক্ষণ অন্যান্য শিশুদের সাথে এক কোণে চুপ করে বসে থাকতে পারল না। উপরে এসে সে খালিদের কাছে দাঁড়াল। সে জিজ্ঞেস করতে লাগল- কতবার আমাদের জলদস্যুদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে?

কামানে শর বসাতে বসাতে খালিদ ফিরে তাকাল। হাশিমের কাছে মায়াদেবী উৎকণ্ঠিত ও হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। খালিদ বলল- মায়াদেবী, আপনি হাশিমকে নিয়ে নিচে যান।

মায়াদেবী হাশিমকে তুলে নিতে যাচ্ছিলেন এমন সময় সাঁ করে একটি শর এসে হাশিমের বুকে বিদ্ধ হলো। মায়াদেবী চট করে হাশিমকে এক পাশে শুইয়ে দিলেন এবং শরটি তার বুক থেকে বের করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। মৃদু দীর্ঘশ্বাস ও কম্পনের পর হাশিম চিরনিদ্রায় ঢলে পড়ল। মায়াদেবী ফোঁপাতে ফোঁপাতে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু পেছন থেকে এক মুক্ত হস্ত তাঁকে এমন কঠিনভাবে গ্রেফতার করল যে তিনি নড়তে পারলেন না।

চাঁদের ম্লান আলোকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন- কে? গংগু?

হাঁ, আমি। কালু, একে তুলে নাও। চীৎকার করলে এর গলা টিপে ধরবে।

কালু মায়াদেবীকে তুলে জাহাজের পিছনের দিকে এক রুজ্জুর সিঁড়ি বেয়ে নৌকায় আরোহণ করল।

গংগু অগ্রসর হয়ে খালিদের কাঁধে হাত রেখে বলল- এখন আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে লাভ নেই। বিপক্ষের সংখ্যা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। তা ছাড়া পেছন থেকে দু'টি জাহাজ আক্রমণ করতে অগ্রসর হচ্ছে। আমার নৌকা জাহাজের পেছনে লাগা আছে। তোমাকে ও নাহীদকে আমি বাঁচাতে পারি।

খালিদ জবাব দিল- সঙ্গীদের ছেড়ে আমি যেতে পারি না। কিন্তু তোমার বোনের সাথে তারা কি ব্যবহার করবে তা তুমি জান না।

কিন্তু জাহাজের সমস্ত স্ত্রীলোককে আমি বোন মনে করি। তাছাড়া জয়রামের প্রতারণার পর কারো উপর আমার আর বিশ্বাস নেই।

হঠাৎ একটি তীর নাহীদের গায়ে লেগে যাওয়ায় সে পাঁজরের উপর হাত রেখে বসে পড়ল। খালিদ অগ্রসর হয়ে তাকে তুলবার চেষ্টা করল। কিন্তু নাহীদ বলল- আমি ঠিক আছি। খালিদ তুমি আমার চিন্তা কর না।

তার প্রতিবাদ সত্ত্বেও খালিদ তাকে তুলে হাশিমের কাছে বসিয়ে দিল। হাশিমের লাশ দেখে নাহীদ নিজের আঘাত ভুলে গেল। তাকে ঝাঁকিয়ে চীৎকার দিতে গভীর শোক সন্তপ্ত স্বরে বলে উঠল- হাশিম, তুমি কেন উপরে এলে?

নাহীদের অজ্ঞাতসারেই গংগু নাহীদের পাঁজর থেকে তীর টেনে বের করে ফেলল এবং বসুকে বলল- একে তুলে নাও।

বসু নাহীদকে তুলতে নত হল। কিন্তু খালিদ অগ্রসর হয়ে তাকে পিছে ঠেলে দিল। সে বলল- তুমি, জয়রাম এবং এই সেপাই বিভিন্ন পথে এসেছ। কিন্তু তোমাদের সবার উদ্দেশ্য এক। যাও, আমরা তোমাদেরকে একবার ক্ষমা করেছি।

গংগু বলল- বৎস, কথা বলার সময় থাকলে আমি তোমার সন্দেহ দূর করতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু শত্রুর চক্র আমাদের চতুর্দিকে সংকীর্ণ হয়ে আসছে। আর কয়েক মুহূর্ত অপব্যয় করলে পলায়নের সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে যাবে। দুঃখের বিষয় আমি তোমাদের ভাববার সময়ও দিতে পারছি না। মা, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। বলেই গংগু হঠাৎ একটি ছোট লাঠি দ্বারা খালিদের মাথায় আঘাত করল। খালিদ টলে পড়ে যাচ্ছিল। গংগু তাকে কাঁধে তুলে নিলো। বসু নাহীদকে তুলে নিল। গংগু মোতিকে বলল- এ কামানগুলো তুলে নিয়ে এস। কাজে আসবে।

হানাদাররা রুজ্জুর ফাঁদের সাহায্যে জাহাজে উঠছিল। তীরের যুদ্ধ এখন অসিযুদ্ধে পরিবর্তিত হয়েছিল। হাঙ্গামায় নাহীদ, খালিদ ও মায়াদেবীর অপহরণ কেউ লক্ষ্য করে নি। এরা নৌকায় উঠতে উঠতে পিছন থেকে কয়েকটি নৌকা জাহাজের কাছে পৌছে

গিয়েছিল। গংগু সাথীদের নিয়ে সিন্ধী ভাষায় হা হা হু শব্দ করে হানাদারদের মনে সন্দেহের কোন অবসর দিল না। অতি কষ্টে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে জাহাজ থেকে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে গেল।

গংগুর নির্দেশ মত মায়াদেবী তার ওড়না ছিঁড়ে নাহীদের ক্ষতস্থান বেঁধে দিলেন। খালিদকে সঙ্গে দেখে সে কোথায় যাচ্ছে সে সম্বন্ধে কোন চিন্তাই হল না। গংগু পানিতে কাপড় ভিজিয়ে খালিদের মাথায় লাগাচ্ছিল। কয়েক মুহূর্ত পূর্বে যাকে ভীষণ শত্রু মনে হচ্ছিল মায়ার চোখে তাকে এখন সহানুভূতিশীল বন্ধু প্রতিভাত হচ্ছিল।

নৌকা বিপদের পাল্লা থেকে সরে এসেছিল। মায়া গংগুর সাথে কথা বলবে না স্থির করেছিল। তা সত্ত্বেও সে বারবার জিজ্ঞেস করছিল- এর আঘাত তো কঠিন হয়নি? কি করে ইনি অচেতন হল?

গভীর দুঃখে মগ্ন থাকায় নাহীদ কোন কথা বলছিল না। হতভম্ব হয়ে সে মাঝে মাঝে তার ভাইয়ের দিকে তাকাচ্ছিল। গংগু বলল- মা, তুমি চিন্তা কর না। এখনি তোমার ভাইয়ের হুঁশ হবে। আমি তোমাদের শত্রু নই, দেবতার দোহাই দিয়ে বলছি। নাহীদ নীরবে শুনে যেতে লাগল।

পরে মায়ার দিকে ফিরে গংগু বলল- মায়া, তুমি রাজপুত কন্যা। রাজপুত কখনো মিথ্যা শপথ গ্রহণ করে না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, তোমার ভাই এদেরকে প্রতারণা করবে তোমার এরূপ সন্দেহ ছিল কি?

না, না। আমার ভাই এরূপ নন। আমি ভগবানের নামে শপথ নিয়ে বলতে পারি।

যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে?

তাহলে আমি- কুয়ায় লাফিয়ে প্রাণ দেব। আগুনে পুড়ে মরব। নিজের হাতে গলায় ফাঁস দেব। ভগবানের দোহাই এমন কথা বলো না।

মায়াদেবীর অশ্রুবাণ নাহীদকে অভিভূত করল। সে বলল- মায়া, তুমি এসব কথা কানে তুলো না। তোমার উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তোমার ভাই যদি আমাদেরকে প্রতারণাও করে থাকে তাতে তোমার অপরাধ কি?

আমি আবার বলব আমার ভাই ওরকম লোক নন। তাঁর শিরায় রাজপুত রক্ত। তিনি এতোটা অকৃতজ্ঞ হতে পারেন না।

যে আমাদের জোর করে জাহাজ থেকে নামিয়ে এনেছে এবং অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাচ্ছে- এখন সেই আমাদের শত্রু।

ব্যথিত স্বরে গংগু বলে- হায়, মা, আমি যদি সব নারী ও শিশুদের আমার সাথে নিয়ে আসতে পারতাম। কিন্তু এ নৌকায় কেবল এ কয়জনের মতই স্থান ছিল। তুমি যুবতী। নির্দয় শত্রুর হাত থেকে তোমাকে আমি বাঁচাতে চাই। আর মায়াদেবী, তুমি হয়তো বাকী সবাইকে বাঁচাতে পারবে। তোমার মুক্তির বিনিময়ে আমি অন্য সব

যাত্রীদের মুক্ত করতে চাই।

খালিদের সংজ্ঞা ফিরে এল। হতভম্বের মত সে চারদিকে তাকাতে লাগল। অতীত ঘটনা মনে আসতেই সে উঠে বসল। আহত মাথায় হাত রেখে বলল- আমাদের জাহাজ কোথায়? আমরা কোথায় যাচ্ছি? গংগু, গংগু, যালিম, প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক! তুমি আমাদের সাথে এরূপ ব্যবহার করলে কেন? তারা কি বলবে? তুমি আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

গংগু ধীরে স্থিরে জবাব দিল- কারো গালি শুনে ক্রুদ্ধ না হওয়া আমার জীবনে এই প্রথম। তোমার যা ইচ্ছা তা আমাকে বল। কিন্তু আমি অন্যায় করিনি। আমি কেবল মায়াকে নিয়ে যেতে এসেছিলাম। কিন্তু তোমার বোনকে আহত দেখে তাকে শত্রুর দয়ার উপর ফেলে যেতে মন চাইল না।

খালিদ ঘৃণাভরে মায়ার দিকে তাকিয়ে বলল- এবার বুঝেছি। জয়রাম একদিকে আমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য সৈন্য পাঠিয়েছে; অপর দিকে মায়াকে নিয়ে যাবার জন্য তোমাকে পাঠিয়েছে। এর অর্থ- দস্যু-সর্দার তুমি নও, জয়রাম।

তুমি সত্য বলছ। কিন্তু আমি তওবা করেছি। সে তওবা করেনি। সম্ভবত তার বোনের খবর পেয়ে সেও তওবা করবে।

তাহলে তুমি আমাদেরকে তার কাছে নিয়ে যাচ্ছ না?

তুমিই দেখতে পাচ্ছ। বন্দর কোনদিকে আর আমরা কোনদিকে যাচ্ছি।

তাহলে তুমি আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে?

এমন এক স্থানে যেখানে রাজার সৈন্য পৌঁছতে না পারে।

খালিদ বলল- তোমার উদ্দেশ্য যদি অসৎ না হয় তাহলে আমাদের সঙ্গীদের কাছে আমাদের নিয়ে যাও।

গংগু বলল- তোমাদের সাথীরা কিছুক্ষণের মধ্যেই দেবলের কারাগারে বন্দী হবে। বন্দী না হয়ে বাইরে থাকলে তোমরা তাদের সাহায্য করতে পারবে বেশী।

খালিদ খানিকটা আশান্বিত হয়ে বলল- তুমি সত্যি সত্যি তাদের সাহায্য করতে চাও?

গংগু জবাব দেয়- বৎস, তোমার সাথে মিথ্য বলার আমার কি প্রয়োজন ছিল? আমি তোমাদের শত্রু হলে এ রকম শান্তভাবে নিশ্চয় গালি শুনতাম না।

পরদিন নৌকা সিন্ধু নদীর মোহনায় পৌঁছে গেল। গংগুর পূর্ব সঙ্গীরা সেখানে মাছ ধরার কাজে রত ছিল।

॥ এক ॥

পরদিন কুঠরির দরজা উন্মুক্ত হলো। প্রহরীরা জয়রামকে করজোড়ে প্রণাম করে বলল- সর্দার প্রতাপ রায় আপনাকে ডেকেছেন।

প্রহরীদের ব্যবহারের এ পরিবর্তন দেখে জয়রাম বিস্মিত হলো। নীরবে তিনি তাদের সাথে চললেন। প্রতাপ রায় তাঁর সভাগৃহের বারান্দায় আবলুসের কুরসীর উপর আসীন ছিলেন। তাঁর সম্মানে এক চান্দীর বর্তনে বিগত সন্ধ্যায় আরবদের জাহাজ থেকে লুণ্ঠিত লংকা রাজের উপঢৌকনসমূহ রক্ষিত ছিল।

জয়রামকে দেখেই তিনি মণিরত্নের স্তূপের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন- জয়রাম, কাঠিয়াওয়াড় রাজের উপঢৌকনের চেয়ে লংকা-রাজের উপঢৌকন দেখে মহারাজ অধিকতর আনন্দিত হবেন। এর এক একটি হীরক তোমার সিন্দুকের সমস্ত রত্নের চেয়ে বেশী মূল্যবান।

জয়রাম তার দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে নিজের ঠোঁট কামড়াতে লাগলেন।

প্রতাপ রায় বললেন- কিন্তু তোমার মুখ ফ্যাকাসে ও চোখ রক্তাক্ত দেখাচ্ছে। বোধ হয় সারারাত তোমার ঘুম হয়নি। কুঠারিতে খুব গরম লেগে থাকবে। বন্দর থেকে ফিরে তোমার কথা আমার মনে পড়েনি। নচেৎ এতোক্ষণ তোমাকে সেখানে রাখার প্রয়োজন ছিল না। আমি মহারাজের কাছে দূত পাঠিয়ে দিয়েছি। কয়েক দিনের মধ্যেই বন্দীদের সম্বন্ধে তাঁর হুকুম পৌঁছে যাবে।

জয়রাম বললেন- তা হলে আপনি তাদের বন্দী করেছেন?

হাঁ। কালই আমি তোমাকে বলেছিলাম যে তাই ছিল রাজার হুকুম।

আপনি তাদেরকে যুদ্ধ করে বন্দী করছেন, না আতিথেয়র দাওয়াত দিয়ে? প্রতাপ রায় জবাব দিলেন- তুমি এখনো শিশু। যুদ্ধের সব কিছু সংগত। আমার বোন কোথায়?

কে?

আমার বোন।

সে কোথায় ছিল?

আপনি আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করবেন না। রাজপুত-কন্যার সম্মানে হস্তক্ষেপ করা তত সোজা নয় যত আপনি মনে করছেন। আমি পূর্বে আপনার রাজার

কর্মচারী ছিলাম। এখন কাঠিয়াওয়াড় রাজের রাষ্ট্রদূত হিসাবে এখানে এসেছি। আপনি আমার বোনের দিকে যদি চোখ তুলেও তাকান, তাহলে কাঠিয়াওয়াড় থেকে রাজপুতানা পর্যন্ত এক দুর্ভেদ্য আগুনের দেয়াল তুলে দেব। শত সহস্র সৈনিকের প্রাণ বিসর্জনের চেয়ে তখন মহারাজ দেবলের উদ্ধত শাসনকর্তাকে আমাদের হাতে সমর্পণ করা অধিকতর সংগত মনে করবেন। তারপর আরবদের কথা। তাঁরা আমাদের অতিথি ছিলেন। দুঃখের বিষয় আমার জন্য তাঁদেরকে এ বিপদে পড়তে হলো। হয়তো তাঁদের সম্বন্ধে আমার নালিশ ভারতের কোন প্রান্তরে শ্রুত হবে না। কিন্তু তাঁদের বাহু যথেষ্ট দীর্ঘ ও সবল। তাঁরা যখন চাইবেন তখনই আপনার গলা টিপে মারতে পারবেন।

রাজার অসংগত হুকুম পালন করতে গিয়ে অনেক সময় কর্মচারীদেরকেই তার পরিণাম ভুগতে হয় একথা প্রতাপ রায়ের জানা ছিল। বিপদের সময় রাজা নিজের অপরাধ কর্মচারীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে থাকেন। আরবদের সম্বন্ধে তিনি নিজের রাজার মতই নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু কাঠিয়াওয়াড়ের রাষ্ট্রদূতের বোনের দায়িত্ব নিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বললেন- জয়রাম, তোমার ধমক আমি মোটেই পরোয়া পরি না। তবে তোমাকে আমি নিশ্চিত জানিয়ে দিতে চাই তোমার বোন সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।

আপনি মিথ্যা বলছেন। আমি তাকে জাহাজে আরব নারীদের কাছে রেখে এসেছি।

জাহাজে যে সব নারী ছিল তারা সকলেই আমাদের বন্দী। তোমার বোন যদি, তাদের মধ্যে থাকেন, তবে আমি এখনই তোমার সাথে গিয়ে তাঁর নিকট ক্ষমা ভিক্ষে করে নেব। চল।

বোনের খবর নেয়ার আগ্রহ তাঁর অন্য সব ইচ্ছার উপর প্রবল ছিল। কাজেই তিনি প্রতাপ রায়ের সাথে চললেন। পথে তিনি জিজ্ঞেস করলেন- আপনি আরব নাবিকদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন?

প্রতাপ রায় জবাব দিলেন- তারা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করেছিল। শিশু ও নারী ছাড়া আমি কেবল পাঁচজন লোককে জীবন্ত বন্দী করতে সমর্থ হয়েছি। দ্বিতীয় জাহাজের লংকাবাসী নাবিকগণ সাধারণভাবে বাধা দেয়। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই পরাজয় স্বীকার করে।

তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় যে আপনি একই সময়ে লংকা ও আরবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

আমি কেবল রাজার হুকুম পালন করেছি। যতদিন আমি এ পদে বহাল থাকি তাঁর আদেশ পালন করতেই থাকব। আমার চিঠির উত্তরে যদি রাজা তোমাকে ডেকে পাঠান এবং তুমি যদি বন্দীদের মুক্তির অনুমতি আদায় করতে পার তাহলে আমি খুশী হবো। অহেতুক দায়িত্ব থেকে বেঁচে যাব।

প্রসাদ থেকে বের হয়ে কয়েক কদম দূরেই জয়রাম ও প্রতাপ রায় কয়েদখানার প্রাচীরে প্রবেশ করলেন। প্রতাপ রায়ের নির্দেশে প্রহরীরা আরব বন্দীদের কামরা খুলে

দিলো। মেয়েরা মুখ ঢেকে ফেলল। আরক নাবিকগণ জয়রামকে দেখেই মুখ ফেরাল। যুবায়র এক কোণে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তিনি জয়রামের দিকে তাকালেন এবং নিজের সঙ্গীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

জয়রাম প্রতাপের দিকে তাকিয়ে বলল- আমার বোন এখানে নেই। কোথায় সে?

প্রতাপ রায় এক প্রহরীকে ভেতরে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন- সব মেয়েরা এখানে আছে না লংকার নাবিকদের ঘরেও কোন স্ত্রীলোক আছে?

না মহারাজ, সব স্ত্রীলোক এখানে।

জয়রাম হতভম্ব হয়ে যুবায়রের দিকে তাকালেন। ভাঙ্গা ভাঙ্গা আরবীতে বললেন- যুবায়র, আমার দিকে ওভাবে তাকিয়ো না। আমি নির্দোষ। আমার বোন কোথায় তোমার জানা আছে।

হঠাৎ যুবায়রের মুখ থেকে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের গর্জন বের হলো। তুমি আমার প্রত্যাশার চেয়েও ইতর প্রমাণিত হয়েছ। মিথ্যার জাল দিয়ে তুমি সত্য লুকাতে পারবে না। কিন্তু মনে রেখ, যদি নাহীদের কেউ কেশ স্পর্শ করে, তাহলে সারা দুনিয়ায় তুমি এতটুকু স্থান পাবে না যেখানে আমাদের প্রতিরোধ থেকে তুমি নিরাপদ। নাহীদকে ফাঁদে ফেলবার জন্যই তোমার বোনকে জাহাজে রেখে এসেছিলে। তোমার কৌশল সফল হয়েছে। তুমি তোমার এই সহযোগীকে আমাদের আতিথ্যের ভার নেয়ার জন্য পাঠিয়ে আমাদেরকে জাহাজ থেকে ডেকে এনেছিলে। নিজে পেছন দিয়ে জাহাজে গিয়ে না জানি কোন অজুহাতে নাহীদকে কোথায় নিয়ে গিয়েছ। শান্তি ও যুদ্ধের নীতি যদি তোমাদের এই হয়, তবে মনে রেখ তোমাদের রাজার দিন ঘনিয়ে আসছে।

প্রতাপ রায় হঠাৎ সিপাইর হাত থেকে চাবুক টেনে নিয়ে সপাং করে যুবায়রের মুখে মেরে দিলেন। তিনি দ্বিতীয় আঘাতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন কিন্তু জয়রাম তার হাত ধরে ফেললেন। প্রতাপ রায় হাত ছাড়াতে চেষ্টা করতে করতে বললেন- রাজার অপমান তুমি সহ্য করতে পার, আমি পারি না।

জয়রাম বললেন- আমি তোমাকে শেষবারের মত জিজ্ঞেস করছি- আমার বোন ও সেই আর মেয়েটিকে তুমি কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?

এ প্রশ্নে প্রতাপ রায়ের ক্রোধ শীতল হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি বলেন- এটা কি অসম্ভব যে আমাদের আক্রমণের সময় প্রতিশোধের উত্তেজনায় তাঁকে জাহাজ থেকে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে?

জয়রাম জবাব দেন- এঁরা শত্রুতা করতে গিয়ে ভদ্রতা ভুলে যান না। আমার বোনের সঙ্গে আরব কন্যাটির নিখোঁজ হওয়া প্রমাণ করছে এ ষড়যন্ত্রের পেছনে তোমার ন্যায়ই তাদের বুদ্ধি খেলা করছে।

যুবায়র পুনরায় জয়রামকে বলেন- এসব কথা দিয়ে তুমি আমাকে বোকা বানাতে পারবে না। নাহীদ, খালিদ এবং তোমার কোন এক সঙ্গে জাহাজ থেকে অদৃশ্য হয়েছে।

নিশ্চয় তারা তোমাদের বন্দী। তোমাদের কাছে আমি কোন সদ্ব্যবহার আশা করছি না। তবে এটুকু নিশ্চয় বলব আমাদেরকে সিন্ধু রাজের দরবারে পেশ করা হোক। যতক্ষণ তিনি আমাদের সম্বন্ধে মীমাংসা না করেন ততক্ষণ নাহীদ ও খালিদকে আমাদের সাথে রাখা হোক।

প্রতাপ রায় চমকে উঠলেন। তিনি বললেন- এখন বুঝেছি, জয়রাম। মেয়ে দু'টির সাথে অন্য লোকও নিখোঁজ হয়ে থাকলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। গত রাত্রে বন্দর থেকে একটি সরকারী নৌকা হারিয়ে গেছে। কিন্তু তারা বেশী দূর যেতে পারেনি। তুমি আমার সঙ্গে এসো।

প্রতাপ রায় ও জয়রাম বন্দীশালা থেকে বের হয়ে ঘোড়ায় চড়লেন। ক্ষিপ্রগতিতে তারা বন্দরে পৌঁছলেন। সন্ধ্যার সময় নৌকা খোয়া যাবার কথা বন্দরের প্রহরীরা সমর্থন করল। জয়রাম মায়াদেবী সম্বন্ধে অধিকতর উদ্বিগ্ন হলেন। প্রতাপ কয়েকটি নৌকা ও জাহাজ উপকূলের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে খোঁজ নেয়ার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। জয়রামকে তিনি এই বলে সান্ত্বনা দিলেন যে, তারা বেশী দূর যেতে পারেনি। জয়রাম প্রতাপ রায়ের সাথে শহরে চলে এলেন।

বিকাল পর্যন্ত মায়ার কোন খবর না পেয়ে জয়রাম আবার বন্দরে যাবেন স্থির করলেন। ইতিমধ্যে প্রতাপ রায়ের সেপাই এসে তাকে প্রাসাদে নিয়ে গেল।

॥ দুই ॥

প্রতাপ রায়ের প্রাসাদের পাইনকুঞ্জে যুবায়র এবং আলীকে দু'টি নারকেল গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল। প্রতাপ রায়, কয়েকজন সেপাই এবং চাবুক হস্তে দু'জন জল্লাদ নিকটে দন্ডায়মান ছিল। আলী এবং যুবায়রের নত শির ও নগ্ন বুকের উপর আঘাতের চিহ্ন সূচনা করছিল যে তাদেরকে অসহ্য শারীরিক শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এক সেপাই জয়রামের আগমনবার্তা জানাতেই প্রতাপ রায়ের ইঙ্গিতে জল্লাদেরা আলী ও যুবায়রকে আবার চাবুক মারতে শুরু করল। যুবায়র নিষ্প্রাণ প্রস্তরের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন কিন্তু আলীর ধৈর্যের সীমা শেষ হয়ে গিয়েছিল। চাবুকের প্রত্যেক আঘাতের সাথে সাথে তার মুখ থেকে মর্মান্তিক চিৎকার বেরুচ্ছিল।

বাইরের দরজায় পা রাখতেই জয়রামের মনোযোগ আলীর চীৎকারে আকর্ষিত হয়। তিনি দৌড়ে গিয়ে পর পর উভয় জল্লাদকে ঠেলে সরিয়ে দেন। প্রতাপ রায়ের দিকে ফিরে তিনি বললেন- এ নিছক অত্যাচার। এ পাপ। আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এদের বিচারের ভার রাজার উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

প্রতাপ রায় আলীর দিকে দেখিয়ে উত্তর দেন- সিপাইরা এ বালককে শহর থেকে খুঁজে বের করেছে। মনে হচ্ছে সে তোমার বোনের সাথেই জাহাজ থেকে পলায়ন করেছিল। এর বাকী সঙ্গীরা শহরের আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে আছে। জয়রাম অগ্রসর

হয়ে আলীকে জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কোথায় ছিলে? আমার বোন কোথায়?

আলী মিনতিপূর্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে মাথা নত করে নিল।

জয়রাম বলেন- মায়াদেবী সম্বন্ধে তোমার কিছু জানা থাকলে বলে দাও। আমি তোমাকে বাঁচাতে পারি।

আলী আবার মাথা তুলে চিৎকার করে বলল- আমি জানি না। আমি সত্যি বলছি। তার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। আমি জাহাজ থেকে লাফ দেবার আগে তাদের খুঁজেছিলাম। কিন্তু আমি জানি না তারা কি করে উধাও হয়ে যায়।

জয়রাম জিজ্ঞেস করেন- তুমি শহরে কি করে পৌঁছলে?

আমি জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়ে সমুদ্রের তীরে এক নৌকায় লুকিয়েছিলাম। আজ আমি শহরে পৌঁছি এবং সেপাই আমাকে ধরে এখানে নিয়ে আসে। তোমরা সবাই যালিম। আমি তোমাদের কাছে কোন অপরাধ করিনি। জয়রাম যুবায়রের দিকে তাকালেন। কিন্তু উৎকণ্ঠা, ক্রোধ, লজ্জা ও দুঃখের আতিশয্যে তাঁকে সম্বোধন করার ভাষা খুঁজে পেলেন না। একবার চোখ তুলে আবার নামিয়ে নিলেন। একবার কেঁপে উঠে তার ওষ্ঠ আবার থেমে গেল। প্রতাপ রায়ের দিকে ফিরে তিনি বললেন- এদের ছেড়ে দিন। এদের প্রতি আমার কোন সন্দেহ নেই। প্রতাপ রায় বলেন- আমি এদের কি করে ছাড়তে পারি? তোমার বোন জাহাজে থেকে থাকলে এরা নিশ্চয় জানে সে কোথায় আছে। তুমি হয়তো এখনো আমাকে অপরাধী মনে করছ। আমি এদের কথা দ্বারা তোমার কাছে প্রমাণ করা আমার কর্তব্য মনে করছি যে, তোমার বোনকে এরাই লুকিয়ে রেখেছে। সে যদি জীবিত না থাকে তাহলে এরাই জাহাজ আক্রমণের পূর্বে তাকে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে। এখন হয় এদেরকে স্বীয় অপরাধ স্বীকার করতে হবে নচেৎ তোমাকে স্বীকার করতে হবে যে তোমার বোন আদৌ জাহাজে ছিল না এবং তুমি আমাকে ভয় দেখাবার জন্য ছুতা খুঁজছিলে।

প্রতাপ রায় আবার জল্লাদের ইঙ্গিত করায় তারা পুনরায় যুবায়র ও আলীকে চাবুক মারতে লাগল। জয়রাম চিৎকার করে বললেন থাম, থাম। এরা নিরপরাধ। এ অত্যাচার। এদেরকে ছেড়ে দাও।

কিন্তু তার চিৎকার বিফল হলো। তিনি অগ্রসর হয়ে এক জল্লাদের মুখে ঘুষি মারলেন। কিন্তু প্রতাপ রায়ের ইঙ্গিতে কয়েকজন সিপাই তাঁকে ধরে সরিয়ে দিল। তিনি সিপাইদের হাত হতে নিষ্কৃতি পাবার জন্য চেষ্টা করছিলেন। আলী চীৎকারের পরিবর্তে অর্ধ অচেতন অবস্থায় কোঁকাচ্ছিল। যুবায়র প্রত্যেক চাবুকাঘাতের পর জয়রামের দিকে তাকাতেন ও চোখ বন্ধ করে নিতেন। অবশেষে আলীর কোঁকাবার শব্দও বন্ধ হয়ে গেল এবং মাথা তোলা বা চোখ খোলার শক্তি যুবায়রের রইল না।

প্রতাপ রায় এক সিপাইকে উত্তপ্ত লৌহ-শলা আনবার হুকুম দিলেন। জয়রাম আবার চিৎকার করে বললেন- প্রতাপ তুমি যালিম। তুমি ইতর। আমাকে যা ইচ্ছা শাস্তি দাও।

কিন্তু এদের প্রতি দয়া কর।

প্রতাপ রায় গর্জন করে বললেন- তোমার গালি আমি গ্রাহ্য করি না। তোমার বিচারের ভার মহারাজের উপর ছেড়ে দেব। কিন্তু এদের প্রাণ যখন আমার কবলে। আমি এদের চোখ উপড়ে ফেলব। হাড়ের মাংস খামচে ছিঁড়ে ফেলব। এরা জীবিত থাকবে আর মহারাজের কাছে গিয়ে তুমি তোমার বোনকে অপহরণের দায়িত্ব আমার উপর চাপাবে, তা হতে পারে না। তোমার বোন জাহাজ থেকে নিখোঁজ হয়ে থাকলে আমি নিশ্চয়ই তার সন্ধান বের করব। তার জন্য যদি এদের সমস্ত নারী ও শিশুদের সাথে আমাকে এরূপ ব্যবহার করতে হয় তবুও দ্বিধা করব না।

সিপাই তপ্ত লৌহ-শলাকা প্রতাপ রায়ের হাতে দিল এবং তিনি যুবায়রের দিকে অগ্রসর হলেন। জয়রাম উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠলেন- না, না, থামো। আমার বোন জাহাজে ছিল না। আমি একাই এসেছিলাম। আমি শুধু এদের প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছিলাম।

প্রতাপ রায় জবাব দিলেন- কিন্তু আমি কিভাবে বিশ্বাস করবো রাজার সামনে তুমি এরূপ কাহিনী বলে তাঁকে আমার বিরুদ্ধে উস্কাবে না?

জয়রাম বললেন- আমি প্রতিজ্ঞা করছি। রাজপুতের প্রতিজ্ঞা। আমাকে বিশ্বাস কর।

জাহাজ থেকে কোন আরব বালিকা উধাও হয়নি সে সাক্ষ্যও তোমাকে দিতে হবে।

তুমি এদের রেহাই দিলে আমি সে প্রতিশ্রুতি দিতেও রাজী আছি। এদেরকে ছাড়া বা না ছাড়া সম্পূর্ণ রাজার উপর নির্ভর করে। আমি শুধু এই বলতে পারি যে ভবিষ্যতে এদের উপর কোন অত্যাচার করা হবে না। তোমাকে রাজার সামনে স্বীকার করতে হবে তুমি এদেরকে মুক্ত করার জন্য আমার উপর চাপ দিয়েছিলে এবং নিজের বোনের কথা শুধু ছল ছিল।

পরাজিতের ন্যায় জয়রাম বললেন- আমি তার জন্যও প্রস্তুত আছি। লৌহ-শলাকা ফেলে দিয়ে প্রতাপ রায় বললেন- তুমি অনর্থক আমাকে হয়রান করেছ।

॥ তিন ॥

যুবায়র সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে চোখ খুললেন। তিনি বন্দীশালায় আলীর কাছে পড়েছিলেন। জয়রাম ঠান্ডা পানির বালতিতে রুমাল ভিজিয়ে তার ঘা'গুলো ধীরে ধীরে মুছে দিচ্ছিলেন। এক নারী আলীর সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছিল। যুবায়র চেতনা ফিরে আসার সাথে সাথে উঠে বসলেন। জয়রাম তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা পানি তাঁর ঠোঁটের কাছে ধরলেন। মুহূর্তের জন্য যুবায়ের মনে ক্রোধ ও ঘৃণা চাড়া দিয়ে উঠল। কিন্তু জয়রামের চোখে অশ্রু দেখে তিনি আত্মসংবরণ করলেন এবং কয়েক ঢোক পানি খেয়ে নিলেন। জয়রাম শুধু বললেন- যুবায়র, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। বলার সাথে সাথেই

তার সুন্দর চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হলো। যুবায়র বিষন্ন মুখে হাসি আনার চেষ্টা করে বললেন- জয়রাম, তুমি আমার কাছে এক অবোধ ধাঁধা। দেবলের শাসনকর্তার সাথে ষড়যন্ত্র করে তুমি আমাদের এ অবস্থায় এনেছ। তারপর আমাদের জন্য জল্লাদের সাথে সংঘর্ষ বাধালে। এখন আবার অশ্রু ফেলছ। কিন্তু এসবের অর্থ কি?

জয়রামের কণ্ঠ হতে গভীর বিষাদমাখা স্বর বের হলো- যুবায়র, আমাকে বিশ্বাস কর। আমি তোমাদের বন্ধু। তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছিলে। রাজপুত কখনো নিমকহারাম হয় না। দেবলপতি আমাকে প্রতারণা করেছে। তোমাদের জাহাজ আক্রমণের পূর্বে আমাকে এক কুঠুরীতে বন্দী করে রাখে। তুমি আমার উপর বিশ্বাস হারিয়েছ। আমাকে বিশ্বাসঘাতক মনে করছ। কিন্তু আমি নিরপরাধ। ভগবান সুযোগ দিলে আমি এটা প্রমাণ করতে পারব।

তুমি যদি এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত না হয়ে থাক তবে আমি জিজ্ঞেস করি- নাহীদ ও খালিদ কোথায়?

জয়রাম জবাব দেন- তুমি যেমন মায়া সম্বন্ধে কিছু জান না, তেমনি আমি খালিদ ও নাহীদ সম্বন্ধে কি বলতে পারি? আমি তোমাকে বলেছি আমি সারারাত বন্দী ছিলাম। তুমি জাহাজে ছিলে। বন্দর থেকে সে রাত্রে একটি নৌকাও হারিয়ে গিয়েছে। যদি যুদ্ধের পূর্বে তুমি তাদের কোথাও পাঠিয়ে থাক, ভগবানের দোহাই, আমার কাছে লুকিয়ো না। আমার বিশ্বাস, প্রতাপ রায়ের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য তুমি তাদের কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছ। শুধু আমাকে একটু বল মায়া জীবিত আছে এবং নিরাপদে আছে। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি- তোমার উপর কোন আঁচড় লাগতে দেব না। আমি প্রতাপ রায়কে আশ্বাস দিয়েছি তোমার বোন আমার সঙ্গে ছিল না। নয়তো সে আজ তোমাকে ছাড়ত না।

যুবায়র জবাব দিলেন- হায়, আমি যদি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারতাম। তোমরা দু'জন মিলে নাহীদকে লুকিয়ে রেখে মায়ার দায়িত্ব আমার উপর এ জন্য চাপাচ্ছ যেন আমরা নাহীদ ও খালিদের কথা রাজাকে বলতে না পারি।

জয়রাম বলেন- যুবায়র, আমাকে বিশ্বাস কর। তোমার সাথে মিথ্যা বলে আমার কোন লাভ নেই। তুমি ও তোমার সাথীরা যদি মায়া ও নাহীদ সম্বন্ধে কিছু না জান তবে সেটা প্রতাপ রায়ের শঠতা। আজ সে আমার সামনে তোমাদের উভয়কে এ জন্য যন্ত্রণা দিচ্ছিল যেন ভবিষ্যতে আমি মায়া ও নাহীদের নাম না নিই। আমাকে এজন্য প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছে। তুমি হয়ত জান রাজপুত ভাইয়ের পক্ষে নিজের বোন সম্বন্ধে এরূপ প্রতিজ্ঞা করা কতটা কষ্টকর।

যুবায়র জবাব দেন- তোমার দয়ার জন্য ধন্যবাদ। এখন আমরা তোমাদের তলোয়ারের প্রহরায় আছি। তোমার সত্য মিথ্যা আমাদের জন্য সমান। আমি তোমার সত্য ভাষণের পুরস্কার বা মিথ্যা কথনের শাস্তি দিতে অক্ষম। আমি শুধু এতটুকু জানি তোমার জন্যই আমি এই বিপদে পতিত হয়েছি। যতক্ষণ আমি নাহীদকে না দেখছি

ততক্ষণ তোমাকে বিশ্বাস করতে পারছি না। দেবলের হাকিমকেও না। ভবিষ্যতে যদি প্রমাণিত হয় এ ব্যাপারে তুমি নির্দোষ ছিলে, আমার সন্দেহের জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাইব। দেবলের শাসনকর্তা যদি অপরাধী হয় তাহলে যাতে আমাদের আবেদন রাজার কানে পৌছে সে চেষ্টাই তোমার দেখা উচিত। তোমাকে আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি আমি বা আমার সাথীরা নাহীদ, খালিদ বা তোমার বোন সম্বন্ধে কিছুই জানে না। অপর জাহাজ থেকে লংকার নাবিকগণ আমাদের জাহাজ হতে কয়েকজন লোককে এক নৌকায় উঠতে দেখেছে। সে নৌকা দক্ষিণ দিকে অদৃশ্য হয়ে যায়। যদি তাদেরকে সে নৌকায় অপহরণ করা হয়ে থাকে তবে ব্যাপার স্পষ্ট। নৌকা আমাদের জাহাজের নয়। বন্দর থেকে নৌকা উধাও হয়েছে। সে নৌকা কে এনেছিল তা বন্দরের লোকদের জানা উচিত।

জয়রাম নিজের মাথায় হাত মেরে বললেন- প্রতাপ! ইতর, প্রতারক, যালীম, কাপুরুষ।- যুবায়র, ভগবানের দোহাই আমার অপরাধ মাফ কর। আমি তোমার উপর সন্দেহ করেছিলাম। আমি লজ্জিত।

জয়রামের কথার চেয়ে তার অশ্রু-সজল চোখ যুবায়রকে অধিকতর অভিভূত করল। তিনি জয়রামের কাঁধে হাত রেখে বললেন- জয়রাম, তুমি যাও। তাদের সন্ধান কর। প্রতাপ রায় যেমনি অত্যাচারী তেমনি শঠ। তাকে মনের কথা বল না। নইলে তোমার বোনের খোঁজও করতে পারবে না বা এ সংবাদও রাজার কানে পৌছাতে পারবে না।

জয়রাম উঠে বন্দীশালা হতে বের হয়ে গেলেন। প্রহরীরা দরজা বন্ধ করে দিল। কিছুদূর গিয়ে ফিরে এসে লংকার নাবিকদের কুঠরী খুলবার জন্য প্রহরীদের হুকুম দিলেন।

তাদেরকে কয়েকটি প্রশ্ন করার পর তিনি বাইরে ফিরে এলেন। তখন তার মনের উপর এক ভারী বোঝা চেপে বসেছে। লংকার নাবিকগণ অক্ষরে অক্ষরে যুবায়রের কথা সমর্থন করেন। জয়রাম তাঁকে সন্দেহ করেছিলেন বলে বিশেষ গ্লানি অনুভব করেন।

মায়ার উদ্বেগ

॥ এক ॥

তিন সপ্তাহ পর। ভগ্ন কিল্লার এক ঘরে নাহীদ বিছানায় শায়িত। ব্রাহ্মণাবাদ থেকে বিশ ক্রোশ দূরে এক বনের মধ্যে এই কিল্লা অবস্থিত। এক সময় গংগু ও তার সাথীদের আড্ডা ছিল। কয়েকদিন হয় গংগু ও তার সাথীরা সে জীর্ণ কিল্লাকে আবাদ করেছিল।

নাহীদের ঘা ও জ্বর দেখে গংগু বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিল। সে এরূপ স্থানে আশ্রয় নিয়েছিল যেখানে নাহীদ আরোগ্য লাভ না করা পর্যন্ত নির্বিঘ্নে থাকা যায়। লুট-তরাজ না করার প্রতিজ্ঞা সে পূর্বেই করেছিল। বিশেষ কারণে তার নিজের ও সাথীদের জন্য ঘোড়া ও সাজসজ্জার প্রয়োজন ছিল। তার জাহাজ ডুবে যাবার পর মাত্র চারটি মূল্যবান হীরক তার কাছে ছিল। গুজরাটী ব্যবসায়ীর বেশে, সে ব্রাহ্মণাবাদে গেল। মাত্র দু'টি হীরক বিক্রয় করে সে যা টাকা পেল তার ও সাথীদের ঘোড়া, তলোয়ার ও খাদ্য সংগ্রহের জন্য তাই যথেষ্ট ছিল।

দেবলের আশে পাশে নিরাপদ আশ্রয় পেলে গংগু অবশ্য সেখানেই আশ্রয় গ্রহণ করত। কিন্তু সেরূপ আশ্রয় স্থান সে পেল না। তা ছাড়া তার বিশ্বাস ছিল যে বন্দীদেরকে ব্রাহ্মণাবাদ বা আরবারে রাজার সামনে নিশ্চয় পেশ করা হবে। গংগু ও তার সাথীরা কয়েকদিন যাবত দেবল ও ব্রাহ্মণাবাদের মধ্যস্থ সমস্ত রাস্তায় কড়া পাহারা দিচ্ছিল। গংগুর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে খালিদের সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মায়াদেবীকে সে তখনও ঘরের শত্রু মনে করছিল। মায়াদেবী দিন রাত্রি নাহীদের সেবা শুশ্রূষা করে গংগুর কাছে নিজের সাফাই কতকটা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিল। নাহীদের সন্দেহও দূর হয়েছিল। কিন্তু তার কোন কথা খালিদের কাছে গ্রাহ্য হয় না। সে যেন তার অস্তিত্বই অস্বীকার করত। নাহীদের শুশ্রূষার জন্য মায়া তার কাছে বসতো। খালিদের সামনেই নাহীদের ঘা ধুয়ে মলম লাগাতে ও পট্টি বেঁধে দিত। তাকে ঔষধ দিত। তার মাথা টিপে দিত এবং খালিদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য নিজের অজ্ঞাতসারেই বারবার বলত- আপনার বোন এখন বেশ ভাল আছেন। ঘা শিগ্‌গিরই শুকিয়ে যাবে।... বোন নাহীদ এখন সুস্থ আছেন। আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না.... আল্লাহ আপনার সাহায্য করবেন।

কিন্তু খালিদের পক্ষ থেকে কোন জবাব না পেয়ে সে মনে করত যে তার জন্য

খালিদের চোখ কান বন্ধ হয়ে গেছে।

সিন্ধু নদীর মোহনা থেকে এ স্থান পর্যন্ত নৌকায় দীর্ঘ পথ আসার সময়ও খালিদের একই অবস্থা ছিল। সমুদ্রের পানির মতই নদীর পানি ছিল। প্রতি প্রভাতে একই সূর্য উদিত হত এবং প্রতি সন্ধ্যায় একই চাঁদ ও তারার মেলা বসত আকাশে। কিন্তু খালিদের অবহেলা ও তাচ্ছিল্য প্রকৃতির সমস্ত সুষমা তার কাছে নিরর্থক করে দিয়েছিল। খালিদ যদি তার মুচকি হাসির জবাবে একটু হাসি ফিরিয়ে দিত। সে যদি একবার মাত্র জিজ্ঞেস করত- মায়া তুমি কেমন আছ? যদি মায়ার চোখের অবাধ্য অশ্রু মুছবার জন্য তার হাত একটু মাত্র প্রস্তুতির ইঙ্গিত দিত তাহলে ভাইয়ের বিচ্ছেদ ব্যথা সত্ত্বেও সে একথা ভেবে খুশী হতে পারত যে, বিধাতা দেবলের থেকে তার ও খালিদের পথ পৃথক করেনি। জাহাজে থাকবার সময় সে অনেক সময় ভাবত খালিদের সাথে তার সহযাত্রা যেন শেষ না হয়। ঝড় এসে তাদের জাহাজের যাত্রা-পথ যেন এমনি ফিরিয়ে দেয় যাতে করে সে খালিদের সাথে এমন এক দ্বীপে পৌঁছে যেতে পারে সেখানে স্বচ্ছ পরিষ্কার পানির স্রোতস্বিনী প্রবাহিত। ঝর্ণার জল প্রেমের গান গায়। কুঞ্জে কুঞ্জে চির বসন্ত বিরাজমান থাকে। ফুলের সৌরভে বাতাস মোহিত থাকে। গভীর সরোবরে সুরম্য মৃণাল প্রস্ফুটিত হয়।

দেবল বন্দরের প্রথম দৃশ্য দেখার পর তার স্বপ্নমাখা মধুর জগত বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু জাহাজের পরিবর্তে বিধাতা যখন তাকে খালিদের সাথে একই নৌকার আরোহী করে দেয় তখন আবার নতুন করে স্বপ্নের জগত গড়তে থাকে। কিন্তু দেবলের ঘটনা এক জীবন্ত নব-যুবককে প্রস্তর মূর্তিতে পরিণত করেছিল। প্রেম ও মমতাপ্রার্থী দৃষ্টির বিনিময়ে খালিদের চোখে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য ছাড়া কিছু দেখা যেত না।

এদের মধ্যে একমাত্র নাহীদই বিশ্বাস করত দেবলের ঘটনার সাথে মায়াদেবীর কোন সম্পর্ক নেই। নারীর তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম অনুভূতি ছাড়া সে মায়ার মানসিক দ্বন্দ্বের আঁচ পেয়েছিল। সুযোগ পেলেই সে খালিদের সামনে মায়ার পবিত্রতা, চরিত্র-মাধুর্য, লজ্জা, আন্তরিকতা ও অপরাধহীনতার উল্লেখ করত। খালিদ আলোচনার বিষয় পরিবর্তন করতে চেষ্টা করত। নাহীদ বলত- খালিদ তোমার হৃদয় বড় কঠোর। তুমি দেখছ না মায়ার সুন্দর লালিম চেহারা দু'প্রহরের ফুলের মত ম্লান হয়ে গেছে। তার ভাই খারাপ হতে পারে। কিন্তু আমার মন সাক্ষ্য দিচ্ছে মায়া সম্পূর্ণ নিরপরাধ। সে তোমাকেই তার শেষ আশ্রয়স্থল মনে করে। তুমি তাকে সান্ত্বনা দিতে পার। সে এ পর্যন্ত বলেছে যে তার ভাই ষড়যন্ত্রে সত্যসত্যই জড়িত থাকলে সে তার কাছে ফিরে যাবার চেয়ে মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়ঃ মনে করবে।

সে জবাব দিত- দুপুর বেলায় আমি প্রদীপের প্রয়োজন দেখছি না। আমি যা দেখেছি তারপর এ বালিকা সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করা আমার সাধ্যের অতীত।

॥ দুই ॥

উক্ত জীর্ণ কিল্লায় কিছুদিন থাকার পর নাহীদ চলতে ফিরতে সমর্থ হয়ে উঠল। কিন্তু তীরের ঘা সম্পূর্ণ তখনো সারেনি। খালিদ মাঝে মাঝে অশ্বারোহী দলের সাথে ঘুরে বেড়াত।

এক সন্ধ্যায় চারদিক থেকে প্রহরীদের সমস্ত দল ফিরে এল। কিন্তু খালিদ ও তার চারজন সাথী ফিরল না। মাগরিবের নামাযের পর নাহীদ ভাইয়ের মঙ্গলের জন্য দু'আ করছিল। গংগু কয়েকজন সাথীকে খালিদের খোঁজে পাঠিয়ে নিজে এক উঁচু গাছে আরোহণ করে পথ দেখছিল। মায়া কিল্লা থেকে বের হয়ে ঘন গাছের ভেতরে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে দূর থেকে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা গেল। তার বুক ধড়ফড় করতে লাগল। সে দ্রুতপদে অগ্রসর হতে লাগল। তার আঁচল এক কাঁটার ঝাড়ে বিঁধে গেল। সে কাঁটা ছাড়াতে চেষ্টা করছিল। পেছন থেকে খালিদ ও তার সঙ্গীরা এসে পড়ল। খালিদ ঘোড়া থামিয়ে জিজ্ঞেস করল- আমার বোন কেমন আছে?

কথাগুলো মায়ার 'কানের ভেতর দিয়ে মরমে পশিল'। সে খালিদের দিকে তাকিয়ে রইল। কাঁটার ঝোপের যে শাখাগুলো অত কষ্টে সে ছাড়িয়েছিল তার হাত থেকে খসে আবার কাপড়ে লেগে গেল।

খালিদ আবার বলল- বল, আমার বোন ঠিক আছে তো?

মায়া চমকে উঠে জবাব দিল- তিনি সম্পূর্ণ ভাল আছেন। আপনি বড় দেরী করে ফেলেছেন।

তুমি এখানে কি করছ?

আমি?- কিছু না। এ কথা বলে মায়া আবার কাপড় থেকে কাঁটা ছাড়াতে লাগল। কিন্তু তার চোখ ছিল খালিদের উপর নিবদ্ধ। খালিদ ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। তার সাথীরা বাঁকা চোখে পরস্পরের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে চলে গেল। মায়ার শ্বাস দ্রুত বইছিল। তার চোখ থেকে কৃতজ্ঞতার অশ্রু উথলে উঠল। নিজের কম্পিত হাত সে খালিদের হাতে রাখল।

তাড়াতাড়ি শাখাটি ধরতে গিয়ে একটি তীক্ষ্ণ কাঁটা তার আঙ্গুলে বিঁধে গেল। শাখাটি হাত থেকে ছুটে আবার কাপড়ে লেগে গেল। কাঁটার বেদনা সত্ত্বেও মায়া হেসে দিল। কৃতজ্ঞতার অশ্রু-ভেজা তার হাস্যময় চেহারা শিশির ভেজা গোলাপের চেয়েও মনোহর দেখাচ্ছিল। খালিদ তার দিকে চেয়ে চোখ নত করে নিল। সে বলল- দেখি, আমি কাঁটাটা বের করে দিচ্ছি।

কিছু না বলে মায়া তার হাত বাড়িয়ে দিল। কাঁটা বের করে খালিদ আবার ডাল ছাড়াতে গেলে গেল। সে জিজ্ঞেস করল- তুমি এখানে কেন এসেছিলে?

মায়া জবাব দিল- কিল্লায় গরম লাগছিল। তাই আমি একটু হাওয়া খেতে বের হয়েছিলাম।

সে মনে মনে বলল- সত্যি কি তুমি আমার আগমনের কারণ বোঝনি। আমি সারা জীবন কন্টাকাবৃত থাকি আর তুমি কাঁটা ছাড়াতে থাক- তাহলে কতই না ভাল হয়।

খালিদ জবাব দিল- কিন্তু এখন ত গাছের নিচে বেশী গুমট।

মায়া তটস্থ হয়ে খালিদের দিকে তাকাল। কিছুক্ষণ ভেবে বলল- আমি নদীর দিকে যাচ্ছিলাম।

কিন্তু নদী তো উল্টা দিকে।

আমি সে দিকেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু....

কিন্তু কি?

ঘোড়ার পদ শব্দ শুনে এদিকে ফিরে আসি। আজ আপনি অনেক দেরী করেছেন। আমি... খুব উৎকণ্ঠিত ছিলাম।

আমি তোমার ব্যস্ততার কারণ বুঝতে পারছি না। আমি যুবায়র এবং অন্যান্য সাথীদের মত বন্দী হলে তুমি নিশ্চিত হতে। কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর আমি এখনো বন্দী হয়েই আছি। তোমার ভাইয়ের মত আমি নিজের বোনকে ফেলে চলে যেতে পারি না।

মায়ার মনে দারুণ আঘাত লাগল। সে কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অপলক দৃষ্টিতে সে খালিদের দিকে চেয়ে রইল। তার চোখ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে গেল। বাষ্প অশ্রুধারায় পরিণত হল। চোখের পাতা ছাড়িয়ে উথলে উঠল। মুক্তার ন্যায় দু'ফোঁটা অশ্রু গাল বেয়ে ওষ্ঠে পতিত হল। মায়া তাড়াতাড়ি ঘোমটায় মুখ লুকাল।

চল, দেরী হয়ে যাচ্ছে। খালিদের কণ্ঠস্বর শুনে মায়া চমকে উঠল। কাঁটা থেকে তার কাপড় মুক্ত হয়েছিল। খালিদ ঘোড়ার লাগাম ধরে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিল। মায়া বলল- আপনি যান। আমি পরে আসছি। কিন্তু শেষবারের মত আমি আপনাকে শুধু বলতে চাই যে আমি নিরপরাধ। আমার ভাই যদি এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকেও থাকেন তবু পরের পাপের শাস্তি আমাকে দেওয়া অন্যায়।

খালিদ জবাব দিল- আমি তোমাকে শাস্তি দিতে চাই না। শীঘ্র তোমাকে তোমার ভাইয়ের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। সেও খুব দূরে নয়, এখান থেকে প্রায় চার ক্রোশ দূরে এক টিলার উপর তাঁবু ফেলেছে। রাজার কাছ থেকে পুরস্কার পাবার আশায় সে বন্দীদের ব্রাহ্মণাবাদ নিয়ে যাচ্ছে। তার সাথে দেবলের শাসনকর্তাও আছে। কাল তারা ব্রহ্মণাবাদে পৌঁছে যাবে। হয়ত আজ রাত্রেই তোমার ভাইয়ের কাছে আমাদের প্রস্তাব পৌঁছে যাবে। সে যদি বন্দীদের মুক্তি দিতে রাযী হয়, তবে তোমাকে তার কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। আমি প্রথম থেকেই তোমাকে এখানে রাখার বিপক্ষে ছিলাম। কোন অসহায় নারীর উপর হাত তোলা আমাদের নীতি বিরুদ্ধ। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

আমার ভাই বন্দীদের নিয়ে যাচ্ছেন, এ কথা আপনাকে কে বলেছে? প্রতাপ রায়ের সাথে তিনিও বন্দীর মত যাচ্ছেন- এটা কি সম্ভব নয়।

আমি আজ নিজ চোখে দেখে এসেছি। সে এক বাদামী রঙের ঘোড়ায় সওয়ার ছিল। অন্য বন্দীরা গরুর গাড়িতে শৃংখলাবদ্ধ ছিল।

চল, অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে। গংগু আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

আপনি এগোন। আমি এখুনি আসছি।

॥ তিন ॥

খালিদ ঘোড়ার লাগাম ধরে হেঁটে কিল্লার দরজায় পৌছল। গংগু বাইরে তার অপেক্ষায় ছিল।

মৃদু হেসে গংগু জিজ্ঞেস করল- খালিদ, মায়াকে কোথায় রেখে এলে? খালিদ অবহেলা ভরে উত্তর দিল- সে আসছে।

রাত হয়ে গেছে। তুমি তাকে সঙ্গে কেন নিয়ে এলে না?

আপনি নিয়ে আসুন। সে বলছিল আপনি যান, আমি এখুনি আসছি।

গংগু মৃদু হেসে বলল- নারী প্রকৃতি অতি অদ্ভুত। সে লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার পথ দেখবে। তোমার জন্য কাঁটার বনে ঢুকবে। কিন্তু তুমি তার দিকে ঝোঁক অমনি বন্য হরিণীর ন্যায় দৌড়ে পালাবে।

খালিদ জবাব দিল- আমার হৃদয়ে কাব্যের স্থান নেই। এখন আপনি বলুন আমাকে কি করতে হবে। দেবলের কাফিলার খবর আপনি নিশ্চয় শুনেছেন।

হাঁ, শুনেছি। তাদের সাথে দু'শ' সশস্ত্র সৈন্য রয়েছে। মুষ্টিমেয় লোক নিয়ে আমরা তাদের আক্রমণ করতে পারি না। আমি জয়রামকে এখনে আনবার ব্যবস্থা ভেবে রেখেছি।

দেখছি সে মেয়েটির কথায় ভুলে নাহীদ জয়রাম সম্বন্ধে তার ধারণা বদলে ফেলেছে। আপনিও অভিভূত হচ্ছেন।

মৃদু হেসে গংগু বলল- বৎস, তুমি আমার চেয়ে বেশী প্রভাবান্বিত হয়েছ। যা হোক, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে মায়া সম্পূর্ণ নির্দোষ।

তা সত্ত্বেও আপনি জয়রাম ও মায়াকে হত্যা করার ভয় দেখাতে চান।

তোমার সঙ্গীদের মুক্ত করবার আর কোন উপায় নেই।

কিন্তু জয়রাম যদি রাজাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বোনকে বলি দেয় তবে?

আমার সে আশংকা নেই। কিন্তু জয়রাম যদি এতই নীচ প্রমাণিত হয়, তবে মায়ার মত মেয়েকে এরূপ যালিম ভাইয়ের হাত থেকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। সে নিজেও জয়রামের চেয়ে তোমার আশ্রয় বেশী পছন্দ করবে। কয়েকদিনের মধ্যেই তোমার বোন ভ্রমণ করতে সমর্থ হবে। তখন তোমাদের মকরাণের সীমায় পৌছিয়ে দেব।

কিন্তু আমাদের সঙ্গীদের বিপদে ফেলে রেখে আমরা কি করে চলে যাব? তা হতে পারে না।

তোমরা ফিরে গিয়েই আরবদের বেশী সাহায্য করতে পারবে। আরবদের সাথে সাথে লংকার নাবিকদের বন্দী রাখার কারণ বোধ হয় এই যে জাহাজ লুণ্ঠিত হবার খবর সিন্ধুর বাইরে না যায়। এ খবর পেলে তোমাদের জাতভাইরা চুপ করে সহ্য করবেন না। কিন্তু নাহীদ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা যেতে পার না। জয়রাম আমাদের কবলে পড়লে সম্ভবতঃ আমরা যুবায়রকে মুক্ত করতে সক্ষম হব।

তা সম্ভব হলে খুবই ভাল হয়। আমি আরবে কাউকে চিনি না। বসরা দামেশ্‌কে হয়ত লোকেরা আমার কথায় কান দেবে, কি দেবে না। কিন্তু যুবায়র সেখানের বহু লোককে চেনেন। সে কথা যাক, আজ রাতে আমার জিম্মায় কি কাজ তাতো বলেন নি।

গংগু জবাব দিলো- তুমি বিশ্রাম কর। কিন্তু মায়াদেবী এখনো ফিরল না ত। হয়ত অন্য পথে সে কিল্লায় পৌছে গেছে।

আমি এখনি খবর নিচ্ছি- বলে খালিদ দৌড়ে কিল্লায় প্রবেশ করল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে সে গংগুকে খবর দিল- মায়া ভেতরে পৌছেনি।

গংগু জিজ্ঞেস করল- তুমি তাকে কত দূরে ছেড়ে এসেছিলে?

ঐ ঝোপগুলোর পেছনে প্রায় একশ' কদম দূরে।

তুমি তাকে কোন কঠিন কথা বলোনি তো?

কিন্তু আমার প্রত্যেক কথায় অশ্রু ফেলা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তবে হ্যাঁ, আমার একটা ভুল হয়ে গিয়েছে।

সেটা কি?

আমি তাকে বলে ফেলেছি তার ভাই এখান থেকে চার ক্রোশ দূরে আছে।

রাত্রে এই বন অতিক্রম করা স্ত্রীলোকের কাজ নয়। একথা বলে গংগু নিজের সঙ্গীদের ডাক দিল। তাদের মায়াকে খোঁজার আদেশ দিয়ে খালিদকে বলল- আমার মনে হয় সে এখনো সে কাঁটা ঝোপের সাথে কথা বলছে। তুমি সে দিকে যাও। আমি নদীর দিকে যাচ্ছি। তার উপর আমার কোন সন্দেহ নেই। তবে নৈরাশ্যে মেয়েরা অনেক বিপরীত কাজ করে বসে। আমি যাই। নদীর পারে আমাদের নৌকা যাতে তার ধ্বংসের কারণ না হয়ে উঠে।

॥ চার ॥

খালিদ চলে যাবার পর মায়া কিছুক্ষণ সেই কাঁটা ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। যে কাঁটা তাকে টেনে খালিদের হাত পর্যন্ত পৌছিয়েছিল। সে তার কাছে সৌরভময় ফুলের মত মধুর ছিল। সে কয় মুহূর্ত খালিদ তার নিকটে ছিল সে কল্পনায় সে মধুর মুহূর্তগুলো উপভোগ করছিল। খালিদের কণ্ঠস্বর তখনো তার কানে গুঞ্জরণ করছিল। পর পর সে

যেন চুমুক দিয়ে বিষ ও মধুপান করছিল। তার হৃদয়ে খালিদ সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী ধারণার সংঘর্ষ বেঁধেছিল। সে কখনো তাকে ঘৃণা ও ক্রোধের মূর্তি, কখনো বা দয়া ও প্রেমের দেবতা রূপে কল্পনা করছিল। কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর তার মনে এক অহ্য বেদনা অনুভব করল। ঝোপ থেকে একটা শাখা ভেঙ্গে চাঁদের আলোয় সে বৃক্ষ ও ঝোপ এড়িয়ে নদীর দিকে অগ্রসর হল।

নদীর তীরে একটি নৌকা বাঁধা ছিল। যে নৌকায় তারা সমুদ্র থেকে এখানে পৌঁছেছিল। যাতে ভ্রমণ করার সময় সে প্রহরের পর প্রহর আসমানের তারার সাথে নীরব বাক্য বিনিময় করেছে। নৌকার উপর এক ধারে বসে সে নিচে পা ঝুলিয়ে দিল। পানির স্রোত তার পায়ে লাগছিল। আশ-পাশের বন থেকে শৃগাল ও বাঘের শব্দ আসছিল। মায়া নিজের মনেই প্রশ্ন করে- যদি এখন একটা বাঘ এদিক এসে পড়ে তবে? সে নিজেই জবাব দেয়- বাঘ এসে পড়লে আমি পালাবার চেষ্টা করবো না। আমি নৌকা থেকে নেমে তার সামনে দাঁড়াব। ভোরে যখন তিনি আমার লাশ দেখবেন, তখন তাঁর কি অবস্থা হবে? তিনি বলবেন- মায়া, তুমি কেন এদিকে এসেছিলে? আমি তোমার সাথে রহস্য করেছিলাম। আমি জানতাম তুমি নিরপরাধ। মায়া তুমি আমাকে মাফ কর। আমি তোমাকে চিনতে ভুল করেছি। না, না, তিনি হয়তো তা বলবেন না। তিনি বলবেন সে পাগলী ছিল, উন্মাদ ছিল। হাঁ, সত্যি তো আমি পাগলী। তাঁর হৃদয়ে আমার জন্য এতটুকু স্থান নেই। তিনি কাঁটা থেকে আমার কাপড় ছাড়াচ্ছিলেন, আর আমি ভাবছিলাম দুনিয়ার রাজত্ব পেয়ে গেছি। কিন্তু আমি নদীর তীরে বালির সৌধ বানাচ্ছিলাম। তাঁর হৃদয় পাথরের। তিনি যালিম। কারো উপর তাঁর বিশ্বাস নেই। আর থাকবেই বা কি করে? আমার ভাই এঁদের সাথে খুব দুর্ব্যবহার করেছেন। হায়, তিনি যদি আমার ভাই না হতেন! হায়, জাহাজেই যদি তিনি আমাকে বলে দিতেন তিনি এঁদেরকে প্রতারণা করবেন, তাহলে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে খালিদের দিতে তাকাতাম না। এখন তিনি আমাকে ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। এই যদি পরিনাম হবে তবে বিধাতা কেন আমাকে তাঁর জাহাজে পৌঁছিয়েছিলেন? আবার যখন দেবলে তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে যাচ্ছিলাম, বিধাতা কেন আবার এখানে নিয়ে এলেন? তাঁর ঘৃণা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত আমি তাঁকে কেন প্রেমপূর্ণ চোখে দেখছি? নৈরাশ্যের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কেন আমি আশার প্রদীপ জ্বালাচ্ছি? হাঁ, আমি বাধ্য ছিলাম- আমার স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্ব ছিল না। আমি এখনো অসহায়। আমার কেউ নেই। আমার কেউ নেই। আমি ভগবানকে ডেকেছি। তিনি রোজ পাঁচবার যে আল্লাহর ইবাদত করেন তাকেও ডেকেছি। কিন্তু অশ্রু ও দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আমার ভাগ্যে কিছুই নেই। অশ্রু আর দীর্ঘশ্বাস। হায়, আমার যদি জন্মই না হত। হায়, সমুদ্রের ঢেউ যদি আমাকে দয়া না করত!

দু'হাতে মাথা লুকিয়ে মায়া বহুক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। কে তার কাঁধে সস্নেহে হাত রেখে ডাকল- মায়া। সে চমকে ঈষৎ চিৎকার দিয়ে উঠল। পেছনে তাকিয়ে দেখল- গংগু তার কাছে দন্ডায়মান! সে বলল- মা, তুমি ভয় পেয়েছ? এখন এখানে কি করছ।

চোখ মুছতে মুছতে সে জবাব দিল- কিছু না।

তুমি কাঁদছ? কী হয়েছে?

মায়া নীরব রইল। গংগু আবার জিজ্ঞেস করল- এমন সময় এরূপ নিঝুম নির্জন স্থানে তোমার ভয় করে না? চারদিক থেকে বাঘের ডাক শোনা যাচ্ছে। চল, আমার সাথে।

মায়া বলল- আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

কি কথা?

আপনি সত্যি কি আমাকে আমার ভাইয়ের কাছে পাঠাবার সিদ্ধান্ত করেছেন?

গংগু জবাব দেয়- আমি নিজের সিদ্ধান্ত করার আগে তোমার সিদ্ধান্ত শুনতে চাই।

ভগবানের দোহাই, আমাকে তার কাছে পাঠাবেন না।

কিন্তু কেন?

আমি এমন ভাইয়ের কাছে যেতে চাই না, যে আমার মাতৃদুগ্ধের সম্মান রাখেনি।

তুমি একথা মনে থেকে বলছ, না শুধু আমাকে বোকা বানাবার জন্য?

হায়, আপনাকে যদি আমার হৃদয় দেখাতে পারতাম!

কিন্তু জয়রামকে ঘৃণা করার কারণ কি?

আমি খালিদের কাছে তার সম্বন্ধে শুনেছি। তার শঠতা সম্বন্ধে এখন আর আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা কি সম্ভব নয় যে, আমরা তোমাকে তোমার ভাইয়ের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে যুবায়র ও তাঁর সঙ্গীদের মুক্ত করতে পারব?

জয়রাম যদি একবার প্রতারণা করে থাকে তবে সুযোগ পেলে সে আবার প্রতারণা করবে। সে যেন কোন রকমে জানতে না পারে যে আমি আপনাদের সাথে আছি। নইলে রাজার সৈন্যদের সাহায্যে সে জঙ্গলের প্রতি কোণ চষে বেড়াবে। নাহীদ এখনো ভাল করে চলতে ফিরতে পারে না। তাকে রক্ষা করা আপনাদের পক্ষে দুষ্কর হবে।

মা, তুমি নিশ্চিন্ত হও। তোমাকে আমাদের হাতে দেখে জয়রাম সব শঠতা ভুলে যাবে। এর পরেও যদি তার পক্ষ থেকে কোন ভয়ের কারণ দেখা যায়, তা হলে নাহীদের জন্য আমি আর একটি নিরাপদ স্থান ঠিক করে রেখেছি।

তা হলে এর অর্থ এই যে, সে যদি বন্দীদের আপনাদের হাতে সমর্পণ করে তাহলে আপনি আমাকে তার হাতে সোপর্দ করবেন।

মা, সে তোমার ভাই। তার কাছে যেতে ভয় পাচ্ছ কেন?

দুনিয়ায় আমার কেউ নেই। স্বার্থের জন্য ভাই আমাকে বলি দিতে চেয়েছেন- তাই আমি আপনার হাতে এসে পড়েছি। এখন আপনি আমাকে কন্যা বলেও স্বার্থের জন্য তার কাছে ফিরে পাঠাতে চাচ্ছেন। আমার ভাইয়ের সিদ্ধান্তের ন্যায় আপনার সিদ্ধান্তও আমাকে ভাগ্যলিপি বলে মেনে নিতে হবে। হায়, আমার ভাগ্য যদি আমার হাতে

থাকত! হায়, পৃথিবীতে আমার নিজের পথ নিজেই খুঁজে নেবার অধিকার যদি থাকত! কিন্তু আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন অর্থ নেই। আমি ঝড়ের মুখে তৃণের মত। বায়ুর গতি যেদিকে ইচ্ছা নিয়ে যায়। আমার থাকা না থাকা সমান।

কিছুক্ষণ ভেবে গংগু বলল- সিদ্ধান্তের ভার তোমার উপর ছেড়ে দিলে তুমি কি করবে?

কিছু আশান্বিত হয়ে মায়া উত্তর দিলো- আমি মুক্তির চেয়ে আপনার কাছে বন্দী থাকা শ্রেয়ঃ মনে করব।

তা কেন?

আমি নাহীদকে অসুস্থ অবস্থায় ছেড়ে যেতে চাই না।

মায়া, আমি একটি প্রশ্ন করছি। সত্য বল, খালিদকে তুমি ভালবাস?

মায়া দৃষ্টি নত করে নিল।

সে আবার বলল- মায়া, আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

মায়া বলল- কিন্তু একথা আপনি কেন জিজ্ঞাসা করছেন?

এই জন্য যে হয়তো এ প্রশ্নের উত্তর শোনার পর আমি তোমার জন্য অপেক্ষাকৃত ভাল সিদ্ধান্ত করতে পারবো।

আমি জানি না। শুধু এটুকু জানি যে, আমি তাঁকে ছাড়া বেঁচে থাকতে পারব না।

তুমি এটাও জান যে তোমার উপর তার সন্দেহ এখনো দূর হয়নি। সমুদ্রের উপলখন্ডের চেয়েও তার হৃদয়ে কঠিনতর। তোমাকে আমি কন্যা ডেকেছি। আজ থেকে তোমার সুখই আমার সুখ, আর তোমার দুঃখ আমার দুঃখ। আমি চাই না কোনদিন তাকে আপন করার আশার উপর তুমি সবকিছু উৎসর্গ কর। এটাও সম্ভব যে সারা জীবন তোমার সদিচ্ছা সম্বন্ধে তার মনে বিশ্বাস জাগবে না। তোমার সম্বন্ধে তার ধারণা দূর করতে তোমাকে মহৎ আত্মোৎসর্গ করতে হবে।

আমি যে কোন বলিদানের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু সারা জীবন তাঁর বিচ্ছেদ আমার সহ্য হবে না।

ভাইয়ের চিন্তা তো তোমাকে কষ্ট দেবে না?

রাজার উচ্ছিষ্ট খাবার পর সে আর আমার ভাই রয়নি, তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

গংগু বলল- আমি তাকে কোন উপায়ে এখানে আনতে চাই। তার মুখ দেখে তোমার হৃদয় গলে যাবে নাতো? স্বীয় উপকারকদের সাথে সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তার বিচারের ভার তোমার উপর দিলে তুমি তার সাথে কিরূপ ব্যবহার করবে?

শঠ, প্রতারক ও কাপুরুষের যোগ্য শাস্তিই দেব।

গংগু বলল- মায়া, তুমি চিন্তা করে উত্তর দাও। এ এক কঠোর পরীক্ষা। হয়তো তোমার ভাইকে তোমার সামনে এনে আমি তোমারই হাতে বিচারের তরবারী দেব।

আমি ভেবেছি। আমি তাকে দয়ার অযোগ্য মনে করি।

গংগু কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঝোঁপের পেছন থেকে খালিদের স্বর শোনা গেল- মায়া, মায়া, তুমি কোথায়?

গংগু মায়াকে বলল- তুমি নৌকায় লুকিয়ে থাক। যতক্ষণ আমি না ডাকি ততক্ষণ বাইরে আসবে না।

কিচু না ভেবেই মায়া তার আদেশ পালন করল।

গংগু নৌকা থেকে নেমে তীরে দাঁড়াল। খালিদ আবার ডাক দিলো।

গংগু বলল- খালিদ, আমি এদিকে আছি।

॥ পাঁচ ॥

খালিদ ঝোঁপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বলল- মায়াকে পাওয়া যায় নি? আপনি এখানে কি করছেন?

গংগু কণ্ঠস্বর বিষণ্ন করার চেষ্টা করে বলল- মায়া চলে গেছে। আহা বেচারী।

খালিদ হতভম্ব হয়ে বলল- কোথায় গেছে? কী হয়েছে?

খালিদ, তুমি বড় অন্যায় করেছ। হায়, তুমি যদি তার মন ভেঙ্গে না দিতে!

হয়েছে কি? আল্লাহর দোহাই, আমাকে বলুন।

এখন আর পস্তালে কি ফল? যা হবার তা হয়ে গেছে। হায়, সে যদি তোমার মত পাষাণ- হৃদয় লোককে ভাল না বাসত।

খালিদ অস্থির হয়ে গংগুর কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল- আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে হয়রান করবেন না। কি হয়েছে পরিষ্কার করে বলুন।

মায়া চলে গেছে। আমি যখন এখানে পৌছি তখন সে নদীর তীরে দন্ডায়মান ছিল। আমি তাকে ডাক দেই। আমাকে জবাব না দিয়ে সে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। আমি তাড়াতাড়ি কাপড় খুলি, কিন্তু ইতিমধ্যে ঢেউ এসে তাকে তীর থেকে অনেক দূরে নিয়ে যায়। যখন আমি পানিতে লাফ দিচ্ছিলাম ততক্ষণে সে ঢেউয়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

খালিদ চিৎকার দিয়ে উঠল- মায়া ডুবে যাচ্ছিল আর তুমি নিশ্চিন্তে তীরে দাঁড়িয়ে কাপড় খুলছিলে? নির্দয়! যালিম!! দস্যু!! আমি ভেবেছিলাম তুমি মানুষ হয়েছ।

গংগু বললো- আমি কাপড় শুদ্ধ লাফ দিলে নিজেই ডুবে মরতাম।

তাহলে তুমি ভাবছ যে তুমি মরলে পৃথিবীর অনেক ক্ষতি হত?

তবে তার মৃত্যুতেই বা পৃথিবীর কি ক্ষতি হয়েছে? ভাই থেকে তার মন ভেঙ্গে গিয়েছিল। তোমার ব্যবহার দেখে সে নিরাশ হয়ে পড়েছিল। তিলে তিলে মরার চেয়ে নদীতে ডুবে মরা তার পক্ষে ভালই হয়েছে। হাঁ, আমি যখন কাপড় ছাড়ছিলাম এবং ঢেউ যখন তাকে স্রোতের মধ্যে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল, সে চিৎকার দিতে দিতে বলছিল- গংগু, আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা বৃথা। খালিদকে আমার সালাম বল। তার প্রেম থেকে বঞ্চিত হয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না।

খালিদ অনেকক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। গংগু তার কাঁধে হাত রেখে বললো- চল খালিদ, এখন দুঃখ করে কি হবে? যা হবার তা হয়ে গেছে।

খালিদ ঝট করে তার হাত সরিয়ে দিয়ে বলল- তুমি যাও।

গংগু বলল- আজ রাত্রে আমাদের অনেক কাজ আছে। চল।

খালিদ কর্কশ স্বরে বলে উঠল- গংগু আল্লাহর দোহাই, তুমি যাও। আমাকে কিছুক্ষণ একা থাকতে দাও।

সে বললো- খালিদ, আমার জানা ছিল না মায়ার মৃত্যু তোমাকে এতটা কষ্ট দেবে। নতুবা আমি প্রাণপণ করে তাকে বাঁচার চেষ্টা করতাম।

খালিদ ভারি গলায় বলে- তার মৃত্যুর শোক? গংগু আমার বুকে মানুষের হৃদয় নাই। এ ঘটনা আমার জীবনের বৃহত্তম দুর্ঘটনা। তার মৃত্যুর কারণ আমি। আমি সারা জীবন নিজকে ক্ষমা করতে পারব না।

কিন্তু তুমিতো আমাকে অনেকবার বলেছ মায়াকে তার ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দাও। যদি তার বিচ্ছেদে তোমার কষ্ট না হত তবে তার মৃত্যুতে এত শোক কেন?

গংগু, আমাকে কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিও না। আমি তাকে ভুল বুঝেছিলাম। এ শাস্তি আমার অসহ্য।

খালিদ, এসব কথা ছেড়ে দাও। আমার বিশ্বাস সে যদি আবার, জীবন ফিরে পায় তবুও তোমার আত্মাভিমান তোমাকে তার প্রেমের প্রতিদান দিতে অনুমতি দেবে না। তুমি তার সাথে আগের মতই ব্যবহার করবে। চল, দু'একদিনেই তুমি তাকে ভুলে যাবে।

উত্তর না দিয়ে খালিদ একটি গাছের গুঁড়ির উপর বসে পড়ল এবং নদীর ঢেউয়ের দিকে চেয়ে রইল। বিষণ্ন স্বরে সে বলতে লাগল- মায়া, মায়া তুমি এ কী করলে?

গংগু আবার বলে- খালিদ, তোমাকে এখন পুরুষের ধৈর্য ও সাহসের পরিচয় দিতে হবে।

গংগু, তুমি যাও। আমি আসছি।

আচ্ছা, তোমার খুশী। একথা বলে গংগু চলতে লাগল। কিন্তু কিল্লার পথ না ধরে ঝোপে লুকিয়ে নৌকার কাছে এক গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। সে আস্তে ডাক দিল-

মায়া, এখন বের হয়ে এস।

মায়ার বুক কাঁপছিল। খালিদ ও গংগুর কথা সে শুনেছিল। যে মৃত্যু তাকে খালিদের হৃদয়ের এত কাছে টেনে এনেছে তা মায়ার কাছে হাজার জীবনের চেয়ে শ্রেয়ঃ মনে হচ্ছিল। সে খালিদের আক্ষেপ শুনছিল। তার ভয় হচ্ছিল এ রহস্যের পর খালিদ চিরকালের জন্য বিরূপ হয়ে যাবে। সে মনে মনে ভাবছিল- হায়, যদি সত্যি সত্যি আমি নদীতে ঝাঁপ দিতাম! আচমকা এ চিন্তা তার মনে এক ভয়ংকর ইচ্ছায় পরিণত হল।

গংগু আবার আস্তে ডাক দিল। চিন্তা করে সিদ্ধান্ত করার সুযোগ মায়া পেল না। সে হঠাৎ উঠে জলে ঝাঁপ দিল।

গংগু 'মায়া, মায়া' বলে চিৎকার দিয়ে দৌড় দিল। খালিদ হতভম্ব হয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠল এবং উভয়ে এক সঙ্গে নদীতে ঝাঁপ দিল। গংগু বলছিল- 'খালিদ, ধর। এই মায়া, মায়া, থাম। সামনে পানি ভয়ংকর। কিন্তু সে সাঁতরিয়ে তীব্র স্রোতের দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা করতে লাগল।

খালিদ তীব্রগতিতে পানি কেটে মায়ার কাছে পৌছে গেল। মায়া ডুব দিল। কিন্তু ভাল সাঁতারুর পক্ষে পানির দয়ার উপর আত্মসমর্পণ করা অসম্ভব। শীঘ্রই তার মস্তক পানির উপর উঠে এল। আবার সে মাঝ দরিয়ার খর স্রোতের দিকে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু খালিদ তার বাহু ধরে ফেলে। ততক্ষণে গংগুও সেখানে পৌছে যায়। উভয়ে মায়াকে ভাসিয়ে রেখে তীরের দিকে সাঁতার দিতে থাকে।

তীরে পৌছে গংগু বলে- খালিদ, এখন আর এ বালিকার উপর আমার মোটেই বিশ্বাস নেই। তোমার অবহেলায় এর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। পরে মায়াকে জিজ্ঞেস করল- মায়া, তুমি নদীতে ঝাঁপ দিলে কেন?

সে শান্তভাবে জবাব দিল- আপনি ওঁর সাথে এরূপ রহস্য করলেন কেন? গংগু খালিদকে বলে- ভাই, আমাকে মাফ কর। আমি তোমাকে বোকা বানাবার জন্য একে নৌকায় লুকিয়ে রেখেছিলাম। আমার জানা ছিল না সে সত্যি সত্যি এরূপ করে দেখাবে। তোমরা পরস্পরকে ভালবাস। আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি।

খালিদ নীরব থাকে। তার চোখে অশ্রু দেখা দেয়- প্রেম, আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার অশ্রু।

গংগু জিজ্ঞেস করে- এখন মায়া সম্বন্ধে তোমার সিদ্ধান্ত কি?

সে জবাব দেয়- মায়া সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করার অধিকার কারো নেই। নিজের সম্বন্ধে সে নিজেই সিদ্ধান্ত করবে।

ভাই বোন

॥ এক ॥

প্রাতঃকালে উক্ত কিল্লা হতে চার ক্রোশ দূরে নদীর তীরে প্রতাপ রায়ের সৈন্যদল যাত্রার জন্য তৈয়ার হচ্ছিল। জয়রাম স্নান করে কাপড় বদলাচ্ছেন। হঠাৎ নিকটস্থ ঝোঁপের পেছন থেকে শাঁ করে একটি তীর এসে জয়রামের পায়ের কাছে মাটিতে বিদ্ধ হল। তীরের সাথে একখানা শ্বেত রুমাল বাঁধা ছিল। জয়রাম এদিকে ওদিকে তাকিয়ে মাটি থেকে শরটি তুলে এবং রুমাল খুলে দেখলেন যে তাতে কয়লা দ্বারা নিম্নের কথাগুলো লেখা আছে-

'জয়রাম, তোমাকে আমি কি নামে ডাকবো? তোমাকে ভাই ডাকতে আমার লজ্জা হয়। যদি আমার প্রাণ বাঁচাতে চাও তবে গংগুর সাথে চলে এসো। নচেৎ আমার মঙ্গল নেই।

তোমার দুর্ভাগা বোন, মায়া।

জয়রাম দৌড়ে ঝোঁপের কাছে গিয়ে ডাক দিলেন গংগু, গংগু তুমি কোথায়? গংগু আস্তে উত্তর দিল- আমি এখানে, এদিকে।

জয়রাম ঝোঁপ অতিক্রম করে তার কাছে গেলেন।

গংগু ঘোড়ার উপর সোয়ার ছিল। জয়রাম ঘোড়ার লাগাম ধরে অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন- গংগু মায়া কোথায়? সে কেমন আছে? সে তোমার কাছে কি করে পৌছল?

গংগু জবাব দিল- মায়া জীবিত আছে। আমি তোমাকে তার কাছে নিয়ে যেতে পারি। বলো, তুমি যেতে রাজি?

আমি? আমি মায়ার জন্য সাত সমুদ্দুর পার হতে প্রস্তুত। ভগবানের দোহাই, বল সে কোথায়?

এখান থেকে বেশী দূরে নয়। আমার পেছনে ঘোড়ায় উঠে বস।

বেশী দূর হলে আমার ঘোড়া নিয়ে আসি?

তুমি নিজের ঘোড়া নিয়ে আসতে পার। কিন্তু তুমি যদি কোন চাতুরী খেল, তাহলে মনে রেখো মায়াকে আর কখনো দেখতে পাবে না। আমি এখানে তোমার অপেক্ষা করব।

আমি এখনি আসছি বলে জয়রাম টিলার দিকে দৌড়ে গেলেন। সতর্কতার খাতিরে

গংগু সেখান থেকে সরে ঘন গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। অল্পক্ষণ পরেই জয়রাম ঝোঁপের কাছে পৌঁছে ঘোড়া থামালেন। গংগুকে সেখানে না দেখে ডাক দিলেন। গংগু নিশ্চিন্ত হয়ে তাকে কাছে ডেকে নিল।

গংগুর সাথে চলার আগে জয়রাম তাকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। কিন্তু গংগু জবাব দিল, মায়ার কাছে পৌঁছে সব খবর জানা যাবে। বনে কিছুক্ষণ চলার পর গংগুর দশজন সশস্ত্র সংগী ঝোঁপের পেছন থেকে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। গংগুর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জয়রামের সন্দেহ হল এবং তিনি ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে জিজ্ঞেস করলেন- গংগু এ কি? কিন্তু কোন জবাব দেয়ার পূর্বেই গংগুর সাথীরা তাকে ঘিরে ফেলল। একজন অগ্রসর হয়ে তার হাত থেকে লাগাম ছিনিয়ে নিল। গংগু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করল জয়রাম কোনরূপ বাঁধা দিলেন না। যখন তার সাথীরা জয়রামের অস্ত্র ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করল তখন তিনি নিজেই তরবারী, ধনুক, তূণ খুলে তাদের হাতে দিলেন।

কোমরবন্দে একটি ছোট ছোরা ঝুলছিল। গংগুর এক সাথী সেটাও খুলতে চাইল।

গংগু ইঙ্গিতে তাকে নিষেধ করল।

জয়রাম বললেন- তুমি জান যে মায়ার খবর পেলে আমি পালাতে পারি না।

গংগু জবাব দিল তুমি পালাতে চেষ্টা করলেও সফল হবে না। এ বনের স্থানে স্থানে, তীরন্দাজ লুকিয়ে আছে।

কিন্তু গংগু তোমার সাথে আমি কোন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিনি তুমি যেখানে বলবে আমি যেতে প্রস্তুত।

যুবায়রের মত উপকারককে যে ব্যক্তি প্রতারণা করতে পারে তার কোন কথাই বিশ্বাসযোগ্য নয়। চোখ বন্ধ করে আমার সাথে চলাতেই তোমার মঙ্গল।

কিল্লার দূরত্ব ছ'ক্রোশের বেশী ছিল না। কিন্তু সতর্কতার খাতিরে গংগু দুর্গম ও দীর্ঘ পথ অবলম্বন করে কিল্লার সামনে পৌঁছে ঘোড়া থেকে অবতরণ করল। জয়রাম দেখলেন যে খালিদ কিল্লা থেকে বাইরে আসছে। তিনি হাত বাড়িয়ে অগ্রসর হয়ে বললেন- খালিদ, খালিদ, তুমিও এখানে? তোমার বোন কোথায়?

খালিদ ঘৃণাভরে তার দিকে তাকাল এবং জবাব দেয়ার পরিবর্তে তাকে এড়িয়ে গংগুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। জয়রাম মনে আঘাত পেলেন। তার পা মাটিতে পড়ে গেল। যে হাত খালিদকে অভ্যর্থনা করতে তুলেছিলেন, তা পাশে ফিলে এল। বিব্রত ও অসহায়ভাবে তিনি চারদিকে তাকাতে লাগলেন। তার দৃষ্টি আবার খালিদের মুখে নিবদ্ধ হলো। খালিদ মুখ ফিরিয়ে নিল।

জয়রাম আবার বিষণ্ণ স্বরে বললেন- খালিদ, আমি জানি না, তোমাদের সকলের চোখে আমি এরূপ ঘৃণ্য কি করে হয়ে গেলাম। আমি নিরপরাধ। আমার সাথে এরূপ ব্যবহার কর না। মায়া কোথায়?

॥ দুই ॥

পেছন থেকে জবাব এল- আমি এখানে। জয়রাম চমকে উঠে ফিরে তাকালেন। কয়েক পা দূরে মায়া দাঁড়িয়েছিল। 'মায়া, মায়া, আমার বোন, আমার প্রিয় বোন'। বলতে বলতে তিনি মায়ার দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু সে পেছনে সরে চিৎকার দিয়ে উঠল- জালিম, নীচ, প্রতারক! আমাকে ছুঁয়ো না। তুমি রাজপুত রক্ত ও রাজপুত মাতৃদুগ্ধের অপমান করেছ। তুমি আমার কেউ নও। তোমার হাত তোমার উপকারকদের রক্তে রঞ্জিত।

জয়রামের বুকে কেউ ছোরা বিদ্ধ করলেও বোধ হয় তার এত কষ্ট হত না। তার মনে ক্রোধের অগ্নি জ্বলে উঠে বেদনার অশ্রুতে নিভে গেল। তিনি আর একবার চারদিকে তাকালেন। গংগুর মুখে ঘৃণাভরে হাসির আভাস দেখে তার শীতল রক্ত গরম হয়ে উঠল। ঠোঁট কামড়ে মুষ্টিবদ্ধ হাতে তিনি তার দিকে ধাবিত হলেন। ইতর দস্যু, এসবের জন্য তুমিই দায়ী। তুমিই এদের সবাইকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়েছ।

গংগু আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হবার আগেই জয়রাম তার মুখে ঘুষি বসিয়ে দিলেন।

গংগু গাল ঘষতে ঘষতে পেছনে সরে গেল। খালিদ অগ্রসর হয়ে জয়রামের মুখে এক ঘুষি মেরে দিল। খালিদের আঘাত জয়রামের মুখের চেয়ে মনে লাগল বেশী। তিনি বিস্মিত ও বিষণ্ণ কন্ঠে বলে উঠলেন- খালিদ, তুমি ....?

গংগুর সাথীদের তরবারী কোষমুক্ত হয়েছিল। সে ইঙ্গিতে তাদের নিরস্ত করল। জয়রামের দিকে চেয়ে সে বলল- এখন বল, বোনের জীবন রক্ষার জন্য যুবায়র ও তাঁর সাথীদের বন্ধন মোচন করতে প্রস্তুত আছ?

জয়রাম আহত স্বরে বললেন- তুমিও কি যুবায়রের মত বিশ্বাস কর প্রতাপের ষড়যন্ত্রের সাথে আমি জড়িত?

গংগু জবাব দেয়- না, বরং প্রতাপ রায় তোমার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। লংকার মণি-মাণিক্য ও হস্তীর লোভ দেখিয়ে তুমিই তাকে জাহাজ লুট করতে প্ররোচনা দিয়েছ।

ভগবান জানেন আমি নিরপরাধ।

গংগু বলে- ভগবান আরো বেশী জানেন। কিন্তু তোমার অপরাধহীনতার আলোচনায় আমাদের কাজ নেই। আমি শুধু জানতে চাই তোমার বোনের বিনিময়ে ঐ নিরপরাধ বন্দীদের মুক্তি দিতে তুমি প্রস্তুত কিনা?

জয়রাম জবাব দেন- হায়, তাদের ছেড়ে দেয়ার শক্তি যদি আমার থাকত। তারা দু'শ সৈন্যের প্রহরায় ব্রাহ্মণাবাদ যাচ্ছে। আমি একা তাদের জন্য কিছুই করতে পারি না।

তা'হলে তুমি বলতে চাও তোমার নিজের সৈন্য তোমার কথা মানে না?

হায়, তারা যদি আমার সৈন্য হত! বন্দীদের দিকে প্রতাপ রায়ের প্রহরা এত কঠোর

যে আমি তাদের সাথে কথাও বলতে পারি না। তার বিশ্বাস আমি তাদের পক্ষপাতি।

গংগুর মুখে বিদ্রুপ ও অবজ্ঞার হাসি দেখা দিল। সে বলল- তোমার পক্ষ সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ। এখন আমার প্রশ্নের জবাব দাও। তুমি তাদের মুক্তি করাতে প্রস্তুত কি না?

ভগবানের দোহাই, আমাকে বিশ্বাস কর। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ব্যাপারে রাজার সামনে পেশ করা না হয়, আমি অক্ষম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রাজা এদেরকে বন্দী রেখে আরবদের সাথে যুদ্ধ বাঁধাতে সাহস করবে না।

গংগু বলে- প্রতাপ রায় তোমার বন্ধু। যদি সে জানতে পারে তুমি আমাদের হাতে বন্দী, তবুও কি সে তোমার মুক্তির বিনিময়ে তাদেরকে মুক্ত করবে না? তুমি চিঠি লিখে দাও। সে ব্রাহ্মণাবাদ পৌঁছবার আগে তোমার চিঠি তাকে পৌঁছিয়ে দেব।

জয়রাম জবাব দেন- সে শৃগালের চেয়েও বেশী শঠ এবং বাঘের চেয়েও অধিক হিংস্র। আমার বিবরণ যদি শোন তবেই বুঝতে পারবে সে কি প্রকৃতির লোক।

ভগবানের দোহাই, আগে আমার কথা শোন। আমার জীবন বাঁচাবার চেয়ে খালিদ ও নাহীদকে বন্দী করতে সে বেশী উৎসুক হবে। তোমরা এখানে কিরূপে এলে তা যেমন আমার অজ্ঞাত, তেমনি দেবলের ঘটনা কিভাবে ঘটেছিল তা তোমাদের সকলের অজ্ঞাত।

গংগু ও তার সাথীরা মনোযোগী থাকায় জয়রাম বন্দরে তাদের কাছ হতে বিদায় নেয়ার পর থেকে বন্দীশালায় যুবায়রের সাথে দেখা হওয়া পর্যন্ত আনুপূর্বিক ঘটনা বর্ণনা করলেন। শেষে তিনি খালিদ ও গংগুর দিকে মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন- যদি এখনো আমার উপর তোমাদের বিশ্বাস না হয় তবে আমি যে কোন শাস্তি গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি?

গংগু বলল- তাহলে তুমি এখন রাজার কাছে বন্দীদের জন্য সুপারিশ করতে যাচ্ছ?

তোমার এখনো বিশ্বাস হল না?

নিজের বোনকে জিজ্ঞেস কর, সে যদি তোমার কথা বিশ্বাস করে তবে আমরাও তোমাকে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত। একথা বলে গংগু মায়াকে বলে- আমরা তোমার ভাইয়ের বিচারের ভার তোমার উপর দিচ্ছি।

জয়রাম মায়ার দিকে ফিরল। মায়ার পক্ষে সে মুহূর্তটি অতি কঠিন পরীক্ষা। ভাইয়ের বিবরণ শোনার পর তার মনে এক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল। তা সত্ত্বেও সে ত ৎক্ষণাৎ মত পরিবর্তন করতে প্রস্তুত ছিল না। মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল। এক সুর বলছিল- মায়া, ভাইকে তোমার বিশ্বাস করা উচিত। অপর সুর প্রতিবাদ করছিল না, সে শুধু তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার ছল খুঁজছে। মানসিক দ্বন্দ্বের এ অবস্থায় তার মনে পড়ল গংগু বলেছিল- 'তার মুখ দেখে মোর মন গলে যাবে না তো? হয়ত তার বিচারের তরবারী তোমারই হাতে দিয়ে দেব'।

মায়া গংগুর দিকে তাকাল। তার দৃষ্টি যেন বলছিল- আমি বিচারের তলোয়ার তোমার হাতে দিয়েছি। এখন নিজের প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর।

জয়রাম মায়াকে ইতস্ততঃ করতে দেখে বলে উঠলেন- মায়া, তুমিও আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না?

সে জবাব দিল- তুমি এদের প্রতিশোধের ভয়ে যে এ কাহিনী রচনা করনি তার প্রমাণ কি?

আহত কণ্ঠে জয়রাম জবাব দিলেন- মায়া, তুমি বলতে চাও আমি কাপুরুষ। আমি মৃত্যু ভয়ে মিথ্যা বলছি। ভগবানের দোহাই আমাকে লোকের চোখে লজ্জিত ও হেয় কর না। আমি তোমার ভাই, কিন্তু তোমার যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয় এই নাও আমার ছোরা। আমার বুক চিরে দেখ আমার রক্ত এখনো লাল রয়েছে না সাদা হয়ে গেছে। একথা বলে নিজের ছোরা বের করে মায়ার হাতে দিলেন এবং নিজের বুক তার সামনে ধরে বললেন- মায়া, পিতার শ্বেত চুল ও মাতার দুধের দোহাই, যদি আমি অপরাধী হই তাহলে তোমার ভাই বলে একটুও দয়া কর না। আমার নিজের বোন আমাকে কাপুরুষ মনে করে তা জানার পর আমি বেঁচে থাকতে চাই না। নিজের হাতে আমাকে চিরনিদ্রায় শায়িত কর। তোমার শিরায় যদি রাজপুত রক্ত প্রবাহিত হয় তবে ভাইয়ের জন্য পক্ষপাতিত্ব কর না।

উত্তেজনার আতিশয্যে মায়ার ছোরাবৃত হাত উত্থোলিত হয়। জয়রামের ওষ্ঠে মধুর হাসি দেখা দেয়। খালিদ কেঁপে উঠে। সাহস ও নিষ্ঠার ওই মূর্তির দিকে মায়া নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। তার হাত কাঁপতে থাকে। খালিদ চিৎকার দিয়ে বলে- 'মায়া, তোমার ভাই নির্দোষ'। মায়ার কম্পিত হাত থেকে ছোরা পড়ে যায়। সে আচম্-জয়রামকে জড়িয়ে ধরে ফোঁপাতে থাকে। 'ভাই, ভাই আমাকে মাফ করে দাও'।

জয়রাম মায়ার কালো চুলের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন- আমার বোন আমার স্নেহের মায়া!

ভাই-বোন অবশেষে পৃথক হয়ে দাঁড়ায়। খালিদ জয়রামের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে- জয়রাম, আমাকে মাফ কর। তোমার উপর সন্দেহ করা আমার অন্যায় হয়েছে।

জয়রাম তার হাত নিজের হাতে গ্রহণ করে বলেন- তোমার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। তোমার স্থলে হয়ত আমিও এরূপ করতাম।

খালিদ মৃদু হেসে বলে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে আমি আপনাকে ঘুষি মেরেছিলাম। সে ঋণ এখন আপনি আদায় করে নিতে পারেন।

জয়রাম বলেন- না ভাই, এ কাহিনী আর টেনো না। নইলে তোমাকে এক ঘুষি মেরে গংগুর হাতে আবার দু'ঘুষি খেতে হবে।

জীবনে আর কখনো গংগু এতটা বিব্রত হয়নি। সে মাথা নত করে দাঁড়িয়েছিল। জয়রাম অগ্রসর হয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বলেন- গংগু, তুমি যদি সত্যিই যুবায়র ও

তাঁর সাথীদের মুক্ত করতে চাও তবে ব্যাপারটা কয়েক দিনের জন্য আমার হাতে ছেড়ে দাও। আমি আশা করছি বাস্তব বিপদ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে রাজা এদেরকে বন্দী রাখতে সাহস করবেন না। যদি তিনি আমার কথা না শোনেন, আমি তোমার কাছে ফিরে আসব। আমরা তখন অন্য উপায় চিন্তা করব। কিন্তু খালিদের বোন কোথায়?

গংগু জবাব দেয়- সে আমাদের সাথেই আছে। জাহাজে সে আহত হয়েছিল।

সে এখন কেমন আছে?

এ প্রশ্নের উত্তরে খালিদ বলে- সে এখন আগের চেয়ে ভালো আছে। কিন্তু ঘা এখনো ভরাট হয়নি। আমি মায়াদেবীর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। তার শুশ্রূষা করতে মায়া অনেক কষ্ট করেছেন।

গংগু বললেন- জয়রাম, প্রতাপ রায় যদি রাজার হুকুমে জাহাজ লুট করে থাকে তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে কিছুতেই বন্দীদের মুক্তি দেবে না। আমার মনে হয় সে বরং এরূপ চেষ্টা করবে যে এ খবর যেন সিন্ধুর বাইরে না যায়। ব্রাহ্মণাবাদে এরূপ কয়েদখানা আছে যেখান থেকে মৃত্যু না হলে কেউ বের হতে পারে না। এ অবস্থায় এ সংবাদ মকরাণ বা বসরা পর্যন্ত পৌঁছানো বিশেষ আবশ্যক। সেখানকার সরকার হস্তক্ষেপ করলে রাজা নিশ্চয় বন্দীদের ছেড়ে দেবেন। জয়রাম বলেন- খালিদ যেতে চাইলে তাকে আমি সীমান্ত পার করে দেয়ার দায়িত্ব নিচ্ছি।

গংগু জবাব দেয়- খালিদকে আমিও সীমান্ত পার করে দিয়ে আসতে পারি। কিন্তু তার বোন সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তার যাওয়া অসম্ভব। তা ছাড়া আরবদের সৈন্য এখন তুর্কিস্তান ও আফ্রিকায় যুদ্ধরত। সৈন্যের স্বল্পতাবশতঃ এখন তাঁরা সিন্ধুর সঙ্গে বিরোধ হয়ত পছন্দ নাও করতে পারেন। খালিদের ধারণা যুবায়র কোন প্রকারে মুক্ত হলে এ অভিযান তার পক্ষে সহজ হবে। তিনি বসরা ও দামিশ্‌কের সমস্ত প্রধান ব্যক্তিদের চেনেন।

জয়রাম বলেন- এই যদি আপনাদের অভিপ্রায় হয় তবে আমি প্রতিজ্ঞা করছি প্রাণপণ করে আমি তাঁকে মুক্ত করতে চেষ্টা করব।

মায়া বলে- ভাই, তুমি সব কিছু করতে পার। যুবায়রকে মুক্ত করার সর্বপ্রকার চেষ্টা কর।

মায়া, তোমার সুপারিশ ছাড়াও এটা আমার কর্তব্য। পরে গংগুকে সম্বোধন করে বলেন- এখন আপনি অনুমতি দিলে আমি মায়াকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব।

গংগুর ইঙ্গিতে তার সঙ্গীরা সেখান থেকে চলে গেল। গংগু একদিকে সরে খালিদকে বলে- তুমি নাহীদের কাছে যাও। বন্দীদের কাছে কোন বার্তা পাঠাতে চাইলে জিজ্ঞেস করে এস।

খালিদ ভেতরে গেল। নাহীদ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। খালিদ বলে নাহীদ, একটু ভাল হলেই হাঁটাহাঁটি শুরু কর। তোমার বিছানায় শুয়ে থাকা উচিত।

তার কথা কানে না দিয়ে নাহীদ বলে- তোমরা বেচারা জয়রামের সাথে অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করেছ। এখন মায়া সম্বন্ধে তোমাদের সিদ্ধান্ত কি?

খালিদ জবাব দেয়- মায়া সম্বন্ধে এখনো কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। ভাই বোনে এখন কথা হচ্ছে। খুব সম্ভব সে তার সঙ্গে চলে যাবে।

জয়রাম যুবায়রকে মুক্ত করবার প্রতিজ্ঞা করেছে। তিনি মুক্ত হলেই মকরাণের পথে বসরা পৌঁছে আমাদের কাহিনী সবাইকে শোনাবেন। আমাদের সরকার হস্তক্ষেপ না করলে নারী ও শিশুদের মুক্তির আর কোন উপায় নেই।

নাহীদ বলে- আমি এসব কথা শুনেছি। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যেমন আব্বার ব্যাপারে সিন্ধুরাজ মকরাণের শাসনকর্তাকে এড়িয়ে গেছেন, তেমনি এ ব্যাপারেও চাপা দেওয়া হবে। আমি শুনেছি বসরার হাকিম অত্যন্ত দুর্ধর্ষ। কিন্তু সিন্ধুর দিকে মনোযোগ না দেয়ার তার সঙ্গত কারণ রয়েছে। আরবদের সমুদ্র বাহিনী এখন এশিয়া ও আফ্রিকায় ব্যস্ত রয়েছে।

খালিদ বিব্রত হয়ে বলে- আমি কিছু বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমি আল্লাহর অনুগ্রহে চির বিশ্বাসী। তিনি নিশ্চয় আমাদের সাহায্য করবেন।

আমি একটা উপায় ভেবেছি। আমি বসরার হাকিমের নামে এক পত্র দিচ্ছি। জয়রাম যদি যুবায়রকে মুক্ত করতে পারেন, তবে এ চিঠি তাঁর হাতে দেবেন। যদি ধরে নেওয়া যায় যে বসরার শাসনকর্তা এর দ্বারা প্রভাবান্বিত না হন, অন্ততঃ বসরার জনসাধারণ নিশ্চয় এর দ্বারা অভিভূত হবে। আমি স্বপ্নে মুসলমান বন্দীদের কয়েদখানার দরজা ভাংগতে দেখেছি। এ স্বপ্ন যে সফল হবে তাতে আমার মোটেই সন্দেহ নেই।

তুমি ভেতরে গিয়ে তোমার চিঠি লিখ। কিন্তু কিসের উপর লিখবে? এই নাও আমার রুমাল। খালিদ পকেটে হাত দিয়ে রুমাল বের করে নাহীদকে দিল। ফিরে যেতে যেতে বললো- তুমি চিঠি লিখ। ততক্ষণ আমি জয়রামকে ধরে রাখি।

বাইরে মায়া তার ভাইকে নিজের কাহিনী শোনাচ্ছিল। শেষ হলে জয়রাম বললেন- মায়া, এখানে তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে না তো?

সে বললো- না। গংগু আমাকে কন্যা মনে করে। নাহীদ আমাকে বোন মনে করে।

জয়রাম বললেন- মায়া তোমাকে এক দুঃসংবাদ দিতে যাচ্ছি।

মায়া ঘাবড়িয়ে জিজ্ঞেস করল- সেটা কি?

কথা এই যে এখন তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারছি না। আমি প্রতাপ রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলাম সে তোমাকে অপহরণ করেছে। কিন্তু সে যখন যুবায়র ও আলীকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল তখন তাদের প্রাণ রক্ষার জন্য আমি বলতে বাধ্য হই যে, তুমি আমার সাথে ছিলে না। এখন তোমাকে সাথে করে নিয়ে গেলে খালিদ ও নাহীদের খবর দিতে আমাকে বাধ্য করা হবে। আমি স্বয়ং রাজার কঠোরতাকে বেশী ভয় করি না

কিন্তু প্রতাপ রায়ের সন্দেহ হয়ে যাবে এবং সে খালিদ ও নাহীদের অনুসন্ধান শুরু করবে। আমি চাই না তোমাকে দেখে খালিদ ও নাহীদের অজ্ঞাতবাস সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। তুমি যদি আরো কিছুদিন এখানে থাকতে রাজি হও তাহলে প্রতাপ রায় হয়ত তিন চার দিনের মধ্যে দেবল ফিরে যাবে। তারপর তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাব।

মায়া আশ্বস্ত হয়ে জবাব দিল- ভাই, আপনি আমার জন্য মোটেই ভাববেন না। আমি এখানে সব রকম সুখে আছি। যতদিন নাহীদ সম্পূর্ণ সুস্থ না হয় ততদিন আমি তাকে ছেড়ে যেতে চাই না।

গংগু ও খালিদ অনতিদূরে কথা বলছিল। জয়রাম তাদের ডেকে কাছে নিয়ে এলেন। কাছে এলে তিনি বললেন- আপনাদের আবার সন্দেহ না হয় যে আমি ষড়যন্ত্র করছি। মায়া বলছে নাহীদ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকবে। আমিও কোন কারণে তাকে এখানে রেখে যাওয়া সঙ্গত মনে করি না।

কিছুদিন পরে আমি তাকে নিয়ে যাব। হয়ত যুবায়রের সাথে সাথে আমাকেও ফেরার হতে হবে। তখন স্থায়ীভাবে আপনাদের সাথে এসে মিলিত হব। এখন আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। প্রতাপ রায় শহরে পৌঁছবার সাথে সাথে হয়ত রাজা আমাকে সাক্ষাতের জন্য ডাকবেন। আমার অনুপস্থিত থাকা অসঙ্গত হবে।

খালিদ বলে- আপনি একটু অপেক্ষা করুন। নাহীদ একখানা চিঠি লিখছে। যুবায়রকে আপনি মুক্ত করার পর এই চিঠি তাঁকে দেবেন।

তাহলে তাড়াতাড়ি সে চিঠি নিয়ে এস। আমার খুব দেরী হয়ে গেছে। তারা হয়ত ব্রাহ্মণাবাদে পৌঁছে গেছে।

গংগু বলে- তুমি চিন্তা কর না। আমি এক সোজা পথে তোমাকে তাদের আগেই ব্রাহ্মণাবাদে পৌঁছিয়ে দেব।

জয়রাম বলেন- আমি শুধু আপনার একজন সঙ্গী আমার সাথে নিয়ে যেতে চাই। কিন্তু ব্রাহ্মণাবাদে তাকে কেউ যেন চিনতে না পারে। এটা বিশেষ জরুরী। যদি কোন সঙ্গীন অবস্থা হয় তা হলে আপনাকে খবর দেয়ার জন্য তাকে পাঠিয়ে দেব।

গংগু বলে- তুমি বসুকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

দুপ্রহরের সময় জয়রাম বসুর নির্দেশ মতো বন অতিক্রম করছিলেন।

॥ এক ॥

ব্রাহ্মণাবাদ থেকে এ ক্রোশ দূরে জয়রাম স্বীয় কাফিলা দেখতে পেলেন। বসুর সঙ্গে কাফিলায় যোগ দেওয়া অসঙ্গত মনে করে জয়রাম ভিন্ন পথ ধরলেন। অন্য ফটক দিয়ে তিনি শহরে প্রবেশ করলেন। ব্রাহ্মণাবাদে নারায়ণ দাশ নামক এক যুবক তাঁর বন্ধু ছিল। জয়রাম বসুকে তাঁর বাড়ীতে রেখে রাজকীয় অতিথিশালার দিকে অগ্রসর হলেন। কিছুক্ষণ পর প্রতাপ রায় বন্দীদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। জয়রামকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন- আমার সাথে শিকারের ভান কেন করলে? তুমি পরিষ্কার বললেই পারতে যে মহারাজের সাথে আমার আগে তুমি দেখা করতে চাও। এখন বলো, তোমার বোনের কাহিনী শুনে মহারাজ কি বললেন?

আমি এখনো মহারাজের সাথে দেখা করিনি আমার সে রকম উদ্দেশ্যই ছিল না।

প্রতাপ রায় আশ্বস্ত হয়ে বললেন- জয়রাম, আমার মনে হয় তোমার বোনের নিরুদ্দেশ হওয়া সম্বন্ধে তুমি মিথ্য বলনি। আমি আরবদের ছাড়া লংকার বন্দীদেরকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারা তোমার প্রথম বিবরণ সমর্থন করেছিল। তারা যদি রাজার কাছে অভিযোগ করে যে তোমার বোন ছাড়া জাহাজ থেকে এক মুসলমান বালিকাও নিখোঁজ হয়েছে। তাহলে সম্ভবতঃ রাজা আমাকে তার জন্য দায়ী করবেন।

আমি রাজার সামনেও একথা বলতে রাজি আছি আমার বোন জাহাজে ছিল না এবং মুসলমান বালিকার নিখোঁজ হওয়ার সংবাদও সত্য নয়।

কিন্তু তারা সত্যি জাহাজ থেকে উধাও হয়েছে। তোমার বিবরণও রাজাকে আশ্বাস দিতে পারবে না।

জয়রাম বিব্রত হয়ে বললেন- আপনি কি বলতে চান? প্রথমে আপনি যুবায়র ও আলীকে যন্ত্রণা দিয়ে আমাকে বলতে বাধ্য করলেন যে আমার বোন নিখোঁজ হয়নি। এখন আপনি প্রমাণ করতে জিদ ধরেছেন আমার বোন ও আরব বালিকা জাহাজ থেকে উধাও হয়েছে।

প্রতাপ রায় জবাব দিলেন- আমি জিজ্ঞেস করতে চাই কী কারণে তোমার বোনের রহস্য লুকিয়ে রাখতে তুমি বাধ্য হয়েছিলে?

আপনি জানেন যুবায়র আমার অতিথি ছিলেন। তিনি আমার প্রাণ রক্ষা করেছিলেন আমি চাইনি এই ঘটনার ছুতা ধরে আপনি তাকে যন্ত্রণা দেন।

তবে দাঁড়ায় এই যে কেবল যুবায়রের খাতিরে তুমি নিজের সত্য দাবী ছেড়ে

দিয়েছ। তুমি যুবায়রের বন্ধুতার জন্য নিজের বোনকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। কিন্তু তোমার মন সাক্ষ্য দিচ্ছে তোমার বোনকে আমি হরণ করেছি। শুধু তাই নয়, বরং এক আরব বালক ও আরব বালিকার নিখোঁজ হওয়ার দায়িত্বও আমার উপর বর্তে।

জয়রাম জবাব দিলেন- না, না, আপনার সম্বন্ধে আমার যে ভুল ধারণা ছিল তা দূর হয়ে গেছে।

কখন?

জয়রাম হঠাৎ অনুভব করলেন প্রতাপ রায় আবার তাঁর জন্য এক ফাঁদ পেতেছেন। তিনি চমকে উঠে বললেন- কিন্তু এসব কথার কি উদ্দেশ্য? আমি আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি রাজার সামনে আমার বোন সম্বন্ধে আমি কিছু উল্লেখ করব না।

প্রতাপ রায় শীতলভাবে বললেন- তুমি নিজে যা না বলবে, তা আরব বন্দীদের মুখে বলাবে। তাতে আমার পক্ষে কোন পার্থক্য হবে না। যে রহস্য প্রথমে তুমি প্রকাশ করতে চেয়েছিলে, তা আমি লুকাতে চেয়েছিলাম। এখন যে রহস্য তুমি লুকাতে চাও তাই আমি প্রকাশ করতে বাধ্য। আমার সম্বন্ধে যদি তোমার ভুল ধারণা দূর হয়ে থাকে তা হলে নিশ্চয়ই তার কারণ আছে। আমি সে কারণটা জানতে চাই। আমি স্বীকার করতে রাজি নই তুমি এক আরবের জন্য এত বড় ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। কোন বুদ্ধিমান লোক একথা স্বীকার করতে প্রস্তুত হবে না।

তাহলে আমার কথার উদ্দেশ্য এই দাঁড়ায় যে আমি নিজেই আমার বোনকে লুকিয়ে রেখেছি।

তোমার বোনের ব্যাপারে কোন গুরুত্ব আমার কাছে নেই। কিন্তু আরব বালিকার সন্ধানের দায়িত্ব আমার। খুব সম্ভব তোমার মতই আরবরাও রাজাকে আমার প্রতি বিরূপ করার উদ্দেশ্য একটি বালিকা নিখোঁজ হবার কাহিনী উদ্ভাবন করছে। কিন্তু দরবারে যদি তার উধাও হওয়ার প্রশ্ন উঠে তবে আমাদের মধ্যে একজনকে তার দায়িত্ব বহন করতে হবে।

জয়রাম কিছুক্ষণ ভেবে বললেন- আমি যেমন প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে আপনার বিরুদ্ধে আমার বোন হরণের ক্ষুদ্র কাহিনী রচনা করেছিলাম, হয়তো তারাও তেমনি আমাকে আপনার সহকর্মী মনে করে নিছক প্রতিশোধ নেয়ার জন্যই ছল খুঁজছে। আমি যুবায়রকে বুঝাতে পারি। আমি আশা করি আমার কথায় তিনি রাজার সামনে মিথ্যা অভিযোগ থেকে বিরত থাকবেন।

প্রতাপ রায় নির্বিকারভাবে জবাব দেন- তুমি কোন বন্দীর সাথে কথা বলতে পারবে না। আমি প্রহরীদের আদেশ দিয়েছি, রাজার সামনে পেশ করার আগে তুমি নিজের সিন্দুক খুলে দেখার অনুমতিও পাবে না।

জয়রাম কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু একজন সামরিক কর্মচারী এতে প্রতাপ রায়কে সংবাদ দিল, মহারাজ তাঁকে স্মরণ করেছেন।

জয়রাম প্রতাপ রায়ের সাথে যেতে চাইলেন। কিন্তু তিনি বললেন, মহারাজ আমাকে স্মরণ করেছেন, তোমাকে নয়। তুমি নিশ্চিন্তে বসে থাক। যখন তোমাকে ডাকা হবে আমি তোমার পথ রোধ করব না।

প্রতাপ রায় জাহাজ থেকে লুট করা মাল তুলে নিয়ে চলে গেলেন। জয়রাম অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। যুবায়র অন্য বন্দীদের সাথে এক ঘরে বসেছিলেন। জয়রাম পায়চারী করতে করতে ভেতরে উঁকি মেরে দেখলেন। কিন্তু প্রহরীরা তাকে একদিকে ঠেলে দরজা বন্ধ করে দিল। এক সাধারণ প্রহরী জয়রামের সাথে ওরকম ব্যবহার করছে দেখে যুবায়র ও অন্যান্য বন্দীদের বুঝতে বাকী রইল না যে, তারা একই নৌকার যাত্রী।

॥ দুই ॥

সূর্যাস্তের একটু আগে এক সিপাই এসে জয়রামকে খবর দিল মহারাজ তাকে ডেকেছেন। জয়রাম কাঠিয়াওয়াড় রাজের উপঢৌকন সম্বলিত সিন্দুক নিয়ে প্রাসাদে চলে গেলেন। প্রহরী তাকে এক ঘরে নিয়ে গেল। রাজা দাহির সিংহ মর্মর প্রস্তরের চত্বরে স্বর্ণ-আসনে ছিলেন। প্রতাপ রায় ব্যতীত দেবলের প্রধান শাসনকর্তা, সেনাপতি উদয় সিংহ এবং তার তরুণ পুত্র ভীম সিংহ যারা আরবার থেকে রাজার সাথে এসেছিলেন, সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জয়রাম তিনবার নত হয়ে রাজাকে প্রণাম করে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। দুইজন সিপাই আবলুসের সিন্দুকটি রাজার সামনে এনে রাখল। জয়রাম রাজার আদেশে সিন্দুক খুললেন। রাজা মণিমুক্তার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর প্রতাপ রায়ের দিকে তাকালেন এবং জয়রামকে প্রশ্ন করলেন- শুনেছি তুমি আরবদের সাহায্য করতে চেয়েছিলে। তুমি আমার সম্বন্ধে একথাও বলেছ আমি আরবদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অক্ষম। আমার বিশ্বস্ত কর্মচারী প্রতাপ রায়কে অপবাদ দেয়ার জন্য তুমি এক আরব বালিকা ও তোমার বোনকে লুকিয়ে রেখেছ।

জয়রাম জবাব দিলেন- অন্নদাতা, প্রতাপ রায় আপনার আদেশে জাহাজ লুণ্ঠন করেছে, এটা আমার বিশ্বাস হয়নি। দেবলে জাহাজ ভিড়াবার ইচ্ছা তাঁদের ছিল না। তাঁরা পথে জলদস্যুদের হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। দেবলে আমি তাঁদেরকে আমার অতিথি করে নিয়ে আসি। অতিথিকে রক্ষা করা রাজপুতের ধর্ম। আরব বালিকা এবং আমার বোন সম্বন্ধে এর বেশী আমি বলতে পারি না। জাহাজ লুণ্ঠনের সময় আমাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল।

তুমি প্রতাপ রায়কে বলেছিলে আরবদের বন্ধন মুক্তির জন্য তুমি এই ছুতা বের করেছিলে।

অন্নদাতা আমি একথা অস্বীকার করি না। কিন্তু....

রাজা কর্কশ স্বরে বললেন- আমি কিছুই শুনতে চাই না। আরবগণ যদি অভিযোগ

করে জাহাজ থেকে তাদের একটি বালিকা নিখোঁজ হয়েছে, তা হলে তোমাকে আমার হাতে সে বালিকাকে এনে দিতে হবে।

মহারাজ, যদি আরবগণ সন্দেহ প্রকাশ করে আমি বালিকাকে হরণ করেছি তা হলে আমি যে কোন শাস্তি মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত আছি।

আমি তোমার চালাকি বেশ বুঝেছি। আরবগণ যদি তোমাকে অপরাধী মনে করে তবে তার অর্থ এই যে, তুমি তাদের সম্মতিক্রমে মেয়েটিকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছ। তুমি জান আমাদের এমন উপায় আছে, যার দ্বারা তাদেরকে সত্য কথনে বাধ্য করা যাবে।

অন্নদাতা, আমাকে যদি অপরাধী সাব্যস্ত করেন তবে যে শাস্তি ইচ্ছা আমাকে দিন। কিন্তু আরবদেরকে ইতিপূর্বে অনেক যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছে।

তা হলে তুমি আমাদের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাও?

তারা আপনার শত্রু নয়। তারা সিন্ধুকে শান্তিপূর্ণ প্রতিবেশী বলেই গণ্য করে আসছে। নয়তো তারা দেবলের কাছেও ঘেঁষত না। তাদের উদ্দেশ্য যদি সাধু না হত তা হলে মণিমুক্তার যে সিন্ধুকটি আমি কাঠিয়াওয়াড় রাজের পক্ষ থেকে মহারাজের সমক্ষে পেশ করছি, তা এখানে পৌঁছত না।

রাজা বললেন- কাঠিয়াওয়াড়ের মণিমুক্তা লংকার মণিমুক্তার তুলনায় উপলখন্ড প্রতীয়মান হয়।

মহারাজ, আমি জহুরী নই, সৈনিক মাত্র। আমি প্রস্তর চিনি না। কিন্তু আপনার শত্রু ও মিত্রকে চিনি। আমি এসব প্রস্তরের সঙ্গে কাঠিয়াওয়াড় রাজের বন্ধুত্বের বার্তা এনেছি। এসব প্রস্তরের মূল্য যদি এক কানা কড়িও না হয়, তবুও যে হস্ত আপনার সামনে এ নগণ্য উপঢৌকন পেশ করছে তা বহু মূল্যবান। কিন্তু প্রতাপ রায় আরবদের ন্যায় শান্তিপ্রিয় এবং শক্তিশালী প্রতিবেশী রাজ্যের জাহাজ লুণ্ঠন করে আপনার জন্য যারা কিছু এনেছে, তা শেষ পর্যন্ত দুর্মূল্য প্রমাণিত হবে। অন্নদাতা, মুসলমানদের শত্রুতা ক্রয় করার আগে বেশ ভেবে চিন্তে কাজ করা দরকার। তাদের বাহু অন্য সকলের চেয়ে শক্তিমান, তাদের লৌহ অন্য সব লৌহকে কেটে ফেলে। তারা কালবৈশাখীর ঝড়ের মত ধাবিত হয় এবং শ্রাবণের বর্ষার মত ছেয়ে যায়। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে সমুদ্রে বা পর্বত কিছুই আশ্রয় দিতে পারবে না। তাদের অশ্ব পানিতে সাঁতার দেয় এবং বাতাসে উড়ে। আপনি বর্ষাকালে সিন্ধু নদীর ঢেউ দেখেছেন। কিন্তু তাদের বিজয় বন্যা তারচেয়েও অধিক প্রবল ও দ্রুতগামী।

রাজা দাহিরের ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করেছিল। তিনি চীৎকার দিয়ে বললেন- ভীতু শৃগাল। তোমার শিরায় রাজপুতের রক্ত প্রবাহিত নয়। আমার রাজ্যে তোমার ন্যায় ভীরু কাপুরুষের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই।

অন্নদাতা, আমি এখন কাঠিয়াওয়াড়ের মহারাজার দূত। আমি নিজেও এমন দেশে

থাকতে চাই না যেখানে মিত্রকে শত্রু এবং শত্রুকে মিত্র মনে করা হয়।

কাঠিয়াওয়াড়ের রাজা যদি স্বয়ং এখানে উপস্থিত থাকতেন তা হলেও এসব কথা শুনবার পর আমি তার মস্তক ছেদন করতাম। প্রতাপ রায়, একে নিয়ে যাও। আমি কাল এর শাস্তির ব্যবস্থা করব। প্রাতে আরবদের দলপতিকে আমার সমক্ষে পেশ করবে।

প্রতাপ রায় সিপাইদের ডাক দিলেন। নগ্ন তরবারী নিয়ে আটজন লোক এসে উপস্থিত হল- প্রতাপ রায় জয়রামকে চলবার ইঙ্গিত করলেন। নগ্ন তরবারীর প্রহরায় জয়রাম প্রতাপ রায়ের আগে আগে চললেন।

উদয় সিংহ জয়রামের বক্তৃতার সময় অনুভব করেছিলেন এক বিকৃত মস্তিষ্ক যুব তার নিজের ধারণাই প্রকাশ করে যাচ্ছে। তিনি বললেন- অন্নদাতা, অনুমতি হলে আমি কিছু নিবেদন করতে চাই।

রাজা উত্তর দিলেন- তোমার বলার প্রয়োজন নেই। আমি ওকে এমন শাস্তি দেব যাব ব্রাহ্মণাবাদের লোকেরা বহুদিন ভুলতে পারবে না।

উদয় সিংহ বলেন- কিন্তু মহারাজ, আমি নিবেদন করতে চাই যে, সে যা কিছু বলেছে সাধু উদ্দেশ্য নিয়েই বলেছে। কয়েকটি হাতী এবং মণিমুক্তার বিনিময়ে আরবদের সাথে আমাদের শত্রুতা ক্রয় করা ঠিক হবে না। নিজ শক্তির উপর আমাদের বিশ্বাস আছে। কিন্তু আরব জাতি বড় কঠিন প্রাণ শত্রু।

রাজা বললেন- উদয় সিংহ শৃগালের চীৎকার শুনে তুমিও শৃগাল হয়ে গেলে? আরবগণ উটের দুধ এবং যবের শুষ্ক রুটি ভক্ষণ করে। তাদের স্পর্ধা হবে আমাদের সাথে যুদ্ধ করার?

মহারাজ, উটের দুধ খেয়ে তারা সিংহের সাথে যুদ্ধ করে এবং যবের রুটি খেয়ে পাহাড়ের সাথে টক্কর দেয়।

তোমার ধারণা তারা উটের উপর চড়ে আমাদের হাতীর সাথে যুদ্ধ করতে আসবে?

অন্নদাতা, বিদ্রূপ হবেন না। কিন্তু তাদের উট ইরানের হস্তীকে পরাজিত করেছে।

ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা বললেন- উদয় সিংহ, আমি তোমার কাছে এতটা আশা করি নি যে, তুমি আরবদের সম্বন্ধে শোনা কথায় এরূপ পরাভূত হয়ে যাবে।

আমরা আরব দেশের সমুদয় বাসিন্দার চেয়ে বেশী সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে নামাতে পারব। রাজপুতানার সমস্ত রাজা আমার ইঙ্গিতে শির দিতে প্রস্তুত হবে।

উদয় সিংহ বললেন- মহারাজ, আমি তাদের ভয় করি না। কিন্তু আমি নিবেদন করছি যে সুপ্ত সংঘর্ষকে জাগিয়ে লাভ কি? অপরের সাহায্যের ভরসায় এক শক্তিশালী শত্রুর সাথে যুদ্ধ ক্রয় করা উচিত নয়।

উদয় সিংহ তুমি বারবার কি বলছ? সিন্ধুর সামনে আরব মরুবাসী মোটেই শক্তিশালী শত্রু বলে গণ্য হতে পারে না। আরবদের এমন কী ঘূর্ণ আছে যা আমাদের

সৈন্যদের নেই?

মহারাজ, এমন শত্রুর কোন প্রতিবন্ধক নেই- যে মৃত্যুকে ভয় করে না। আমার কথা বিশ্বাস না হলে আপনি বন্দীদের মধ্যে থেকে এক আরবকে এনে পরীক্ষা করতে পারেন। তরবারী তাদের খেলনা।

রাজা উদয় সিংহের পুত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন- কেমন ভীম সিংহ, তোমারও কি ধারণা যে আমাদের সৈন্য আরবদের তুলনায় দুর্বল?

ভীম সিংহ জবাব দেন- মহারাজ, পিতাজী আরবদের সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক রাখা শ্রেয়ঃ মনে করেন। নচেৎ আমরাও তলোয়ারের ছায়ায় মানুষ হয়েছি। আরবগণ যদি মৃত্যুকে ভয় না করে তবে আমাদেরও মারতে পেছপা হওয়া উচিত নয়।

রাজা বললেন- শাবাশ, দেখলে উদয় সিংহ, তোমার ছেলে তোমার চেয়ে অধিক সাহসী।

উদয় সিংহ বললেন- মহারাজের মুখে একথা শুনে আমার আনন্দিত হওয়া উচিত। কিন্তু সেনাপতির কর্তব্যের খাতিরে আমি দেখতে বাধ্য যে আসন্ন বিপদকে মহারাজের সামনে ছোট করে পেশ করা না হয়। ভীম সিংহ এখনো শিশু। সে আরবদের যুদ্ধ করতে দেখেনি। কিন্তু আমি মকরাণের যুদ্ধে দেখেছি সাধারণ আরব সৈনিক আমাদের বড় বড় যোদ্ধাদের সাথে টক্কর দিতে পারে। মাত্র ছ'শ অশ্বারোহী নিয়ে আরবগণ মকরাণ আক্রমণ করেছিল। রাজার চার হাজার সৈন্যকে তারা তৃণের ন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। জয়রামকে আপনি অনেকদিন থেকে চেনেন। আমাদের তরুণদের মধ্যে তরবারী ধারণে তাঁর চেয়ে পটু আর কেউ নেই। সেই যদি আরবদের দ্বারা অভিভূত হয়ে থাকে, তবে তা এ জন্য নয় যে, সে কাপুরুষ বা মহারাজের কাছে নিমকহারাম। এর একমাত্র কারণ আরব বিরোধিতার গুরু বিপদ সে সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছে।

রাজা তিক্ত স্বরে বললেন- তুমি আমার সেনাপতি মন্ত্রী নও। আমি এসব বিষয়ে তোমার বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হতে চাই না। বৃদ্ধ বয়সে তোমার সাহস হার মেনে থাকলে এ পদ থেকে তোমাকে রেহাই দেওয়া যায়। জয়রামের ন্যায় উদ্ধত, অবাধ্য ও ভীরু লোকের সুপারিশ করার অধিকার নেই। সে আমার কাছে যা বলেছে তাই চরম শাস্তির পক্ষে যথেষ্ট।

উদয় সিংহ রাজার মিযাজ দেখে ভীত হলেন। তিনি বললেন- মহারাজ, আমি মাফ চাই। আপনি আমায় ভুল বুঝেছেন। আমি এতো কথা বলার ধৃষ্টতা এ জন্য করেছি যে, আপনি এখনো আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নি। আপনি যদি যুদ্ধ ঘোষণা করে থাকেন তা হলে আপনার জয়ের জন্য জীবন উৎসর্গ করা আমার এবং প্রত্যেক সৈনিকের একান্ত কর্তব্য। জয়রামের ঔদ্ধত্যের জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি সময় এলে সেও প্রমাণ দেবে যে সে একজন বিশ্বস্ত রাজপুত। আপনি আরবদের সাথে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত করে থাকলে আজ থেকেই আমাদের প্রস্তুতি শুরু

করতে হবে। আমি চাই আরবদের আমরা এমন পরাজয় দেব যেন তারা আর মাথা তুলবার উপযুক্ত না থাকে। এ উদ্দেশ্যে আমাদের সৈন্যসজ্জা ছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ছোট বড় সমস্ত রাজাদের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। তাঁরা সবাই আপনার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন এবং আপনার পতাকাতলে যুদ্ধ করতে গৌরব বোধ করবেন। কাঠিয়াওয়াড়ের রাজাকেও অবজ্ঞা করা উচিত হবে না। তিনি আপনাকে উপঢৌকনের ছলে কর পাঠিয়েছেন। আপনি জয়রামের অপরাধ ক্ষমা করলে তারই মধ্যস্থতায় যুদ্ধের সময় কাঠিয়াওয়াড়ের সাহায্য পাওয়া যাবে।

রাজা কিছুটা শান্ত হয়ে বলেন- এখন তুমি রাজপুতের মত কথা বলছ। কিন্তু জয়রাম আরবদের সাথে মিশে গেছে। তাকে যদি মাফও করা হয় তবে সে আমাদের সাথে প্রতারণা করবে না তার প্রমাণ কি? হাঁ, আমি শুনেছি সে এক আরব যুবকের বন্ধুত্বের গুণগ্রাহী। জয়রাম যদি তাঁর সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয় এবং অসিযুদ্ধে তাকে পরাজিত করতে পারে, তাহলে আমি তাকে ছেড়ে দেব।

মহারাজ, আপনার ইঙ্গিত পেলে সে পর্বতের সাথে টক্কর দিতে প্রস্তুত হবে। বেশ তোমার সুপারিশে আমি তাকে সুযোগ দেব। জয়রামের আন্তরিকতা ছাড়াও অসি চালনায় এক আরবের সাহস ও নৈপুণ্যও দেখা যাবে।

একথা বলে রাজা দরবার ভেঙ্গে অন্দর মহলে চলে গেলেন।

॥ তিন ॥

পরদিন রাজা দাহির ব্রাহ্মণাবাদ প্রাসাদের এক প্রশস্ত কামরায় দরবার বসালেন। সিন্ধুর রাজধানী আরবার থেকে রাজমন্ত্রীও ব্রাহ্মণাবাদে এসে পৌছে ছিলেন। মন্ত্রী, সেনাপতি এবং অন্যান্য সভাষদগণ মর্যাদানুসারে সিংহাসনের নিকট কুর্সীতে আসীন। মন্ত্রী ও সেনাপতির পর তৃতীয় আসনখানি পূর্বে ব্রাহ্মণাবাদের শাসনকর্তার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এখন তা দেবলের শাসনকর্তাকে দেয়া হল। ব্রাহ্মণাবাদের শাসনকর্তাকে রাজার কাছ থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে বসতে হওয়ায় তিনি ভাবছিলেন বিধাতা যেন তাঁর ও রাজার মধ্যে পর্বত খাড়া করে দিয়েছেন। রাজার বামদিকে পঞ্চম কুর্সিতে ভীম সিংহ বিরাজমান ছিলেন। অন্য সভাষদগণ বামদিকে অন্য কাতারে বসেছিলেন। কুর্সীসমূহের পেছনে পনর বিশজন কর্মচারী ডানে বামে দু'সারিতে দন্ডায়মান। সিংহাসনের উপর ডানে ও বামে দুই রাণী আসীন ছিলেন। এক সুন্দরী বালিকা রাজার পেছনে সুরাহী ও পেয়ালা নিয়ে দন্ডায়মান ছিল। সভা-কবি সুর করে রাজার প্রশংসাসূচক কয়েকটি কবিতা পাঠ করলেন। পরে কিছুক্ষণ নৃত্য ও গানের মাহফিল চলল। রাজা কয়েক পেয়ালা মদ পান করলেন এবং বন্দীদের হাজির করতে আদেশ দিলেন। সিপাই যুবায়রকে শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় উপস্থিত করল। কিছুক্ষণ পর জয়রাম প্রবেশ করলেন। যুবায়রের মত তাঁর হাতে পায়ে শৃংখল ছিল না। কিন্তু তাঁর সামনে ও পেছনে নগ্ন তলোয়ারধারী প্রহরী দেখে যুবায়র বুঝতে পারলেন তাঁর অবস্থা বড় পৃথক নয়।

রাজা প্রতাপ রায়ের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন- এ আমাদের ভাষা জানে?

তিনি দাঁড়িয়ে উত্তর দিলেন, হাঁ, মহারাজ। বিদেশী ভাষা শিখতে একে বেশ পটু মনে হচ্ছে।

রাজা যুবায়রের দিকে তাকিয়ে বললেন- তোমার নাম কি?

যুবায়র- তিনি জবাব দিলেন।

রাজা বললেন- আমি শুনেছি তুমি আমার সাথে কথা বলবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত ছিলে। বল, কি বলতে চাও।

আমি জিজ্ঞেস করতে চাই- দেবল বন্দরে আমাদের জাহাজ কেন লুণ্ঠন করা হল এবং আমাদের বন্দী করে আমাদের সাথে এরূপ পাশবিক ব্যবহার কেন করা হচ্ছে?

রাজা খানিক অতিষ্ঠ হয়ে জবাব দিলেন- যুবক, আমি আগেই শুনেছি আরবগণ কথা বলার রীতি জানে না। কিন্তু নিজের ও সঙ্গীদের খাতিরে তোমার একটু বিবেচনার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

যুবায়র বললেন- আমাদের সাথে যে ব্যবহার করা হয়েছে তা যদি আপনার অজ্ঞাত হয় তবে ভিন্ন কথা। নচেৎ একথা সত্য যে দেবলের শাসনকর্তা আমাদের উপর বিনা কারণে আক্রমণ করেছেন। আমাদের সম্বন্ধে যদি আপনার কোন ভুল ধারণা থাকে তবে তা দূর করতে আমি প্রস্তুত। কিন্তু সিন্ধুর পক্ষ থেকে আমাদের আত্মাভিমান পরখ করার জন্য এরূপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে তবে আপনাকে আমি জানিয়ে দিতে চাই আমরা ভারতের অস্পৃশ্য নই যাদের মিনতি তাদের কণ্ঠের বাইরে আসতে পারে না। এ পর্যন্ত আমাদের সাথে এরূপ দুর্ব্যবহার করার সাহস কেউ করে নি। সিন্ধু-রাজ্য এমন কোন রাজ্য নয় যে ইরানের বর্ম ও রোমের লৌহ-শিরস্ত্রাণ কর্তনকারী অসির আঘাত ব্যর্থ করতে পারবে। যে জাতির ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেক নিপীড়ত জাতিকে তার ন্যায্য অধিকার দান স্বীয় কর্তব্য মনে করে তারা স্বজাতীয় বধূ ও কন্যাদের অপমান কিছুতেই নীরবে সহ্য করবে না।

রাজা উযীরের দিকে তাকিয়ে বললেন- শুনছ, এক বন্দী আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে।

উযীর উত্তর দিলেন- মহারাজ, আরবগণ বেশ বাক্যবীর। ইরান ও রোমে বিজয় লাভ করে এরা উদ্ধত হয়ে উঠেছে। কিন্তু সিন্ধুর সিংহের সাথে এরা এখনো পাল্লায় পড়েনি।

যুবায়র জবাব দিলেন- দেবলে আমরা সিংহের বীরত্ব দেখিনি বরং শৃগালের প্রবঞ্চনা দেখেছি।

যুবায়রের এ কথার পর সমস্ত সভাষদ অবাক বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে উদয় সিংহ দাঁড়িয়ে করজোড়ে বললেন- মহারাজ, কয়েকদিন বন্দী থাকায় এ যুবকের বুদ্ধি-বিবেচনা লোপ পেয়েছে। একথাও আপনার অজানা নয় যে সৈনিকের অসি ভোঁতা, তাঁর রসনা তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে।

ক্রোধান্ধ থাকায় যুবায়র উদয় সিংহের এ সদিচ্ছা প্রণোদিত মধ্যস্থতার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন না। তিনি বলে উঠলেন- আমার উপর পেছন থেকে আক্রমণ করা হয়েছিল। নইলে আমার অসির তীক্ষ্ণতা সম্বন্ধে তোমার মত পরিবর্তন করতে হত।

প্রতাপ রায় উঠে বলেন- মহারাজ, এ মিথ্যা বলছে। আমি একে যুদ্ধ করে বন্দী করেছি।

ক্রোধ ও ঘৃণায় কম্পিত কণ্ঠস্বরে যুবায়র বলেন- ভীরু কাপুরুষ! তুমি মনুষ্যত্বের জঘন্যতম প্রতীক। আমার হাত পা আবদ্ধ রয়েছে। তা সত্ত্বেও তোমার মুখের উপর ভীতি উৎকণ্ঠার চিহ্ন স্পষ্ট। সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ দেখেও শৃগাল ভয়ে আত্মহারা। আমার একটি মাত্র হাত খুলে আমাকে তলোয়ার দাও, এদেরকে আমার ও তোমার দাবীর সত্যতা প্রমাণ করে দিচ্ছি।

প্রতাপ রায় পিটপিটিয়ে সভাষদের দিকে তাকাচ্ছিলেন। ব্রাহ্মণাবাদের শাসনকর্তা যুবায়রের প্রস্তাবকে দৈব সুযোগ বলে গ্রহণ করলেন। তিনি দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন- মহারাজ, তবে দরবারে এক সাধারণ আরব সর্দার প্রতাপ রায়কে ভীরুতার অপবাদ দিচ্ছে এটা ক্ষত্রিয় ধর্মের অপমান। আপনি সর্দার প্রতাপ রায়কে অনুমতি দিন, তিনি এ দাবীর অসারতা প্রমাণ করে দেখাবেন।

প্রতাপ রায়ের প্রতি উদয় সিংহের বিদ্বেষ কম ছিল না। কিন্তু জয়রামকে রাজকোষ হতে রক্ষা করা তিনি অধিকতর প্রয়োজনীয় মনে করছিলেন। তাঁকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় তাঁর মতে এই ছিল যে, জয়রাম যুবায়রের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে রাজার মন থেকে তাঁর আরব-প্রীতির সন্দেহ দূর করবেন। তিনি উঠে বললেন- হারামজাদা, ব্রাহ্মণাবাদের শাসনকর্তার প্রস্তাব সঙ্গত নয়। এক সাধারণ আরবের সাথে প্রতিদ্বন্দিতা করলে সর্দার প্রতাপ রায়ের মর্যাদাহানি হবে। এ যুবকের বাসনা পূর্ণ করার জন্য আমাদের কাছে হাজার হাজার যুবক রয়েছে। মহারাজের মনঃপুত হলে আপনি জয়রামকে প্রমাণ করার সুযোগ দিন যে, সে ম্লেচ্ছ আরবদের বন্ধু নয়।

রাজা জবাব দিলেন- তুমি জয়রামের পক্ষে কয়েকবার সুপারিশ করেছ। কিন্তু তার কথায় মনে হচ্ছে সে আরবদের ভয়ে ভীত। কি বল জয়রাম, তুমি স্বীয় বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিতে প্রস্তুত।

জয়রাম মিনতিপূর্ণ স্বরে বললেন- আপনার ইঙ্গিতে আমি আগুনে ঝাঁপ দিতে পারি। কিন্তু যুবায়র আমার অতিথি। তাঁর বিরুদ্ধে আমি অসি ধারণে অক্ষম।

দরবার আবার নিস্তব্ধ। উদয় সিংহ বিষন্ন মনে জয়রামের দিকে তাকালেন। রাজা তারস্বরে বলে উঠলেন- এ গর্দভকে আমার সম্মুখ থেকে নিয়ে যাও। এর মুখে কালি মেখে এবং পিঞ্জরাবদ্ধ করে একে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরাও। আগামীকাল একে মত্ত হস্তীর সামনে ফেলে দেওয়া হবে। উদয় সিংহ, তুমি এ আরবের সামনে আমাদের লজ্জিত করেছ। প্রতাপ রায়, তুমি নীরব কেন? তুমি দেবলে একে পরাজিত করেছ। এখন তোমার অসি কোষ মুক্ত হচ্ছে না কেন? তোমাদের সবাইকে সাপে কেটেছে কি?

নব যুবক ভীম সিংহ অসি কোষমুক্ত করে বললেন- মহারাজ, আমাকে অনুমতি দিন।

ভীম সিংহের দেখাদেখি সভাষদ তলোয়ার কোষমুক্ত করলেন। সর্বশেষে প্রতাপ রায় তরবারী উন্মুক্ত করলেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি রাজাকে মিনতি করছিল- অনুদাতা, আমার উপর দয়া করুন। সভাষদগণ রাজার ইঙ্গিতের অপেক্ষায় আছে দেখে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে যুবায়র বললেন- যথেষ্ট হয়েছে, আর না। আমার বিশ্বাস হয়েছে যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে শৃংখলাবদ্ধ দেখে আপনার সভাষদগণ ভীরুতার অপবাদ সহ্য করবেন না। কিন্তু বিধাতা খেঁকশিয়ালের সামনে সিংহকে সর্বদা আবদ্ধ অবস্থায় হাজির করেন। ভীম সিংহ বলেন- মহারাজ, এর শৃংখল খুলে দেয়া হোক। আমি একে এখনই জানিয়ে দেব, সিংহ কে এবং খেঁকশিয়াল কে।

রাজার ইশারায় প্রহরীরা যুবায়রকে শৃংখলমুক্ত করে দিলো। তাঁর হাতে একখানা তলোয়ার দেওয়া হল। কিন্তু উযীর বললেন- মহারাজ, আপনার দরবারে প্রতিদ্বন্দ্বীতা হওয়া সঙ্গত নয়।

রাজা জবাব দিলেন- কেন সঙ্গত নয়? এই দরবারে আমার সৈনিকদের কাপুরুষত্বের অপবাদ দেওয়া হয়েছে। আমি চাই এই দরবারেই তার প্রতিশোধ নেওয়া হোক।

মহারাজ, এ যুবককে যুদ্ধ করার সুযোগ না দিয়েও প্রতিশোধ নেওয়া চলে।

রাজা উত্তর দিলেন- না আমি দেখতে চাই, আরব কিভাবে অসি চালনা করে।

ভীম সিংহ দরবারের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে এসে দাঁড়ালেন এবং তলোয়ারের ইঙ্গিতে যুবায়রকে সামনে আসার জন্য আহবান করলেন।

যুবায়র রাজার দিকে তাকিয়ে বললেন- এ যুবকের সাথে আমার কোন শত্রুতা নেই। প্রতাপ রায় আমার কাছে অপরাধী। একে কেন বলির পাঁঠা করছেন?

ভীম সিংহ বলেন- কাপুরুষ, তুমি কেবল কথা বলতেই জান। সাহস থাকে তো অগ্রসর হও।

অপরের বোঝা বহন করতে তোমার যদি হয়ে থাকলে সেটা তোমার অভিরুচি। একথা বলে যুবায়র অগ্রসর হয়ে ভীম সিংহের সামনে দাঁড়ালেন। রাজার আদেশে সৈন্যগণ সিংহাসন এবং কুর্সীগুলোর সামনে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে গেল। উদয় সিংহ বললেন- বৎস, খেলো আক্রমণ কর না। তুমি এক ভয়ংকর শত্রুর প্রতিপক্ষ।

পিতঃ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এ কথা বলে, ভীম সিংহ পর পর তিনি চারবার আক্রমণ করলেন। এ আক্রমণের অপ্রত্যাশিত তীব্রতায় যুবায়র দু'তিন পা পেছনে হটে গেলেন। সভাষদগণ উল্লসিত হর্ষধ্বনি করলেন। যুবায়র কিছুক্ষণ শুধু ভীম সিংহের আক্রমণ প্রতিরোধ করে গেলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই দর্শকগণ অনুভব করলেন যে, আক্রমণকারীর চেয়ে প্রতিরোধকারীর বাহু অধিকতর ক্ষীপ্র ও সবল। উদয় সিংহ চীৎকার দিয়ে বললেন- বৎস, উত্তেজিত হয়ো না ধীরস্থির অসি-যোদ্ধা চিরকালই ভয়ংকর।

যুবায়রের শান্ত মুখের মৃদু হাস্য ভীম সিংহের উত্তেজনা তীব্র করে। তিনি এলোপাথাড়ি আক্রমণ করতে থাকেন। তাকে আত্মহারা হতে দেখে যুবায়র পরপর কয়েকবার আক্রমণ করেন এবং ভীম সিংহকে তীব্র আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টায় ব্রতী করেন। কয়েকবার এরূপ ঘটে যে, ভীম সিংহের অসি সময়মত আত্মরক্ষাকল্পে উত্থিত হয় না। কিন্তু তাঁকে ঘায়েল করার পরিবর্তে শুধু তাঁর অঙ্গের অংশ বিশেষ স্পর্শ করে ফিরে আসে। সভাষদগণ সকলেই অনুভব করেছিলেন যে তিনি জেনে শুনেই ভীম সিংহকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। ভীম সিংহ নিজেও প্রতিপক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু পরাজয় স্বীকারের চেয়ে মৃত্যুবরণ তিনি শ্রেয়ঃ মনে করেন। ভীম সিংহের পিতার প্রতি প্রাচীন বিদ্বেষ সত্ত্বেও প্রতাপরায় সর্বান্তঃকরণে ভীম সিংহের জয় প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু ভীম সিংহের বাহু শিথিল হয়ে গিয়েছিল এবং রাজা ও সভাষদগণের মনে নৈরাশ্য ঘনিয়ে এসেছিল।

উদয় সিংহ বলেন- মহারাজ, ভীম সিংহ প্রাণ দিয়ে দিবে তবুও পেছনে হটবে না। আপনি তাঁর প্রাণ রক্ষা করতে পারেন।

বড় রাণী উদয় সিংহের পক্ষে সুপারিশ করেন। কিন্তু ছোট রাণী বলেন, মহারাজ, সৈন্য দ্বারা ভীম সিংহকে সাহায্য দেওয়া অন্যায় হবে। নিজ পুত্রের জন্য উদয় সিংহের নাড়ীতে টান পড়েছে। কিন্তু বিদেশী যুবকটি যখন কয়েকপদ পেছনে হয়েছিল তখন কারো মনে দয়া হয়নি। যদি আপনি বাঁচাতে চান তবে উভয়কে বাঁচান।

ইতস্তত: করে রাজা কোন মীমাংসা করেন না। হঠাৎ পর পর প্রবল আক্রমণ করে যুবায়র ভীম সিংহকে চারদিক থেকে ঠেলে তাঁর শূন্য আসনের সামনে নিয়ে আসেন। নগ্ন তরবারীধারী সৈন্যগণ, যারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল, এদিক ওদিক সরে যায়। হতভম্ব হয়ে ভীম সিংহ পেছনে গিয়ে কুরসীতে পড়ে যান। তিনি উঠতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অসির অগ্রভাগ তাঁর বক্ষে স্থাপন করে যুবায়র বললেন- আর কয়েক বছর বেঁচে থাকলে তুমি একজন ভাল যোদ্ধা হবে। কিন্তু আপাততঃ তোমার স্থান এ আসনে।

ভীম সিংহের হাত থেকে অসি খসে পড়ে। তিনি রোষে ও ক্ষোভে নিজের ঠোঁট কামড়াতে থাকেন।

রাজা সৈন্যদেরকে ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু তাদের অসি তুলবার আগেই যুবায়র আচম্বিতে ভীম সিংহের কুরসীর উপর দিয়ে লাফ দিয়ে প্রতাপ রায়ের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রতাপ রায়ের হতভম্ব ভাব দূর হবার আগেই যুবায়র তাঁর অসির অগ্রভাগ তাঁর পিঠে স্থাপন করে রাজাকে বললেন- আপনার সৈন্যদেরকে ওখানেই স্থির থাকতে আদেশ দিন, নতুবা আমার অসি এই দুষ্কর্মার বক্ষচ্ছেদ করে পার হয়ে যাবে।

রাজার ইঙ্গিতে সৈনিকরা পেছনে সরে গেল। যুবায়র তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন- নির্বোধের রাজা, তোমার কাছে আমি সদ্ব্যবহার প্রত্যাশা করি না। আমি শুধু জানিয়ে দিতে চাই যে উপদেষ্টাগণ তোমাকে আরবদের সাথে যুদ্ধ বাধাতে পরামর্শ দিয়েছে তারা তোমার বন্ধু নয়। তুমি যাদের উপর ভরসা করছ তাদের বুদ্ধি ও সাহস দেবলের

শাসনকর্তার মতই। এর দিকে চেয়ে দেখ, ইনিই সেই বীর যিনি কুসরীতে বসে বেতসপত্রের মত কাঁপছেন। এখন তোমার সামনে একে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করছি।- আচ্ছা প্রতাপ রায়, তুমি আমাকে যুদ্ধ করে বন্দী করেছিলে, না বন্ধুত্বের ছলে জাহাজ থেকে ডেকে এনেছিলে? উত্তর দাও, নীরব কেন? যদি মিথ্যা বল, মনে রেখো এসব সৈন্যরাও তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। এখন বল- একথা বলে তিনি তলোয়ারটি একটু নাড়ালেন। প্রতাপ রায় কম্পিত স্বরে বললেন- আমি তোমাকে জাহাজ থেকে ডেকে এনেছিলাম। কিন্তু মহারাজের আদেশ ছিল তোমাকে যে প্রকারেই হোক বন্দী করতে হবে।

রাজা বললেন- দাঁড়াও। প্রতাপ রায় আমারই আদেশ পালন করেছে। তুমি যদি এর প্রতি কোন দুর্ব্যবহার কর তবে বন্দীদের সাথে এরূপ ব্যবহার করা হবে যা তুমি কল্পনাতেও সত্য করতে পারবে না। আমি এখনো তোমাদের সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করি নি। আমরা অনর্থক আরবদের সাথে ঝগড়া করতে চাই না। তোমাদের জাতি বাস্তবিক বীর। কিন্তু তুমি যদি একটু বিবেচনার সাথে কাজ কর তবে সম্ভবতঃ আমি তোমাকেও তোমার সঙ্গীদেরকে মুক্তি দেব। তোমার মাথার উপর এখন অন্ততঃ বিশজন সিপাই দাঁড়িয়ে আছে। তুমি বেশী হলে একজনকে মারতে পারবে। কিন্তু সে একজনের পরিবর্তে আমরা সমস্ত বন্দীদিগকে ফাঁসি দেব। সঙ্গীদের কল্যাণ চাইলে তলোয়ার ফেলে দাও যুবায়ের বললেন- তোমাদের কারো উপর আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু আমি তোমাকে নিজের ভাল মন্দ ভেবে দেখবার শেষ সুযোগ দিচ্ছি। কিন্তু স্মরণ রেখো আমার সঙ্গীদের সাথে যদি দুর্ব্যবহার কর তবে অদূর ভবিষ্যতে তোমার প্রত্যেক সৈনিকের মাথার উপর আমার মত মরণ-পিয়াসীর উদ্যত অসি চমকাতে থাকবে। তোমার যদি মণি-মাণিক্য ও হস্তীর লোভ থাকে, আমি তা ফেরত চাই না। আমি শুধু প্রার্থনা করব আমাকে ও আমার সাথীদের মুক্তি দাও এবং খালিদ ও তার বোনকে আমাদের হাতে সমর্পণ কর।

রাজা জবাব দেন- যতক্ষণ তুমি তরবারী না ফেলবে ততক্ষণ আমি তোমার কোন প্রার্থনা বিবেচনা করতে প্রস্তুত নই।

রাজা সম্বন্ধে যুবায়েরের কোন ভুল ধারণা ছিল না। সঙ্গীদের নিরাপত্তার চিন্তা না থাকলে তিনি নিশ্চয় রাজার দয়ার উপর নির্ভর না করে বীরের মত মৃত্যুবরণ করতেন। কিন্তু বিধবা নারী ও এতিম শিশুদের মর্মান্তিক পরিণামের কথা চিন্তা করে তাঁকে শান্ত থাকতে হয়। নারীদের কথা তাঁর মনে পড়ে এবং তাঁর শরীর শিহরিত হয়ে উঠে। বিভিন্ন চিন্তার আবর্তে রাজার আশাপ্রদ বাক্য নিমজ্জমানের কাছে তৃণের মত প্রতীয়মান হয়। তিনি স্বীয় অসি সিংহাসনের সম্মুখে নিক্ষেপ করেন। রাজা আশ্বস্তির শ্বাস গ্রহণ করেন। প্রতাপ রায়ের অবস্থা ছিল ভয়ংকর। স্বপ্ন থেকে সদ্য জাগরিতের ন্যায়। বড় রাণী রাজার ডান কানে কিছু বললেন। নারী সুলভ তীক্ষ্ণ অনুভূতির ফলে ছোট রাণী সতীনের মনোভাব বুঝে নিয়ে রাজার বাম কর্ণ লক্ষ্য করে বলে উঠলেন- মহারাজ, এরকম জাতের সাথে শত্রুতা সৃষ্টি করা অসঙ্গত।

রাজা ইঙ্গিতে উজিরকে কাছে ডেকে নিয়ে নিম্নস্বরে জিজ্ঞেস করলেন,

-তোমার কি মত?

তিনি জবাব দিলেন- মহারাজের বিবেচনা আমার চেয়ে অনেক গুণে ভাল।

রাজা বলেন- আমি যদি ছেড়ে দেই তবে এসব পরিষদ ও আমার প্রজাগণ আমাকে কাপুরুষ ভাববে।

মহারাজ, চাঁদের দিকে থু থু ফেললে নিজের গায়েই পড়ে। প্রজাদের চোখে আপনি দেবতা। কিন্তু এখন এ বন্দীদের মুক্তি দেয়া অসঙ্গত হবে। সিন্ধুর উপর আক্রমণ করতে আরবদের কখনো সাহস হবে না। কিন্তু এসব লোকদের যদি এখন স্বদেশে পাঠিয়ে দেয়া হয় তবে সারা আরব দেশে এরা আমাদের বিরুদ্ধে আগুনের ঝড় তুলবে। আরবদের সাথে যুদ্ধ করে মকরাণ অঞ্চল দখল করার ইচ্ছা যদি আপনি পরিবর্তন করে থাকেন তবে এদেরকে মুক্তি দেয়ার চাইতে বরং মৃত্যুদন্ড দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাহলে আমরা দেবলে আরবদের জাহাজ যে লুন্ঠন করেছি তার কোন প্রমাণ আরবদের কাছে থাকবে না। ইতিপূর্বে আবুল হাসানের ব্যাপারে আমরা মকরাণের শাসনকর্তাকে এড়িয়েছি। এখনো যদি এদের খোঁজ নিতে কেউ আসে তাদের সান্ত্বনা দেওয়া যাবে।

রাজা বললেন- তোমাকে কে বলেছে আমি মকরাণ জয়ের ইচ্ছা পরিবর্তন করেছি?

উজীর জবাব দেন- মহারাজ, আপনার ইচ্ছার পরিবর্তন না হয়ে থাকলে এদের সম্বন্ধে চিন্তা করার কোন প্রয়োজন দেখছি না। চৌরাস্তার উপর এদের ফাঁসি দেওয়াই আমার মতে এদের লঘুতম শাস্তি। তাহলে আমাদের লোকেরাও বুঝতে পারবে যে আরবগণ সাধারণ মানব থেকে ভিন্ন নয়।

রাজা বললেন- আমারও তাই মত। কিন্তু জাহাজ থেকে এক আরব বালক ও বালিকা উধাও হয়ে গেছে। যদি তারা সিন্ধুর সীমান্ত পার হয়ে মকরাণে গিয়ে আরবদের এ খবর পৌঁছিয়ে থাকে, তবে খুব সম্ভব আমাদের সত্বরই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

উজির জবাব দেন- মহারাজ আরবদের বর্তমান অবস্থা আমাদের অজানা নেই। তাদের আত্মকলহ শেষ হয়েছে বেশী দিন হয়নি। এখন তাদের সমস্ত সৈন্য উত্তর ও পশ্চিম দেশে যুদ্ধ করছে। আমাদের কাছে এক লক্ষ সৈন্য আছে এবং দরকার মতো আরো সমসংখ্যক সৈন্য সমাবেশ করতে পারবো। তাছাড়া রাজপুতানার সমস্ত নরপতি আপনাকে কর দেয়। আপনার পতাকাতলে আরবদের সাথে যুদ্ধ করা তারা গৌরব মনে করবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যেসব আরব সিন্ধুর দেশে আসবে তাদের কেউ আর ফিরে যেতে পারবে না।

শাবাশ। তোমার কাছে আমি এটাই আশা করছিলাম। আজ থেকেই তুমি প্রস্তুতি করে দাও।

রাজার সাথে কানে কানে পরামর্শ করার পর মন্ত্রী নিজের আসনে গিয়ে বসলেন। রাজা সৈন্যদের লক্ষ্য করে বললেন- একে নিয়ে যাও। আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি এর সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত স্থির করবো।

॥ এক ॥

রাত্রে শোবার আগে বসু কয়েকবার জয়রামের ফিরে না আসার কারণ জিজ্ঞেস করে। কিন্তু প্রতিবারেই সে জবাব পায় যে শহরে তার অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে, কেউ হয়ত তাকে ধরে রেখেছে। বসুর প্রতি জয়রামের নির্দেশ ছিল তার প্রত্যাগমনের পূর্ব পর্যন্ত সে যেন নারায়ণ দাসের গৃহ হতে বের না হয়। পরদিনও সে বাধ্য হয়ে জয়রামের নির্দেশ মত কাজ করে। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে নারায়ণ দাস এসে খবর দেয় জয়রামকে এক আরবের সাথে পিঞ্জরাবদ্ধ করে শহরে ঘুরানো হচ্ছে। পরদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে উভয়কে শহরের চৌমাথায় ফাঁসি দেওয়া হবে। মনে হচ্ছে পূর্ণ দরবারে সে রাজার সাথে অশিষ্ট ব্যবহার করেছিল।

এ কথা শোনামাত্র বসু শহরের পথ ধরল। শহরের এক জমকালো চৌরাস্তায় বহু লোক এক বাঁশের খাঁচার চতুর্দিকে জমা হচ্ছিল। বসু সবল বাহু দ্বারা লোক ঠেলে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে জয়রাম-যুবায়রকে খাঁচার মধ্যে এক নজর দেখে ফিরে এল। তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় চড়ে সে বনের পথ ধরল।

মধ্যরাত্রি পর্যন্ত প্রহরীরা ছাড়া অন্য সকলে যার যার গৃহে ফিরে গেল। বনের মধ্যে খালিদ ও মায়ার সাথে সাক্ষাতের কথা জয়রাম-যুবায়রকে বলেছিলেন। কয়েকজন প্রহরী শুয়ে পড়েছিল। বাকী খাঁচার কাছে বসে গল্প করছিল। সুযোগ পেয়ে যুবায়র জিজ্ঞেস করেন- সেই রুমালটি কোথায়?

জয়রাম জবাব দিলেন- সেটা আমার কব্জিতে বাঁধা আছে। কিন্তু আমাদের উভয়ের হাত পেছনের দিকে বাঁধা। হায়, বসু যদি আমাদের খবর পেত। যুবায়র, যুবায়র একটা কথা জিজ্ঞেস করছি।

বল।

সূর্যোদয়ের পূর্বে আমাদের ফাঁসি দেওয়া হবে। এ সময় কোন কথা তোমার সবচেয়ে বেশী মনে পড়ছে?

মাত্র একটি কথা আমার মনে পড়ছে। সেটা এই যে এ পর্যন্ত আল্লাহ ও রসুলকে সন্তুষ্ট করার মত কোন পূর্ণ কাজ আমার দ্বারা হয়ে উঠেনি।

মরতে তোমার নিশ্চয় ভয় করছে।

মুসলমানের ঈমানের প্রথম শর্ত এই যে, সে মৃত্যুকে ভয় করবে না। ভয় করেই কি

লাভ? লোকে যাই করুক না কেন, মৃত্যু যখন আসবার আসবেই। আমার আয়ু যদি পূর্ণ হয়ে থাকে, অশ্রু বর্ষণ করে তাকে দীর্ঘ করতে পারব না। তবে আমার দুঃখ এরূপ মৃত্যু যোদ্ধার উপযোগী মৃত্যু নয়।

জয়রাম বললেন- আমার এখনো মনে হয় হয়ত এ শাস্তি থেকে আমরা নিষ্কৃতি পাবো। কখনো ভাবি হয়ত ভূমিকম্প হয়ে এ শহর এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। কখনো মনে হয় স্বর্গ থেকে কোন দেবতা এসে রাজাকে বলবে এ নিরপরাধ লোকগুলোকে মুক্তি দাও। নচেৎ তোমার ভালো হবে না। আমার আশা কখনো এরূপ কল্পনা করে যে সিন্ধু নদী হয়ত গতি পরিবর্তন করে দেবলের পথে ধাবিত হবে। লোকেরা হতভম্ব হয়ে পালাতে থাকবে এবং যেতে যেতে আমাদেরকে মুক্ত করে দেবে। এরূপ কোন ধারণা তোমার হয় না।

না, ওরূপ কোন কল্পনা আমার মনকে অস্থির করছে না। আমি শুধু এটুকু জানি আমাকে জীবিত রাখার ইচ্ছা যদি আল্লাহর থেকে থাকে তবে হাজার উপায়ে তিনি আমার প্রাণ রক্ষা করতে পারেন। কিন্তু আমার আয়ু পূর্ণ হয়ে থাকলে আমার কোন প্রচেষ্টাই আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

জয়রাম বললেন- হায় যুবায়র, আমি যদি তোমার মতো চিন্তা করতে পারতাম। কিন্তু আমি তরুণ এবং এখনো বেঁচে থাকতে চাই। তুমিও তরুণ। কিন্তু তোমার ভাবধারা কত পৃথক।

যুবায়র বললেন- তুমিও যদি আমার মতো ভাবতে চেষ্টা কর তবে মনে শান্তি পাবে।

জয়রাম বললেন- এ আমার সাধ্যের বাইরে।

যুবায়র বললেন, জয়রাম, আমার একটা কথা শুনবে?

কি কথা?

ভোর হবার আর বেশী দেরী নেই। তোমার ও আমার জীবনের হয়ত কয়েকটি শ্বাস মাত্র বাকী আছে। আমার মনের উপর একটি মাত্র বোঝা রয়েছে। তুমি চাইলে মৃত্যুর পূর্বে আমার বোঝাটি নামিয়ে দিতে পারি।

জয়রাম বললেন- এ খাঁচার মধ্যে থেকে তোমার জন্য যা কিছু করা সম্ভব তা করতে আমি প্রস্তুত।

জয়রাম, জীবনের কয়েকটি ধাপ আমরা এক সঙ্গে পার হয়েছি। মৃত্যুর পর আমাদের পথ ভিন্ন হোক তা আমি চাই না। আমার বাসনা তুমি মুসলমান হয়ে যাও। এখনো যদি তুমি কালেমা তওহীদ পড়ে নাও, তাহলে আমার বিগত ত্রুটির ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। ইসলামের যাবতীয় সৌন্দর্য সম্বন্ধে তোমার অবগত করাবার সময় এখন নেই। হায়, আমি জাহাজে থাকতেই যদি এ দায়িত্ব অনুভব করতাম। কিন্তু তুমি যদি আমার কথায় মনোযোগ দাও তবে তোমার ন্যায় পুণ্য-হৃদয় সৎ- প্রিয় লোককে সত পথ দেখাতে আমার বেশী সময় লাগবে না।

জয়রাম বললেন- তোমার কথা যদি আমাকে মৃত্যু ভয় থেকে মুক্তি দিতে পারে তবে আমি শুনতে প্রস্তুত।

যুবায়র বললেন- ইসলাম মানব মনে কেবলমাত্র আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে এবং তাকে অন্য সব ভীতি থেকে মুক্তি দেয়। শোন-

একথা বলে যুবায়র অতি সংক্ষেপে ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য বর্ণনা করেন। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনী আলোচনা করেন। পুণ্যাত্মা আসহাবের চরিত্র অংকনের মানসে ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসের প্রধান ঘটনাগুলো বর্ণনা করেন। পরিশেষে আজনাদাইন, য়ারমুক ও কাদিসিয়ার যুদ্ধের ঘটনাবলী আলোচনা করেন।

ইতিমধ্যেই জয়রাম অনুভব করছিলেন সারাজীবন এক অন্ধকার গুহায় পথ ভুলে ঘোরার পর তিনি এক লাফে পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত শিখরে আরোহণ করেছেন। তাঁর চোখে আশার জ্যোতিঃ চমকাচ্ছিল।

রাত্রির তৃতীয় যামে আজীবনের সংস্কার ত্যাগ করে জয়রাম ইসলাম গ্রহণ করেন।

যুবায়র জিজ্ঞেস করলেন- এবার বলো দেখি, তোমার মনের বোঝা হালকা হয়েছে কি না?

জয়রাম বলেন- আমার মনে কেবল একটি সংশয় রয়েছে। আমি মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে ইসলাম কবুল করলাম। হায়, আরো কিছুদিন বেঁচে থেকে যদি তোমার মত নামায পড়তে ও রোযা রাখতে পারতাম!

যুবায়র বলেন- আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে মুসলান কখনো নিরাশ হয় না। তিনি সব কিছুই করতে পারেন।

॥ দুই ॥

জনৈক লোককে খাঁচার কাছে আসতে দেখে প্রহরী বলে উঠল- কে?

লোকটি কোন উত্তর না দিয়ে খাঁচার কাছে আসল। আরো কয়েকজন সিপাই উঠে দাঁড়াল। প্রথমোক্ত প্রহরী আবার বলে উঠল- জবাব দিচ্ছ না কেন? তুমি কে?

ইতিমধ্যে কয়েকজন প্রহরী তাকে চিনে ফেলেছিল। সঙ্গীর বাহু নাড়িয়ে দিয়ে একজন বলে উঠল- চাষার মত চেচাচ্ছ, চিনতে পারছ না? ইনি সর্দার ভীম সিংহ।

মহারাজ, আপনি এ সময় এখানে?

আমি বন্দীদের দেখতে এসেছিলাম।

দ্বিতীয় প্রহরী বললো- মহারাজ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এ কয়জন লোক এইমাত্র ঘুমিয়েছে।

ভীম সিংহ জিজ্ঞেস করলেন- তোমার নাম কি?

সে জবাব দিলো- মহারাজ, আমার নাম স্বরূপ সিংহ।

তুমি বেশ সতর্ক লোক মনে হচ্ছে। তোমার পদোন্নতির জন্য আমি ব্রাহ্মণাবাদের হাকিমকে বলে দেব।

ভগবান সরকারের মঙ্গর করুন। আমার চারটি সন্তান আছে। মহারাজের অঙ্গুলি হেলনেই আমার কাজ হয়ে যাবে।

তুমি চিন্তা কর না। আচ্ছা, বন্দীরা ঘুমুচ্ছে?

মহারাজ, তারা একটু আগেও কথা বলছিল। বলে- অগ্রসর হয়ে খাঁচার দিকে উঁকি মেরে দেখলো- মহারাজ, তারা জেগে আছে।

আমি জয়রামের সাথে একটু কথা বলতে চাই।

মহারাজ, আপনার আবার জিজ্ঞেস করার কি দরকার?- বলেই সিপাই সঙ্গীদেরকে ইঙ্গিত করল এবং তারা খাঁচার কাছ থেকে সরে দাঁড়াল।

ভীম সিংহ খাঁচার দিকে চেয়ে উচ্চস্বরে বললেন- 'জয়রাম, তুমি অতি নির্বোধ'। তারপর খাঁচার মধ্যে নিজের হাত ঢুকিয়ে যুবায়রের বাহু খুঁজতে খুঁজতে নিম্নস্বরে বললেন- তোমার হাত আমার দিকে বাড়াও।

যুবায়র পিঠ ফিরে নিজের আবদ্ধ হাত তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন। ভীম সিংহ আবার উচ্চস্বরে বললেন- 'অকৃতজ্ঞ, রাজার সামনে এ ম্লেচ্ছের বন্ধুত্বের বড়াই করতে তোমার লজ্জা হল না?' আবার নিম্নস্বরে বললেন- জয়রাম আমি তোমার সাথীর বন্ধন রজ্জু কেটে দিচ্ছি। কিছু বলো, নইলে প্রহরীরা সন্দেহ করবে।

জয়রাম চীৎকার দিয়ে বললেন- ভীম সিংহ, তোমার লজ্জা নেই। অসহায়কে ভর্ৎসনা করা রাজপুতের পক্ষে শোভনীয় নয়।

তোমার মত কাপুরুষকে গালি দেওয়াও আমি সম্মানহানিকর মনে করি। আমি শুধু জিজ্ঞেস করতে এসেছি যে, সেই বালক ও বালিকাকে তুমি কোথায় লুকিয়ে রেখেছ।

আমি তাদের কথা কিছু জানি না। যাও, আমায় বিরক্ত কর না। যুবায়রের হাত মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। ভীম সিংহ তাঁর হাতে ছোরা দিয়ে বললেন- দুঃখের বিষয় এর বেশী আর কিছু করতে পারছি না। এ খাঁচা ভেঙ্গে বের হওয়া তোমাদের পক্ষে হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু তবু ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখ। যদি মুক্ত হতে নাও পার, অন্ততঃ বীরের ন্যায় মরতে পারবে।

প্রহরীদের ভুলাবার জন্য ভীম সিংহ কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে আবার বললেন- আমার দৃঢ় বিশ্বাস আরব বালিকাকে তুমি কোথাও লুকিয়ে রেখেছ। যদি না বলতে চাও, সে তোমার ইচ্ছা। কিন্তু মনে রেখো সূর্যোদয়ের পূর্বেই ব্রাহ্মণাবাদবাসীগণ তোমাকে ফাঁসির মঞ্চে দেখতে পাবে।

ভীম সিংহ খাঁচার কাছ থেকে কয়েক পদ দূরে সরে গিয়ে প্রহরীদের বললেন- তোমরা সরে দাঁড়িয়েছ কেন? এদের সাথে আমার কোন গোপনীয় কথা ছিল না। এই

জয়রামকে দেখছ, তাঁর অহংকার এখনো ভাঙ্গেনি। সিপাই উত্তর দিল- মহারাজ, এর ভাগ্য মন্দ। নচেৎ আমি শুনেছি রাজা একে বেশ আদর করতেন। শহরের লোক বলছে এ আরব যাদু জানে। সে জয়রামকে যাদু করে রাজার অবাধ্য করে ফেলেছে।

ভীম সিংহ বললেন- হয়ত তাই। আমারও এর খাঁচার কাছে যাওয়া উচিত ছিল না।

না মহারাজ। আপনার উপর এর যাদুকরী হবে না। তবুও বাড়ী গিয়ে আপনি পূজো দিবেন।

তুমি খুব বুদ্ধিমান। আমি জানি। আমার মাথা ঘুরছে। হয়ত এটা যাদুমন্ত্রেরই প্রভাব।

মহারাজ, যদি অনুমতি হয় আমাদের একজন আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে বাড়ী রেখে আসুক।

না, না। তার প্রয়োজন নেই।

ভীম সিংহ চলতে আরম্ভ করলে সিপাই ডেকে বলল- মহারাজ, আমার কথা যেন মনে থাকে।

তুমি চিন্তা কর না।

ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

ভীম সিংহ চলে যাবার পর এক প্রহরী সঙ্গীদের বলল- আমি বলেছিলাম না এ যাদুকর। তোমরা তো মানলেই না। স্বরূপ সিংহ তোমার কল্যাণ নেই। তুমি কয়েকবার খাঁচাটি স্পর্শ করেছ। এখনো তোমার মাথা ঘুরেনি?

আমার মাথা- হাঁ, একটু ভারী ভারী মনে হচ্ছে তো।

তাহলে আর দেরী নেই। এখনি ঘুরতে থাকবে।

স্বরূপ সিংহ চিন্তিত হয়ে বলল- কিন্তু আমি শুনেছি, যাদুকরের মৃত্যুর পর তার মন্ত্র নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

এরূপ যাদুকর মরেও বেঁচে উঠে।

আর এক প্রহরী বলল- আরে ভাই, আমিও খাঁচাটি ছুঁয়েছিলাম। আমারও মাথা ঘুরছে।

স্বরূপ সিংহ বলল- ভগবান এরূপ যাদুকরকে ধ্বংস করুন। এখন সত্য সত্যই আমার মাথা ঘুরছে।

এ কথা-বার্তার ফলে সিপাইরা আট দশ পদ দূরে সরে গিয়ে প্রহরা দিতে লাগল। যুবায়র খাঁচার মধ্যে নিজের পায়ের বন্ধন কাটবার পর জয়রামের হাত-পাও মুক্ত করে ফেলেছিলেন। তখন উভয়ে খাঁচার সাথে শক্তি পরীক্ষা করছিলেন।

এক সিপাই চীৎকার দিয়ে বলে উঠল- আরে, ওরা খাঁচার মধ্যে কি করছে!

যুবায়র ও জয়রাম মাটিতে বসে পড়লেন এবং চোখ বন্ধ করে নাক ডাকতে

লাগলেন। দুইজন প্রহরী খাঁচার চারদিকে ঘুরে নিশ্চিন্ত হয়ে সঙ্গীদের কাছে গিয়ে সে কথা বলল।

জয়রাম চুপি চুপি বললেন- যুবায়ের।

তিনি জবাব দিলেন- কি?

এ শিকলগুলো বড় শক্ত। বিধাতা আমাদের সাথে পরিহাস করেছে। তুমি কি এখনো মুক্তির আশা রাখো?

আমার মন বলছে আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন।

জয়রাম বললেন- ব্রাহ্মণাবাদে শত শত সৈন্যের উপর ভীম সিংহের প্রভাব রয়েছে। হয়ত শেষ পর্যন্ত সেই আমাদের সাহায্য করবে।

আমি কেবল আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করছি। তোমারও তাঁরই স্মরণ নেওয়া উচিত। আমাদের জীবিত রাখা যদি তাঁর অভিপ্রেত হয় তবে ভীম সিংহের সাহায্য ছাড়াই আমরা মুক্ত হব।

আমি তোমার ঈমানের উদার্যের প্রশংসা করছি। কিন্তু দোষ নিও না- যদি বলি এ শিকলগুলো আপনা-আপনি ভেঙ্গে যাবে না।

যুবায়ের বললেন- যেখানে বুদ্ধির আলোকে হার মানে সেখানে ঈমানের জ্যোতিঃ কার্যকরী হয়। তুমি যে আল্লাহর উপর নির্ভর করছ, তিনি হযরত ইব্রাহীমের জন্য অগ্নিকুন্ডের পুষ্পকুঞ্জে পরিণত করেছিলেন।

জয়রাম কিছু বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় বাইরে এক চীৎকার হলো- কে?

কয়েকপদ দূর থেকে একটি লোক জবাব দিল- জ্বী, আমি একজন মৎস্য শিকারী।

এখানে কি করছ?

জ্বী, মাছ এনেছি।

এ সময় মাছ!

জ্বী, এখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। এগুলো বিক্রি করে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে চাই। আপনার মাছ চাই?

এক সিপাই বলল- স্বরূপ সিংহ তুমি নিয়ে যাও। তোমার চারটি বাচ্চা আছে।

মৎস্যজীবী বলল- হ্যাঁ হুজুর নিয়ে নিন। খুব তাজা আছে।

স্বরূপ সিংহ বলল- আমি কি গাঁটে পয়সা বেঁধে এখানে বসেছি? বিনি পয়সায় দেবে তো দিয়ে যাও।

জ্বী, শহরের সাধারণ লোকও বিনি পয়সায় আমার মাছ কেড়ে নিয়ে যায়। আর আপনি তো সিপাহী। আপনার কাছে কি আর পয়সা চাইতে পারি?

একথা বলে মৎস্যজীবী মাছের ঝুড়িটি সিপাইদের সামনে রেখে দিল।

এক সিপাই বলে উঠল- আরে, তোমার কাছে তো মেলা মাছ রয়েছে। আমাদেরও দেবে তো?

স্বরূপ সিংহ বলে- না, না। বেচারীর উপর জুলুম করো না। আমি তো এর রোজকার গ্রাহক। আমি ধারে কিছু নিচ্ছি। কাল পয়সা দিয়ে দেব।

একথা বলে স্বরূপ একটা মাছ তুলে নিল। দুষ্ট হাসি হেসে সে সঙ্গীদের দিকে তাকাল। তারা হাসতে হাসতে মুহূর্তের মধ্যে ঝুড়ি খালি করে ফেলল।

স্বরূপ বলল- নাও ভাই। তোমার বোঝা হালকা হয়ে গেল। কাল এখানেই এ সময়ে পয়সা নিতে এস।

যে আজ্ঞে।

খাঁচার মধ্যে যুবায়র জয়রামকে বললেন- এ গংগু। কিন্তু সে একা এলো কেন?

গংগু প্রহরীদের বললো- আমি একতারা বাজাতে পারি। আপনাদের শোনাব?

প্রহরীগণ একযোগে বলে- হাঁ, হাঁ। শোনাও।

গংগু একতারায় কয়েকটি মধুর সুর বাজাল। তার সঙ্গীরা সাধারণ নাগরিকের বেশে বিভিন্ন গলি দিয়ে এসে প্রহরীদের চারদিকে জড়ো হতে লাগল। এক সিপাই তার সঙ্গীকে বলল- আরে, এতো অনর্থক মেছোর ছোট পেশা নিয়েছ। একতারা বাজিয়ে তো এ অনেক পয়সা কামাতে পারে।

গংগুর একসাথী আর একজনকে বলে- এর সুর আমার গাঢ় নিদ্রা ভেঙ্গে দিয়েছে। আর ঘুমুতে ইচ্ছা করে না। ... বাসন্তীর মা আমাকে বলছিল- যাও, দেখ, হয়ত কোন সিদ্ধ পুরুষ, কামিল ফকির। আমাদের পাড়ার সকলেই আশ্চর্য হয়ে ভাবছে- ইনি কে?

গংগু একতারা বাজাতে বাজাতে উঠে দাঁড়াল। তার সঙ্গীরা আচমকা তলোয়ার বের করে প্রহরীদের আক্রমণ করল। মুহূর্তের মধ্যে তাদের সবাইকে সাবাড় করে দিল। বসু কুড়ালের কয়েক ঘাতে খাঁচার দরজা ভেঙ্গে ফেলল। জয়রাম ও যুবায়র লাফ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

চকের আশ-পাশের লোকেরা একতারার মধুর তান এবং পরে হানাদার ও সিপাইদের অপ্রত্যাশিত চীৎকার শুনেছিল। কিন্তু ঘরের দরজা খুলে বাইরে তাকানো অনধিকার চর্চা মনে করল। যুবায়র ও জয়রাম গংগু ও তার সাথীদের সঙ্গে দৌড়ে নগরের বাইরে চলে এলেন। গংগুর কয়েকজন সাথী এক বাগানে ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছিল।

নগরে এ হাঙ্গামার প্রতিক্রিয়া শুরু হচ্ছিল, ততক্ষণ এরা ঘোড়ায় চড়ে বানের পথ ধরেছিল।

॥ তিন ॥

নাহীদ বিছানায় শুয়েছিল। মায়া পাশে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

খালিদ অস্থিরভাবে পায়চারী করতে করতে বিছানার পাশে এসে বলল- নাহীদ, অনেক দেরী হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই তাদের পৌছে যাওয়া উচিত ছিল। হায়, আমি যদি এখানে থাকতে বাধ্য না থাকতাম। মায়া খালিদের দিকে তাকাল। দৃষ্টি নত করে সান্ত্বনার স্বরে বলল- আমার এখনো বিশ্বাস হয় না রাজা দাহির এত বড় অত্যাচারী হতে পারেন। হয়ত বসু .....,

খালিদ বাধা দিয়ে বলল- তোমার শুভেচ্ছা নেকড়ে বাঘকে মানুষে পরিণত করতে পারবে না।

মায়া অস্থিরভাবে বলে- আপনি নিশ্চিন্ত হোন। তাঁরা ফিরে আসবেন।

যুবায়র ফাঁসিতে ঝুলবে আর আমি নিশ্চিন্ত থাকব? হায়, আমি যদি গংগুর সাথে যেতাম। এ কথা বলে খালিদ মুষ্টিবদ্ধ এবং ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে বাইরে চলে গেল। মায়া সজল, চোখে নাহীদের দিকে তাকাল। নাহীদ মায়ার মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনা দিয়ে বলল- মায়া, সে তো তোমাকে কিছু বলে। তুমি সামান্য কথাতেই কেঁদে ফেল।

মায়া জবাব দেয়- আজ ওঁর ভ্রূকুঞ্চন দেখে আমার ভয় করছে। ওরা বিফল হয়ে ফিরলে কি হবে?

নাহীদ বলে- তারা এত বিপদসংকুল অভিযানে গেছে। তাদের সাফল্য বা অসাফল্যের উপর আমাদের কোন হাত নেই।

গংগু ও তার সঙ্গীরা যুদ্ধে নিহত বলে আপনি তো দেশে চলে যাবেন, আর আমি ....

নাহীদ জবাব দেয়- প্রিয় বোন আমার, আরব দেশে নিশ্চয় তোমার স্থান সংকুলান হবে।

কিন্তু খালিদ আজ কথায় কথায় আমার উপর রাগ করছেন। হয়ত তিনি আমাকে এখানেই ফেলে যাবেন।

মায়া, আমার সামনে খালিদ এমন কোন কথা বলেনি তো। তবে তোমার ভাই ও যুবায়র সম্বন্ধে এ ভয়ঙ্কর খবর শুনে তার মন স্থির আছে। আল্লাহ করুন, তারা বেঁচে ফিরে আসুন। তাহলে তুমি সারা জীবন খালিদের চেহারায় হাসিই দেখতে পাবে।

খালিদের হাসিমুখের উল্লেখ কিছুক্ষণের জন্য মায়াকে মনোরম কল্পনার জগতে নিয়ে গেল। এ বিধ্বস্ত জগত তার কাছে পুষ্পিত কুঞ্জের ন্যায় সুরভিত ও মনোহর প্রতীয়মান হল। সে যেন ফুলের সাথে কেলি করছে। সুবাসিত মৃদুমন্দ বায়ুর হিল্লোলে সে মোহিত। পাখীর কুজন তার শ্রবণে মধু বর্ষণ করছে। সে একজন নারী। তাই প্রেম তাকে স্রোতে ভাসমান তৃণের আশ্রয় নিতে এবং দুরাশা তাকে সমুদ্রতটে বালুকার অট্টালিকা নির্মাণ করতে প্ররোচনা দিচ্ছিল। কিন্তু তীব্র সাইমুমের মত এক কল্পনা তার সমস্ত

আকাশ-কুসুমকে ধূলায় লুটিয়ে দিল। আরবের মরুদ্যান ও খেজুর কুঞ্জে ঘোরার পরে তার কল্পনা হঠাৎ ব্রাহ্মণাবাদের চৌরাস্তায় তার ভাইকে ফাঁসিতে ঝুলতে দেখতে পেল। সে ছিল এক বোন- যে বোন নিজের ঘরে সুখের হাসি শুনেও ভাইয়ের একটুখানি উহু শব্দ শুনেই চমকে উঠে। মায়া নিজের মনে বলে উঠে- ভাই, আমার ভাই, আল্লাহ তোমাকে ফিরিয়ে আনুন। তুমি ছাড়া কারো হাসি আমাকে সুখী করতে পারবে না।

নাহীদ আড় চোখে তার দিকে চেয়ে বলে- মায়া সত্যি খালিদকে তুমি এত ভালবাস?

মায়া চমকে তার দিকে তাকায় এবং আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদে। নাহীদ আবার বলে- মায়া, মনে হচ্ছে আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আমি খালিদকে চিনি। সে ....

মায়া বাধা দিয়ে বলে- না, না। আমি আমার ভাইয়ের কথা ভাবছি। কিল্লার এক প্রহরী দৌড়ে এল। নাহীদ ঘোমটায় মুখ ঢেকে উঠে বসল।

প্রহরী বলল- খালিদ ঘোড়ায় গদি লাগাচ্ছেন। আমার কথা শুনছেন না। ব্রাহ্মণাবাদের পথও তাঁর জানা নেই। কোন দুর্ঘটনা হলে গংগু আমাকে জ্যান্ত রাখবে না। আপনি তাঁকে নিষেধ করুন।

এক মুহূর্তের জন্য মায়ার হৃদয় স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর তীব্র বেগে দুরু দুরু কাঁপতে লাগল। সে উঠে কিছু মাত্র চিন্তা না করেই দৌড়ে কিল্লার বাইরে চলে গেল। সে মনে মনে বলছিল- খালিদ যেয়ো না, যেয়ো না। আমি ভাইয়ের শোক সহ্য করতে পারব কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। খালিদ, আমাকে দয়া কর।

খালিদ, খালিদ।

কিল্লার বাইরে খালিদ ঘোড়া লাগাম ধরে এক পা রিকাবে লাগিয়েছিল। মায়া দৌড়াতে দৌড়াতে চীৎকার দিল- থাম, আল্লাহর দোহাই থামো। একা যেয়ো না। আমিও তোমার সাথে যাবো। একথা বলে সে ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেলল।

খালিদ রিকাব থেকে পা খুলে পেরেশান হয়ে মায়ার দিকে তাকাল। ততক্ষণে নাহীদ বাইরে চলে এসেছিল। মায়া নাহীদকে লক্ষ্য করে বলল- বোন, এঁকে থামাও। ইনি মৃত্যুর মুখে যাচ্ছেন। ভগবানের দোহাই, আল্লাহর দোহাই, এঁকে নিরস্ত্র কর।

নাহীদ তাঁর কাছে গিলে বলল- খালিদ, তোমার যাওয়ায় যদি কিছু লাভ হত তাহলে আমাদের অসহায়তা সত্ত্বেও তোমার পথ রোধ করতাম না। তুমি একা শহরে গিয়ে রাজার সমুদয় সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়তে পারবে না। তোমার গংগুর অপেক্ষা করা উচিত। সে নিশ্চয় আসবে। সে না এলে তার কোন না কোন সাথী নিশ্চয় আসবে। তুমি অবশ্য বীর কিন্তু এমন অবস্থায় ধৈর্যধারণ করাও বীরত্ব।

খালিদ জবাব দিল- বোন, তোমার জ্বর। তুমি গিয়ে বিশ্রাম কর। আমি শুধু এদের পথ দেখতে যাচ্ছি। আমি প্রতিজ্ঞা করছি দূরে যাব না।

মায়া বলে- না, না। বোন এঁকে যেতে দিও না। ইতি ফিরে আসবেন না.....।

খালিদ বলে- মায়া, হয়ত রাজার সৈন্য ওদের অনুসরণ করছে। তাদের সাহায্য করা আমার কর্তব্য। তোমার ভাইয়ের কথা মনে করে দেখ।

মায়া জবাব দেয়- আমার ভাই বিপদে পড়ে থাকলে আপনি তার সাহায্য করতে পারবেন না।

খালিদ কিছু বলতে যাচ্ছিল। গাছের উপর থেকে যারা পাহারা দিচ্ছিল তাদের একজন চীৎকার দিয়ে উঠল- ওরা আসছেন। সঙ্গে সঙ্গেই বনের মধ্যে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা গেল। আর একজন প্রহরী দৌড়ে এসে বলল- হয়ত শত্রু তাদের পশ্চাদ্ধাবন করছে। তোমরা কিল্লার গুপ্ত কোঠায় আশ্রয় নাও।

খালিদ কিছু বলতে যাচ্ছিল। গাছের উপর থেকে যারা পাহারা দিচ্ছিল তাদের একজন চীৎকার দিয়ে উঠল- ওরা আসছেন। সঙ্গে সঙ্গেই বনের মধ্যে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা গেল। আর একজন প্রহরী দৌড়ে এসে বলল- হয়ত শত্রু তাদের পশ্চাদ্ধাবন করছে। তোমরা কিল্লার গুপ্ত কোঠায় আশ্রয় নাও।

খালিদ শান্ত স্বরে জবাব দিল- লুকোবার প্রয়োজন নেই। শত্রু অনুসরণ করলে তারা এদিকে আসত না। কিন্তু মাত্র অল্প কয়েকটি ঘোড়া মনে হচ্ছে। আল্লাহ মঙ্গল করুন।

ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ আরো নিকটে এলো। খালিদ আবার চমকে বলল- মনে হচ্ছে কেবল চারটি ঘোড়া ফেরত এসেছে।

ঘোড়ার আগমন সংবাদ শুনে নাহীদের বুক ভীষণভাবে দুরু দুরু করতে লাগল। খালিদ যখন বলল কেবল চারটি ঘোড়া ফিরে এসেছে, তখন তার আশার প্রদীপ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে দপ করে নিভে গেল। দুঃখ ও বিষাদের অসীম সাগরে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের যে নাবিক উত্থিত তরঙ্গকে তীর ভেবে প্রবঞ্চিত হয়েছে, নাহীদের অবস্থা তার চেয়ে পৃথক ছিল না। সে অনুভব করছিল শেষবারের মত ভাগ্য তার হাত থেকে আশার আলো কেড়ে নিচ্ছে। একটু পরে ঝোপের পেছনে একটি ঘোড়া দেখা গেল। নিকটে এসেই আরোহী লাগাম টেনে ধরল এবং লাফ দিয়ে নেমে মায়ার দিকে অগ্রসর হল। মায়া ভাই, আমার ভাই, বলে দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। নাহীদ ও খালিদের দৃষ্টি ছিল ঝোপের দিকে। জয়রামকে দেখে নাহীদ যুবায়র সম্বন্ধে আরেকবার স্তিমিত আশার প্রদীপ জ্বেলে রেখেছিল। জয়রামের পর বসু এবং তার পেছনে গংগু ও যুবায়র ঝোপের আড়াল থেকে দৃষ্টিগোচর হল। যুবায়রকে দেখে নাহীদ স্থির হয়ে কয়েক পদ অগ্রসর হল। যুবায়র তার নিকটে এসে ঘোড়া থেকে অবতরণ করলেন। খালিদ দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। নাহীদের ইচ্ছা করছিল দৌড়ে নিজের ঘরে চলে যায়। কিন্তু সে অনুভব করছিল তা পা মাটির সঙ্গে আটকে গেছে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কাঁপুনি ধরেছিল। তার মাথা ঘুরছিল। পরিশ্রান্ত পথিক বহুদিন পরে হঠাৎ অভীষ্ট স্থান নিকটে দেখে যেরূপ ধৈর্যহারা হয়, তার অবস্থাও সেরূপ হল।

যুবায়র খালিদের আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে নাহীদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন- নাহীদ এখন তুমি ভালো আছো তো?

উত্তর দেয়ার পরিবর্তে সে তার ঘোমটা টেনে দিচ্ছিল।

যুবায়র আবার বলেন- নাহীদ, তোমার শরীর ভাল নেই। জ্বর রয়েছে। ঘা-টা এখন কেমন আছে?

নাহীদের ওষ্ঠ কেঁপে উঠল। কম্পিত স্বরে সে বলল- আল্লাহর শোকর আপনি ফিরে এসেছেন। আমি ভাল আছি। তার শেষ শব্দগুলো দীর্ঘশ্বাসে ডুবে গেল। হঠাৎ শিউরে সে মুর্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

॥ চার ॥

নাহীদের যখন চেতনা ফিরে এল তখন সে নিজের ঘরে বিছানায় শায়িত ছিল। খালিদ ও মায়ার বিষণ্ন চেহারা দেখাবার পর তার দৃষ্টি যুবায়রের উপর নিবব্ধ হলো। ম্লান মুখে হঠাৎ লজ্জার লালিমা দেখা দিলো। মুখের উপর ঘোমটা টেনে দিয়ে সে উঠে বসল। গংগু, জয়রাম বাইরে দাঁড়িয়েছিল। খালিদ তাদের লক্ষ্য করে বলল- নাহীদের সংজ্ঞা ফিরে এসেছে। আপনারা চিন্তা করবেন না।

যুবায়র সান্ত্বনা দিয়ে বললেন- নাহীদ, আমাদের বিপদ এবার কেটে যাবে। আমি আজই যাচ্ছি।

নারী সুলভ সূক্ষ্ম অনুভূতির দ্বারা মায়া যুবায়রের প্রতি নাহীদের মনোভাব বুঝে নিয়েছিল। সে তাড়াতাড়ি বলল- না, আজ আপনি যেতে পারবেন না। যতদিন বোন নাহীদ সুস্থ হয়ে না উঠে ততদিন আপনি এখানেই থাকুন। এখন সারা সিন্ধু দেশে হয়ত আপনার সন্ধান হচ্ছে।

যুবায়র জবাব দিলেন- সিন্ধুর সীমা অতিক্রম করার এখনই আমার একমাত্র সুযোগ। প্রত্যেক চৌকিতে কাল পর্যন্ত আমার ফেরার হবার খবর পৌছে যাবে। আমাদের বাকী সাথীরা রাজার সৈন্যদেরকে বিপদগামী করার জন্য পূর্বদিকের মরুভূমির পথ ধরছে। আমি এ সুযোগ গ্রহণ করতে চাই। খালিদ, তুমি এখানেই থাকবে। এখানে যদি কোন বিপদের আশংকা হয় তবে গংগু তোমাদের কোন নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবে। আরব দেশ থেকে আমাদের সৈন্য আসা পর্যন্ত যদি নাহীদ ঘোড়ায় চড়তে সমর্থ হয় তবে গংগু তোমাদের মকরাণে পৌছিয়ে দেবে।

নাহীদ বলে- আমার অন্যান্য বোনেরা যতদিন বন্দী থাকেন ততদিন আমি এখানে থাকাই পছন্দ করব। আল্লাহ আপনাকে শীঘ্র ফিরিয়ে আনুন। আমরা আপনার পথ চেয়ে থাকব। আমার চিঠি আপনি পেয়ে গেছেন বোধ হয়। আপনি এখুনি যাত্রা করুন। ফিরে আসতে দেরী করবেন না। হাঁ, আমি আলীর অবস্থা জিজ্ঞেস করতে চাই।

আলী তোমাকে খুব মনে করে। দেবলের শাসনকর্তা তাকে খুব যন্ত্রণা দিয়েছে।

কিন্তু সে বীর বালক। যে অবস্থাতেই থাকুক সে নামাযের সময় আযান দেবেই। এরা আযানকে ভীষণ ভয় করে। তাকে বহুবার চাবুক মারা হয়েছে। কিন্তু তার ধৈর্য হার মানেনি। ব্রাহ্মণাবাদের বন্দীশালায়ও তার একই অবস্থা ছিল। রাজার প্রহরীরা তাকে জিহ্বা কেটে দেয়ার ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু সে অটল।

নাহীদ বলে- এটা আপনার সহচর্যের ফল। নইলে তার মনে পূর্বে এত শক্তি ছিল না। লঙ্কায় তাকে একজন দুর্বলমনা বালক মনে করা হত।

যুবায়র জবাব দেন- কেবল বিপদের সময়ই লোকের প্রকৃত দোষগুণ পরিস্ফুট হয়। দরজায় গংগু বলে উঠল- দুপুর হয়ে আসছে। আর দেরী করা আপনার উচিত নয়।

নাহীদ বলে- আপনি আসুন। আল্লাহ আপনার সহায় হোন। কিন্তু মকরাণের স্থলপথ আপনার জানা আছে তো?

যুবায়র বললেন- বসু আমার সাথে যাচ্ছে। সমস্ত পথ তার জানা আছে। মকরাণ সীমান্তে পৌঁছেই আমি তাকে ফেরত পাঠাব।

মায়া বলে- কিন্তু এ পোষাকে আপনি এখুনি ধরা পড়বেন।

মৃদ্যু হেসে যুবায়র বলেন, আমার ছোট বোনটি দেখছি সব দিকে নজর আছে। কিন্তু তাঁর ব্যাকুল হওয়ার কারণ নেই। আমি এক সিন্ধীর বেশে যাচ্ছি। এখন তো আমি সিন্ধী ভাষাও শিখে ফেলেছি। কেউ আমাকে সন্দেহ করবে না।

মায়া বলে- আমাকে বোন বলে আপনি অনেক দায়িত্ব মাথায় নিলেন। মনে রাখবেন আমাদের দেশে ধর্ম ভাই বোনের সম্পর্ক সহোদর ভাই-বোনের সম্পর্কের চেয়ে কম ঘনিষ্ঠ নয়। আপনি যদি আমাকে বোন মানেন তাহলে সপ্তাহের পথ দিনে দিনে অতিক্রম করুন। আমাদের বিপদ আপনার সঙ্গীদের বিপদের চেয়ে কম নয়। আমার ভাইয়ের সন্ধানে তারা সিন্ধুর প্রত্যেক অলি-গলি, নদী-নালা, মরু বন চষে বেড়াবে। আমার ভয় হয় আপনাদের সৈন্যের আগমন প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হয়ে আমার ভাই আবার কাঠিয়াওয়াড়ের দিকে ফেরার হতে প্রলুব্ধ না হয়।

জয়রাম বাইরে থেকে উচ্চস্বরে বলে উঠলেন- মায়া, তুমি কি বলছ? আমি রাজপুত। না, বরং আমি মুসলমান। আমার রক্ষকদের ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারি?

মুসলমান? আমার ভাই মুসলমান? একথা বলতে বলতে মায়া নাহীদের চৌকি থেকে উঠে দৌড়ে বাইরে গিয়ে জয়রামকে জড়িয়ে ধরল। তার বুক দুরু দুরু করছিল। তার চোখে আনন্দাশ্রু বইছিল। সে বলছিল- ভাই তুমি সত্যি মুসলমান হয়েছ?

তিনি জবাব দিলেন- পরশ পাথরের স্পর্শ পেয়ে লৌহ আর লৌহ থাকে না। তুমি বিরক্ত হবে না তো?

আমি? আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে অশ্রু মুছতে মুছতে সে বললেন- আমি কেন বিরক্ত হব? আল্লাহ আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। আমার মানত গ্রহণ করেছেন। ভাই, তোমাকে

অভিনন্দন। কিন্তু তোমার ইসলামী নাম?

যুবায়র বাইরে এসে বলেন- ওটা আমার ত্রুটি। তোমার পছন্দ হলে তোমার ভাইয়ের নাম রাখছি- নাসিরুদ্দীন।

আর আমার নাম?

খালিদ, যুবায়র, গংগু ও জয়রাম সবাই হতভম্ব হয়ে মায়ার দিকে তাকাল। স্বীয় প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে মায়া আবার বললেন- তোমার হয়রান হলে কেন? নাহীদকে জিজ্ঞেস কর। একথা বলে সে দেউড়িতে দাঁড়িয়ে নাহীদকে লক্ষ্য করে বলল- বোন নাহীদ, এদেরকে বল, আমি তোমার কাছে কালিমা পড়িনি কি? আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার সাথে নামায পড়িনি কি? আমি কুরআনের আয়াত মুখস্থ করিনি কি?

মায়া আবার ভাইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে যুবায়রকে বলল- আপনি কিসের ভাবনায় পড়েছেন? নাহীদ আমার নাম যুহ্‌রা রেখেছে। এ নাম আমার পছন্দ।

খালিদ ভেতরে গিয়ে নাহীদের কানে কানে বলে- তুমি একথা আমাকে লুকিয়েছ কেন?

মৃদু হেসে নাহীদ জবাব দেয়- মায়ার ভয় ছিল আপনি মনে করবেন আপনাকে খুশী করার জন্যই সে মুসলমান হয়েছে। তার ভাইয়েরও ভয়ও ছিল। তাই সে আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল আপাততঃ তার রহস্য প্রকাশ করব না।

খালিদ আবার দৌড়ে গিয়ে জয়রামের কাছে দাঁড়ায়। তার মন আনন্দে স্বর্গে বিচরণ করছিল।

যুবায়র বললেন- ভাই নাসিরুদ্দীন, বোন যুহ্‌রা তোমাদের উভয়কে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আল্লাহ তোমাদের ধৈর্য ও শক্তি দান করুন।

গংগু বলে- যুবায়র, আমাদের মন খুঁজে দেখলে দেখতে পাবেন আমরা সবাই মুসলমান। কিন্তু সকলের জন্য নাম নির্বাচন করতে আপনার বিলম্ব হয়ে যাবে। এ কাজ খালিদের উপর ছেড়ে দিন। এখন দুপুর হয়ে গেল সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনার অন্ততঃ ত্রিশ ক্রোশ দূরে পৌছাতে হবে।

মৃদু হেসে যুবায়র জবাব দেন- আমি প্রস্তুত।

গংগু বসুকে ডেকে কাপড় আনতে বলল- যুহ্‌রা আবার নাহীদের কাছে এসে বসল। গংগুর নির্দেশ মতো যুবায়র এক সিন্ধী সিপাইর বেশ পরিধান করলেন। গংগু বলল- বাইরে আপনার জন্য ঘোড়া প্রস্তুত।

আমি এখুনি আসছি- বলে তিনি আবার নাহীদের ঘরে প্রবেশ করলেন। পদশব্দ পেয়ে নাহীদ মুখে ঘোমটা টেনে দিল।

যুবায়র বলেন- নাহীদ, আল্লাহ হাফিজ। বোন যুহ্‌রা, আমার জন্য দু'আ কর।

উত্তরে উভয়ে বলল- আল্লাহ হাফিজ। যুবায়র দীর্ঘ পদক্ষেপে বের হয়ে গেলেন।

খালিদ, নাসিরুদ্দীন ও গংগু কিল্লার ফটক পর্যন্ত তার সঙ্গে গেল।

বসু ফটকে দু'টি ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'খোদা হাফিজ বলে যুবায়র ঘোড়ায় চড়লেন। বসু তার অনুকরণ করল। গংগু বলল- রৌদ্র প্রখর বটে; তবে ঘোড়া দু'টি সতেজ ও শক্তিশালী। ত্রিশ ক্রোশের প্রথম মঞ্জিল পৌঁছা এদের পক্ষে খুব কঠিন কাজ নয়। বসু, এ অভিযানে তোমার সাফল্য হয়ত কয়েক মাসের মধ্যেই সিন্ধুর মানচিত্র বদলিয়ে দেবে। যতক্ষণ যুবায়র মকরাণ সীমান্ত অতিক্রম না করেন, তুমি ফিরবে না।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। একথা বলে বসু ঘোড়াকে ঘোড়ালি দ্বারা তাড়না করল। যুবায়রও স্বীয় ঘোড়া তার পেছনে ছুটিয়ে দিলেন।

কিল্লার ভেতর থেকে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনে যুহ্‌রা নাহীদের দিকে তাকাল। তার চোখে অশ্রু চক্‌চক্ করছিল। সে আস্তে বলছিল- 'আল্লাহ তোমার সহায় হোন। আল্লাহ তোমাকে শত্রু হতে রক্ষা করুন।'

যুহ্‌রার চোখেও অশ্রু দেখা দিল। সে বলল- আপা, তুমি এতদিন আমাকে লুকিয়ে আসছ যে তুমি ওঁকে ভালবাস।

উত্তর না দিয়ে নাহীদ যুহ্‌রার হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিল। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ ক্রমে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছিল। মুক্তার মত অশ্রুর ফোঁটা তার চোখ থেকে গাল বেয়ে পড়ছিল। যুহ্‌রা নিজের আঁচল দিয়ে তার অশ্রু মুছতে মুছতে বলল- বোন, তিনি শীঘ্রই ফিরবেন। নিশ্চয় ফিরবেন।

দ্বিতীয় ভাগ
তরুণ সেনাপতি

কুতায়বার দূত

॥ এক ॥

বসরার এক কোণে, নদীর তীরে শ্যামল খেজুর কুঞ্জের মধ্যে বসরার শাসনকর্তার দুর্গের মত প্রাসাদ। প্রাসাদের এক প্রশস্ত ঘরে জনৈক দৃঢ়কায় বৃদ্ধ পায়চারি করছিলেন। চলতে চলতে তিনি থেমে দেওয়ালে লটকানো মানচিত্র পর্যবেক্ষণ করতে মগ্ন হয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর চেহারায় অসাধারণ মনোবল ও দৃঢ়তা প্রতিভাত হচ্ছিল। চোখে বুদ্ধির দীপ্তি এবং দৃষ্টি ভীতি-সঞ্চারক।

ইনি হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ, যাঁর লৌহ-কঠোর হস্ত থেকে শত্রু মিত্র সকলেই মুক্তি প্রার্থনা করত যাঁর তলোয়ার আরব অনারব সকল দেশে বজ্রের মত পতিত হত। এবং অনেক সময় সীমা অতিক্রম করে মুসলিম জাহানের এমন সব উজ্জ্বল নক্ষত্রকে রক্ত-ধূলিতে লুটিয়ে দিয়েছে যাঁদের বক্ষ ঈমানের জ্যোতিতে ছিল প্রদীপ্ত।

হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফের জীবন ছিল ঝড়ের মত। প্রথম পর্যায়ে তিনি আবদুল মালিকের শাসনকালে বিদ্রোহ দমনকল্পে ইরাক ও আরবে এক দুর্গম ঝড়ের ন্যায় ধ্বংসের করাল মূর্তিতে দেখা দেন। এ সময় তাঁর তরবারী অন্ধের লাঠির মত ন্যায়-অন্যায় বিচার না করেই আঘাত করেছে। দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় যখন আবদুল মালিকের স্থানে তাঁর পুত্র ওলীদ খিলাফতের মনসদে আরোহন করেন এবং ইরাক ও আরবের আত্মকলহ সমাপ্ত হয়ে মুসলমান জাতি এক নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এক সুশৃংখল ও শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়েছে এবং তুর্কিস্থান ও আফ্রিকায় অভিযান চালিয়েছে। আমাদের বাহিনীর সাথে হাজ্জাজের সম্পর্ক এই দ্বিতীয় পর্যায়ে। পিতার ন্যায় ওলীদও হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফকে বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ সব বিষয়ে সর্বময় কর্তৃত্ব দিয়ে রেখেছিলেন। হাজ্জাজ আবদুল মালিক এবং ওলীদ উভয়ের সেবা করেছিলেন। জনৈক মুসলিম ঐতিহাসিকের মতে উভয় পর্যায়ের সেবার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়।

আবদুল মালিকের শাসনকালে হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফের সমুদয় প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল ইরাক ও আরব দেশে। তাঁর রক্তাক্ত অসি যেখানে আবদুল মালিকের শাসন দৃঢ় করেছে সেখানেই কয়েকজন নিরপরাধ লোকের রক্তে তাঁর হাত কলংকিত করেছে। কিন্তু ওলীদের শাসনকাল ছিল মুসলমানদের জন্য অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ। হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফ জীবনের বাকী দিনগুলো পূর্ব ও পশ্চিমে মুসলমানদের বিজয়ের পথ নিষ্কণ্টক করতে ব্যাপৃত থাকেন।

হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের জীবনীর শেষ পৃষ্ঠাগুলোতে যখন আমরা চোখ বুলাই, আমরা বিস্মিত হয়ে দেখতে পাই সিন্ধু, তুর্কিস্থান এবং স্পেনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী পতাকা উড্ডীন করতে বিধাতা এমন এক ব্যক্তিকে নির্বাচন করেছেন, যিনি কয়েক বছর আগেই মক্কা অবরোধ করেছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইবন্ যুবায়রকে চোখের সামনে নিহত হতে দেখে যে চোখে বিন্দুমাত্র দয়ার উদ্রেক হয়নি, সিন্ধু দেশে এক মুসলিম বালিকার বিপদ কাহিনী শুনে তাই অশ্রু-সজল হয়ে উঠে।

ইতিহাস আমাদের সামনে আর একটি গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত করে। তা এই যে, আরব ও ইরাকের মুসলমান হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফের জীবনের শেষের দিকেও তার প্রতি অপ্রসন্ন ছিল এবং ওলীদকেও সুনযরে দেখত না। তা সত্ত্বেও যখন স্পেন, সিন্ধু ও তুর্কিস্থানে অভিযান চলে তখন কি কারণে প্রত্যেক যুদ্ধক্ষেত্রেই শামী মুসলমানের তুলনায় আরব যোদ্ধার সংখ্যা অনেক বেশী থাকে।

এর একমাত্র উত্তর এই যে, নেতৃত্বের দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও মুসলিম জনসাধারণের ব্যক্তিগত আদর্শ, অত্যন্ত উচ্চ ছিল। হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফের প্রতি বিদ্বেষ তাদের জাতীয় কর্তব্যবোধকে দমাতে পারেনি। তারা যখনই শুনল তাদের ভাইয়েরা আফ্রিকা ও তুর্কিস্তানের অনইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত, তখনই পুরাতন অভিযোগ ভুলে ত্বরিত তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

কাজেই ওলীদের শাসনকালের বিরাট বিজয়-অভিযানের কৃতিত্ব হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফ বা ওলীদের প্রাপ্য নয় এবং সেই জনসাধারণের প্রাপ্য, যাদের ত্যাগ ও আন্তরিকতার মধ্যে লুকানো থাকে প্রত্যেক জাতির উন্নতি ও সাফল্যের রহস্য।

হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ অনেকক্ষণ পর্যন্ত দেয়ালে লটকানো মানচিত্র দেখতে থাকেন। অবশেষে তিনি একটি মানচিত্র নামিয়ে সামনে রেখে কার্পেটের উপর বসে পড়েন। অনেক্ষণ চিন্তা করার পর তিনি কলম দিয়ে মানচিত্রে কয়েকটি চিহ্ন দেন এবং মানচিত্রটি মুড়ে পাশে রেখে দেন।

এক সিপাহী ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকে বলল- তুর্কিস্তান থেকে একজন দূত এসেছে।

হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফ বললেন- আমি ভোর থেকে প্রতীক্ষায় আছি। তাকে এখানে নিয়ে এসো।

সিপাহী চলে গেল এবং হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফ আবার মানচিত্র দেখতে মগ্ন হলেন। কিছুক্ষণ পর বর্ম পরিহিত এক ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করল। গঠন ও উচ্চতায় তাকে যুবক এবং চেহারায় পনর ষোল বছরের বালক মনে হচ্ছিল। তার মস্তকে তাম্র নির্মিত এক শিরস্ত্রাণ শোভা পাচ্ছিল। দৃঢ় গঠন, দীপ্ত নয়ন এবং হালকা অথচ বদ্ধ ওষ্ঠ এক অসাধারণ দৃঢ়তা ও মনোবলের পরিচয় দিচ্ছিল। তার গঠন-সৌষ্ঠব ও চেহারায় এক অপূর্ব আকর্ষণীয় শক্তি ছিল। হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফ বিস্মিত হয়ে তার দিকে চেয়েছিলেন। অবশেষে তিনি কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কে?

বালক জবাব দিল- আমি এখুনি খবর পাঠিয়েছিলাম। আমি তুর্কিস্তান থেকে এসেছি।

বেশ, তুর্কিস্থান থেকে তুমি এসেছ? আমি কুতায়বার পরিহাসের তারীফ করি। আমি তাকে লিখেছিলাম সে যেন নিজে আসে বা কোন অভিজ্ঞ সেনাপতিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। আর সে এক আট বছরের বালককে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে।

বালক শান্তভাবে উত্তর দিলো- আমার বয়স ষোল বছর আট মাস।

হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফ গর্জে উঠে বললেন- তুমি এখানে কি নিতে এসেছ? কুতায়বার কী হয়েছে?

জবাব না দিয়ে বালক অগ্রসর হয়ে তাঁকে একখানা পত্র দিল। হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফ তাড়াতাড়ি পত্রটি খুলে পাঠ করেন। খানিকটা শান্ত হয়ে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন- তিনি, সোজা কেন এখানে এলেন না। তোমাকে কেন এ পত্র দিয়ে পাঠালেন?

বালক বললেন- আপনি কার কথা জিজ্ঞেস করছেন?

হাজ্জাজের ধৈর্য নিঃশেষিত হয়েছিল। তিনি চীৎকার দিয়ে বললেন- সে নির্বোধ যার সম্বন্ধে কুতায়বা লিখেছে যে আমি আমার শ্রেষ্ঠ সেনাপতিকে পাঠাচ্ছি।

বালক আবার শান্তভাবে বলল- কুতায়বার চিঠিতে যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেই লোক আমি। আপনি যদি অন্য কোন নির্বোধের সাথে দেখা করতে চান তবে আমাকে অনুমতি দিন।

তুমি? আর কুতায়বার শ্রেষ্ঠতম সেনাপতি? তুর্কিস্তানে যুদ্ধরত দুর্ভাগ্য মুসলমানগণকে আল্লাহ শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করুন। কুতায়বার সাথে তোমার সম্বন্ধ কি?

আমরা উভয়ে মুসলমান।

সৈন্য বাহিনীতে তোমার পদ-মর্যাদা কি?

আমি অগ্রগামী বাহিনীর সেনাপতি।

অগ্রগামী বাহিনীর সেনাপতি তুমি? বলখের পাশ কাটিয়ে বোখারা ও সমরকন্দ অভিমুখে অগ্রসর হবার সিদ্ধান্তের পেছনে খুব সম্ভব তোমার মতই কোন উদীয়মান মুজাহিদের পরামর্শ রয়েছে।

হাঁ, ওটা আমারই পরামর্শ। এবং সে জন্যই আমার এখানে আসা। আর আপনি যদি কিছুক্ষণ ধৈর্য ধারণ করতে পারেন তা হলে সমুদয় পরিস্থিতি আমি আপনাকে বুঝাতে পারি।

হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফ বিরক্তি এখন বিস্ময়ে পরিণত হচ্ছিল। তিনি বললেন- আজ যদি তুমি আমার কিছু বুঝাতে পার, তাহলে আমি নিশ্চয় স্বীকার করব আরব মাতাদের স্তন্যে এখনো অদ্ভুত শক্তি রয়েছে। বল, আমি ভোর হতে এ মানচিত্র দেখছি। আমাকে বুঝিয়ে দাও যে সৈন্য বাহিনী হিরাতের ন্যায় সামান্য নগর জয় করতে অক্ষম, সে

বোখারার মত দৃঢ় ও শক্তিশালী শহর জয় করতে পারবে বলে কিভাবে আশা করে? হাঁ, আগে বল, তুমি মানচিত্র পাঠ করতে জান?

কোন জবাব না দিয়ে বালক হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফের সামনে বসে মানচিত্র খুললেন। বিভিন্নস্থানে আঙ্গুল রেখে বললেন- এটা বলখ। এটা বোখারা। সম্ভবতঃ আপনি বোখারা দুর্গের দৃঢ়তা সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছেন। কিন্তু বলখের কিল্লা তত দৃঢ় না হলেও তার ভৌগোলিক অবস্থানের দরুন অনেক বেশী সুরক্ষিত। বোখারার চারদিকে মুক্ত মাঠ। আমরা সহজে একে অবরোধ করে নগরবাসীকে তুর্কিস্তানের অন্যান্য শহরের সৈন্যদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত করতে পারি। রইল দুর্গ। তার সম্বন্ধে আপনাকে আমি আশ্বাস দিতে পারি যে, মিনজানিক যন্ত্রের সামনে প্রস্তরের দেয়াল টিকে না। আবার বহুবার দেখা গিয়েছে দুর্গে অবরুদ্ধ বাহিনী বাইরে থেকে সাহায্য পাবার আশা থাকলেই কেবল বেশী দিন আত্মরক্ষা করতে পারে। নচেৎ তারা নিরাশ হয়ে কিল্লার দরজা খুলে দেয়। অপর পক্ষে বলখে আমাদের বহু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। নগর আক্রমণের জন্য আমাদের যত সৈন্য প্রয়োজন হবে, তার চেয়ে অনেক বেশী সৈন্য দরকার হবে পার্বত্য অঞ্চলে আমাদের রসদ ও সাহায্যের পথ খোলা রাখবার জন্য। তাছাড়া শহর অবরোধ করার জন্য আশপাশের সবগুলো পাহাড় আমাদের দখল করতে হবে। এসব যুদ্ধে পাহাড়ীদের প্রস্তর আমাদের তীরের চেয়ে অধিকতর বিপজ্জনক। বলখের দক্ষিণ ও পূর্ব দিকের পাহাড় বেশ উচ্চ। যদি দক্ষিণ পূর্ব তুর্কিস্তানের সমুদয় সামন্ত রাজ্য বলখকে সাহায্য দেয়ার চেষ্টা করে, তবে উচ্চ পর্বতের আড়ালে এক বৃহৎ সৈন্য বাহিনী বিনা বাঁধায় বলখের কাছে পৌছে পূর্ব-দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক থেকে আমাদের জন্য বিপদ সৃষ্টি করতে পারে। যদি উত্তর দিক থেকে তাদের সাহায্যের জন্য বোখারা ও সমরকন্দের সৈন্য বাহিনীও এসে পড়ে, তবে মার্ভ থেকে আমাদের রসদ ও সাহায্যকারী সৈন্য আসার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। চতুর্দিক থেকেই আমরা বাইরের শত্রু দ্বারা বেষ্টিত হয়ে পড়ব। তা সত্ত্বেও গ্রীষ্মকালে আমরা দৃঢ়ভাবে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পরব। কিন্তু এ অবরোধ নিশ্চয় দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং শীতকালে পাহাড়ীরা আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক প্রমাণিত হবে। পশ্চাদপসরণ করতে হলে আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই মার্ভে ফিরে যেতে সক্ষম হবে।

হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফ এখন মানচিত্রের চেয়ে এ তরুণ সেনাপতির দিকে অধিক মনোযোগ দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন- আরবদের সামরিক পরিভাষায় 'পশ্চাদপসরণ' শব্দটি এখনো স্থান পায়নি।

বালক উত্তর দিল- আরবদের বীরত্ব ও দৃঢ় মনোবল সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু সামরিক দৃষ্টিতে এ আক্রমণ আত্মহত্যার শামিল।

হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফ বললেন- তা'হলে তোমার কি ধারণা। পূর্বদিকে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত ত্যাগ করতে হবে?

না, তুর্কিস্তানের উপর আধিপত্য রাখতে হলে পূর্বদিকে আমাদের শেষ ঘাঁটি বলখ

হবে না। বরং কাশগড় ও চিত্রলের মধ্যস্থ সমুদয় পাহাড়ী অঞ্চল আমাদের অধিকার করতে হবে। কিন্তু তার পূর্বে আমি বোখারা জয় করা প্রয়োজন মনে করি। এতে আমাদের দু'প্রকার লাভ হবে। এটা তুর্কিস্তানের শ্রেষ্ঠতম শহর। মদারিন বিজয়ের প্রভাব ইরানীদের উপর এবং দামিশ্‌ক বিজয়ের প্রভাব রোমকদের উপর যেরূপ পতিত হয়েছিল, বোখারা বিজয়ের প্রভাব তুর্কিদের উপর সেরূপ কার্যকরী হবে। দ্বিতীয় বোখারা অবরোধকালে আমাদের সে সব বিপদের সম্মুখীন হতে হবে না, যা বলখ সম্বন্ধে আমি বর্ণনা করেছি। বোখারা জয়ের পর মার্ভের পরিবর্তে একেই আমাদের সৈন্য বাহিনীর মূল শিবিররূপে ব্যবহার করতে পারব। সেখান থেকে সমরকন্দ এবং সমরকন্দ থেকে কোকন্দ ও ফরগনার দিকে অগ্রসর হতে পারব। এসব বিজয়ের পর তুর্কিস্তানের প্রতিরোধ শক্তি বাকী থাকবে বলে আমার মনে হয় না। এরপর আমার পরামর্শ হবে যে সমরকন্দ ও বোখারা থেকে আমাদের সৈন্যবাহিনী উত্তর তুর্কিস্তানের দিকে অগ্রসর হবে। এবং কোকন্দের সৈন্য কাশগড়ের দিকে যাত্রা করবে। আমার বিশ্বাস দুর্গম পার্বত্য পথ অতিক্রম করে যত দিনে কোকন্দের সৈন্যবাহিনী কাশগড়ে পৌছবে, তার পূর্বেই বলখ এবং তার আশপাশের শহরগুলো জয় করা হয়ে যাবে।

হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ বিস্ময় ও প্রশংসার দৃষ্টিতে এ তরুণ সেনাপতির দিকে চেয়েছিলেন। তিনি মানচিত্র পেঁচিয়ে এক দিকে রেখে দিলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কোন উপজাতির লোক?

বালক উত্তর দিল- আমি সাকাফী।

সাকাফী? তোমার নাম কি?

মুহম্মদ ইবন কাসিম।

হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফ চমকে উঠে মুহম্মদ ইবন কাসিমের দিকে তাকালেনএবং বললেন- কাসিমের পুত্রের কাছে আমি এটাই আশা করেছিলাম। আমাকে চেন?

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম বললেন- আপনি বসরার শাসনকর্তা।

হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ নিরাশ হয়ে বললেন- বাস, আমার সম্বন্ধে তুমি শুধু এটুকুই জান?

আমি এ ছাড়াও অনেক কিছু জানি। এর আগে আপনি খলিফা আবদুল মালিকের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন এবং এখন খলিফা ওলীদের দক্ষিণ হস্ত।

তোমার মা তোমাকে কি বলেননি কাসিম আমার ভাই ছিল এবং তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র?

বলেছিলেন।

কখন?

যখন আপনি আবদুল্লাহ ইবন্ যুবায়রকে হত্যা করে মদীনায় ফিরে এসেছিলেন।

তরুণ ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখে একথা শুনে হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফের কপালের শিরাগুলো কিছুক্ষণের জন্য ফুলে উঠল। ক্রোধান্বিত হয়ে তিনি মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের দিকে তাকাতে লাগলেন। কিন্তু তার চোখে ভয়-ভীতির পরিবর্তে গভীর স্থৈর্য দেখতে পেয়ে তাঁর ক্রোধ ক্রমে ক্রমে লজ্জায় পরিণত হল। মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের নির্ভীক দৃষ্টি যেন জিজ্ঞেস করেছিল- আমি যা বলেছি তা কি মিথ্যে? তুমি আব্দুল্লাহ ইবন্ যুবায়রের ঘাতক নও?

হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফ মনের উপর এক অসহ্য ভার অনুভব করলেন। তিনি দাঁড়িয়ে দনীর দিকের একটি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। "আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়রের হত্যাকারী- আবদুল্লাহ ইবন্ যাবায়রের হত্যাকারী।" কয়েকবার মনে মনে কথাগুলো তিনি উচ্চারণ করলেন। কল্পনার চোখে অতীতের যবনিকা সরে গেল। তিনি মক্কার সেই বৃদ্ধ মুজাহিদকে দেখছিলেন, নিহত হওয়ার সময়েও যাঁর ওষ্ঠে বিজয়ের হাসি দেখা যাচ্ছিল। আর একবার তিনি মক্কার অলিতে গলিতে বিধবা নারী ও এতীম শিশুদের ক্রন্দনরোল শুনতে পেলেন। শিউরে উঠে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তাঁর দৃষ্টি মুহম্মদ ইবন কাসিমের উপর পড়ল। সে তাঁর দিকে না তাকিয়ে মানচিত্র পর্যবেক্ষণে মগ্ন ছিল। এটা তিনি প্রত্যাশা করেন নি। বিস্মিত হলেন। বিগত দিনের আরো কয়েকটি চিত্র তাঁর সামনে ভেসে উঠল। মদীনার এক ছোট্ট ঘরে তাঁর তরুণ ভাইকে মৃত্যু-শয্যায় দেখতে পেলেন। মক্কায় তাঁর কীর্তি-কলাপের কথা শুনে এ ভাই তাঁকে দেখে ক্রোধে ও উত্তেজনায় চোখ বন্ধ করে নিয়েছিল।

কাসিমের কথাগুলো আর একবার তাঁর কানে গর্জে উঠল ঃ "হাজ্জাজ, চলে যাও" আবদুল্লাহ ইবন্ যুবায়রের হত্যাকারীর মুখ আমি মরবার সময় দেখতে চাই না। তোমার হাত যে রক্তে কলংকিত হয়েছে, আমার অশ্রু তা ধুয়ে দিতে অক্ষম।" ভাইয়ের জানাযার সাথে একটি অল্প বয়সী বালকের চিত্র তাঁর চোখে আবার ফুটে উঠল। সে ছিল তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি তাকে কোলে নিয়ে আদর করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বালক ছটফট করে সরে গিয়ে চীৎকার করে উঠল- না, না। আমাকে স্পর্শ কর না। আব্বা তোমাকে ঘৃণা করতেন।

হাজ্জাজ হৃদয়ে এক বেদনা অনুভব করলেন। মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের দিকে ফিরে তিনি বললেন- মুহম্মদ এদিকে এস।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম মানচিত্রখানি মুড়ে রেখে হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার অসাধারণ স্থৈর্য হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফের ধৈর্য হরণ করার উপক্রম করেছিল। কিন্তু তিনি আত্মসংবরণ করে বললেন- তাহলে আমি তোমার মতে আবদুল্লাহ ইবন্ যুবায়রের হত্যাকারী ছাড়া আর কিছু নই?

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম জবাব দিল- এটা জনসাধারণের সিদ্ধান্ত। আপনাকে ছলনা

করবার জন্য হত্যাকারীর পরিবর্তে আমি অন্য শব্দ ব্যবহার করতে পারি না।

হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ বলেন- তোমার শিরায় কাসিমের রক্ত প্রবাহিত। তোমার সব কথা আমি সহ্য করতে প্রস্তুত। যদিও সহ্য করা আমার অভ্যাস নয়।

আপনার অভ্যাস পরিবর্তন করবার জন্য আমি এখানে আসিনি। কুতায়বা ইবন্ মুসলিম বাহিনী আমাকে যে কর্তব্যের ভার দিয়েছিলেন, আমি তা সম্পন্ন করেছি। এখন আমাকে অনুমতি দিন। কুতায়বার কাছে যদি আপনার বার্তা প্রেরণ করার থাকে তবে আমি কাল আসব।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফ জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কোথায় যেতে চাও।

মুহম্মদ ইবন কাসিম জবাব দিল- শহরে আম্মার কাছে। আমি সোজা আপনার কাছে এসেছি। এখনো বাড়ী যাইনি।

তোমার মা বসরায় আছেন? আমার তা জানা ছিল না। তিনি কখন এখানে এসেছেন?

মদীনা থেকে তিন চার মাস আগে এখানে এসেছেন। মার্ভে আমি তাঁর চিঠি পেয়েছিলাম।

তিনি কার কাছে আছেন? এখানে আসেন নি কেন?

তিনি মামার বাড়ীতে আছেন। এখানে না আসার কারণ আমার চেয়ে আপনিই ভাল বুঝবেন।

তুমি তুর্কিস্তানে যাবার আগে কোথায় ছিলে?

আমি দশ বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের কাছে মদীনায় ছিলাম। তারপর বসরায় মামার কাছে চলে আসি।

আমার প্রতি এতো ঘৃণা যে কখনো আমাকে মুখ দেখাও নি?

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম জবাব দিল- সত্য বলতে কি, প্রথমে বিদ্যালয় ও পরে যোদ্ধা জীবন নিয়ে আমি এতো ব্যস্ত ছিলাম যে, কারুর প্রেম বা বিদ্বেষকে মনে স্থান দেয়ার অবসর ছিল না।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফ বলেন- মক্তবে হয়তো তোমাকে আমি দেখেছিলাম। কিন্তু আমি চিনতে পারি নি। তুমি খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে গেছ। এখন বল, তোমার চাচীর সঙ্গে দেখা করবে না?

মন স্থির করতে না পেরে মুহম্মদ ইবন্ কাসিম হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফের দিকে তাকাল। হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফ তার বাহু ধরে ধীর পদক্ষেপে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। বাগানের অপর কোণে বাসভবনের দরজায় পৌছে মুহম্মদ ইবন্ কাসিম মৃদু হেসে বলল- আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনার সাথেই আসছি।

॥ তিন ॥

হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফের শব্দ পেয়ে তাঁর স্ত্রী ঘর থেকে বের হলেন এবং মুহম্মদ ইবন কাসিমকে দেখেই চীৎকার দিয়ে বললেন- মুহম্মদ, তুমি কখন এলে?

হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফ আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন- তুমি একে চিনলে কি করে?

আনন্দাশ্রু মুছতে মুছতে তিনি বললেন- আমি কি করে একে ভুলতে পারি?

হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফ আবার জিজ্ঞেস করলেন- তুমি একে কখন দেখেছিলে?

যখন আমি যুবায়দা ও তার মামার সাথে হজ্জে গিয়েছিলাম, ফিরবার পথে মদীনায় আমরা এদের বাসায় ছিলাম। মুহম্মদও তুর্কিস্তান থেকে ছুটিতে এসেছিল।

আর আমার কাছে উল্লেখও করনি?

এর মা আমাকে বারণ করেছিলেন। আমারও ভয় ছিল যে আপনি পাছে রাগ করেন।

তা'হলে তিনি এখনো আমার অপরাধ মাফ করেননি?

তিনি আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট নন। তবে কাসিমের মৃত্যু তাঁকে গভীর বেদনা দিয়েছে।

হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফ কিছুক্ষণ ভেবে মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের দিকে তাকিয়ে বললেন- মুহম্মদ, চল আমিও তোমার সাথে যাচ্ছি।

হাজ্জাজের স্ত্রী বললেন- না, না, আপনি এখন ওখানে যাবেন না।

কেন?

তিনি অসুস্থ।

তাহলে তো আমার অবশ্যই যাওয়া উচিত।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম অস্থির হয়ে বললেন- আম্ম অসুস্থ? আমাকে অনুমতি দিন।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম দৌড়ে বেরিয়ে গেল। হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফ তার সঙ্গে যাবার জন্য মুখ ফিরে দাঁড়ালেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে বললেন- না, না, আপনি যাবে না।

আমি নিশ্চয় যাব। তোমার ভয় তিনি হয়তো আমাকে যা তা বলবেন এবং আমি ক্রুদ্ধ হব?

না, তাঁর মন এতো ক্ষুদ্র নয়।

তবে তাঁর রোগের খবর নিতে আমাকে বারণ করছ কেন? আর তুমি কি করে জানলে যে তিনি অসুস্থ?

আমার ভয় হচ্ছে আপনি রাগ করবেন। আমি এক কথা আপনার কাছে লুকিয়ে আসছি।

সেটা কি?

যখন থেকে তিনি বসরায় এসেছেন, প্রত্যেক তৃতীয় বা চতুর্থ দিন আমি তাঁর বাসায় যাচ্ছি। কাল আমি ঝিকে পাঠিয়েছিলাম। সে এসে বলল তাঁর শরীর খুব খারাপ। আমি এখুনি সেখানে থেকে ফিরছি। আপনার ভয় না থাকলে আমি আরো কিছুক্ষণ সেখানে থাকতাম। আজ যুবায়দা আমার সাথে ছিল এবং তাঁর অবস্থা দেখে আমি...

হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফ বললেন- তুমি ভয় করছ কেন? পরিষ্কার কথা বল। যদি তুমি যুবায়দাকে সেখানে রেখে এসে থাক, তাতে দোষ হয়নি। সে এখুনি ফিরে আসবে। আমি ঝিকে পাঠিয়ে দিয়েছি।

কিন্তু এসব কথা তুমি আমাকে লুকালে কেন? তোমার কি ধারণা হয়েছে আমার মধ্যে মনুষ্যত্বের এক বিন্দুও আর বাকী নেই?

আমাকে মাফ করুন।

আচ্ছা, এখন তুমিও আমার সাথে চলো।

॥ চার ॥

মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের মায়ের শিয়রে বসে যুবায়দা তাঁর মাথা টিপে দিচ্ছিল। এক শাম দেশীয় দাসী কাছে দাঁড়িয়েছিল। মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের মা কাতরিয়ে যুবায়দার হাতখানি নিজের শীর্ণ হাতে তুলে নিলেন এবং তাঁর চোখের উপর চেপে বললেন- মা, তোমার হাতের স্পর্শে আমার জ্বলন্ত চোখ শীতল হয়। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে তোমার পিতা জানতে পেলে খুব রাগ করবেন। আর হয়তো কখনো এখানে আসতে পারবে না। মা, তুমি যাও।

অশ্রু-ভরা চোখে যুবায়দা বলে- আপনাকে এ অবস্থায় ফেলে যেতে আমার ইচ্ছা করে না।

উঠানে পদশব্দ শুনে যুবায়দা দাঁড়িয়ে বাইরে তাকালো। মুহম্মদ কাসিম ঘোড়ার লাগাম হাব্‌শী গোলামের হাতে দিয়ে দৌড়ে এল। দরজায় যুবায়দাকে দেখে চমকে উঠল। চিনতে পেরে বলল- তুমি এখানে? আম্মা কেমন আছেন?

যুবায়দা তার যোদ্ধা হাবভাব ও বেশ-ভূষায় অভিভূত হয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল। সে উত্তর দিতে ভুলেই গেল।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম ভেতরে প্রবেশ করল।

পুত্রের উপর দৃষ্টি পড়তেই মায়ের পান্ডুর চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে গেল। উঠে বসতে বসতে তিনি বললেন- বাবা তুমি এসে গেছ?

মুহম্মদ ইবন কাসিম তাঁর কাছে বসে শিরস্ত্রাণ নামাতে নামাতে বললেন, আম্মা, কখন থেকে আপনার অসুখ?

বাবা, বসরা পৌঁছেই আমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আমাকে লিখেন নি কেন?

বাবা, তুমি দূর দেশে ছিলে। তোমাকে আমি বিচলিত করতে চাইনি। এ শিরস্ত্রা তোমার মাথায় আমার খুব ভাল লাগছিল। আবার মাথায় পরে আমাকে দেখাও। আমা তরুণ মুজাহিদকে যোদ্ধা বেশে দেখে আমার নয়ন পরিতৃপ্ত করতে চাই।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম মৃদু হেসে আবার শিরস্ত্রাণ পরে নিল। মা স্থির দৃষ্টিতে অনেক্ষ চেয়ে রইলেন। তাঁর মুখ থেকে প্রার্থনা বের হলঃ 'হে আমার আল্লাহ্, এ শির যে চিরকাল উচ্চ থাকে।'

মুহম্মদ ইবন কাসিম থেকে দৃষ্টি ফিরায়ে যুবায়দার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন- ম তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বস।

যুবায়দা তখনো দরজার কাছে ছিল। লজ্জিত ও কুণ্ঠিতভাবে অগ্রসর হয়ে বিছান কাছে এক কুরসীতে বসে পড়ল।

মাতা মুহম্মত ইবন কাসিমের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন- মুহম্মদ তুমি এ চিনলে না?

সে উত্তর দিলো- আমি ওকে দেখেই চিনেছিলাম। কিন্তু যুবায়দা তুমি কি ক এলে? চাচা তো একথাও জানতেন না যে আম্মা এখানে আছেন।

মা বিচলিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন- তুমি তোমার চাচার সাথে দেখা করে এসেছ?

হাঁ, আম্মা, কুতায়বার জরুরী বার্তা ছিল। সে জন্য আমি সোজা তাঁর কাছে যাই তিনি আমাকে ধরে বাড়ী নিয়ে গেলেন। তিনি নিজেও আপনার কাছে আসত চাচ্ছিলেন। কিন্তু আপনার অসুখের কথা শুনে আমি ছুটে চলে এসেছি। তাঁকে সঙ্গে ক আনতে পারিনি।

মা বিষন্ন মুখে বললেন- আল্লাহ করুন, তাঁর এখানে আসার উদ্দেশ্য যেন ভাল হয়

যুবায়দার গৌর-লালিম চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে আসছিল। কুরসী থেকে উঠে বলল- চাচীজান, আমি আসি। শাম দেশীয় দাসীও উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু ইতিমধ্যে উঠানে পদ শব্দ শোনা যাওয়ায় দাসী অগ্রসর হয়ে সে দিকে তাকাল। তার মুখ থেকে মৃদু চীৎকার বেরিয়ে এল।

মুহম্মত ইবন্ কাসিম বিচলিত হয়ে দরজার দিকে অগ্রসর হল। যুবায়দার মা ভেতর প্রবেশ করলেন। হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফ দরজায় থেকে মুহম্মদ ইবন্ কাসিমকে বললে মুহম্মদ, তোমার মাকে জিজ্ঞেস কর, আমার প্রবেশ করার অনুমতি আছে কিনা।

মুহম্মদ ইবন কাসিম মায়ের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল- হাঁ মা, চাচা ভেতর আসবার অনুমতি চাচ্ছেন।

মাতা ও মুখ ঢাকতে ঢাকতে তিনি জবাব দিলেন- আগন্তুক অতিথির জন্য দর কখনো বন্ধ করা যায় না। তাঁকে ভেতরে নিয়ে এস।

হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফ ভেতরে প্রবেশ করলেন। যুবায়দার মুখের রং ঘন ঘন পরিবর্তিত হচ্ছিল। তার মা সস্নেহে মস্তকে হাত রেখে বললেন- মা, তুমি ভয় করছ কেন? তোমার বাবা নিজেই তোমার চাচীর কুশল জিজ্ঞেস করতে এসেছেন।

হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফ সেখানে কিছুক্ষণ বসার পরেই গলিতে বহু লোকের সোরগোল শোনা গেল। মুহম্মদ ইবন কাসিম বাইরে গিয়ে কিছুক্ষণ পর হাসতে হাসতে ফিরে এল। সে বলল- আপনাকে দেখে পাড়ার সমস্ত লোক আমাদের দরজায় জড়ো হয়েছিল। তারা ভেবেছিল আপনি আমাদের হত্যা করতে এসেছেন।

হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফের মুখে করুণ হাসি দেখা দিল। তিনি মাথা নত করলেন।

॥ পাঁচ ॥

তৃতীয় দিন মুহম্মদ ইবন্ কাসিম আবার হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফের কাছে গিয়ে তুর্কিস্তানে ফিরে যাবার সংকল্প প্রকাশ করল। হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফ জিজ্ঞেস করলেন- তোমার মায়ের অবস্থা এখন কেমন?

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম জবাব দিল- তাঁর অবস্থা আগের চেয়ে একটু ভাল। তিনি আমাকে ফিরে যাবার অনুমতি দিয়েছেন। আমি মনে করছি আজই রওয়ানা হব।

হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফ উত্তর দিলেন- আজ ভোরে আমি কুতায়বার কাছে দূত পাঠিয়েছি। তাকে লিখেছি যে, তোমার পরামর্শ আমি গ্রহণ করেছি। এখন কিছুকাল তুমি এখানেই থাকবে।

কিন্তু আমার সেখানে ফিরে যাওয়া জরুরী। কুতায়বা আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে খুব তাকীদ করেছিলেন।

হাজ্জাজ জবাব দিলেন- কিন্তু তোমাকে আমার এখানে প্রয়োজন বেশী। আমার দায়িত্বের ভার অত্যন্ত দুর্বহ। তুমি আমাকে কিছু সাহায্য করতে পার। আমি এখান থেকে প্রত্যেক যুদ্ধক্ষেত্রের পর্যবেক্ষণ করতে পারি না। তাছাড়া তোমার সম্বন্ধে আমি খলিফার দরবারে লিখেছি। সম্ভবতঃ সেখানে তোমাকে ফৌজী পরামর্শদাতার পদ গ্রহণ করতে হবে।

কিন্তু দামিশ্‌কে আমার চেয়ে বহু অভিজ্ঞ লোক রয়েছেন। দরবারে আপনার প্রভাব প্রতিপত্তির অবৈধ সুবিধা আমি নিতে চাই না। আমাকে এখনো অনেক কিছু শিখতে হবে। আপনি আমাকে তুর্কিস্তানে যাবার অনুমতি দিন।

মুহম্মদ, তোমার এ ধারণা অমূলক। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র না হয়ে তুমি আমার পুত্র হলেও আমি তোমাকে অবৈধ সাহায্য করতাম না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি গুরু দায়িত্ব বহন করতে পারবে। তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সেটা অবান্তর। পরন্তু সাক্ষাতের পর তুমি যে ধারণা সৃষ্টি করেছ, তাতে তুমি যে কেউ হলেও আমি তোমার জন্য এটাই করতাম।

কুতায়বা নিজে অসাধারণ গুণের অধিকারী। সে তোমার সাহায্য ছাড়াও কাজ চালিয়ে নিতে পারবে। যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবর্তে বসরা বা দামিশকে থেকে তুমি তার বেশী সাহায্য করতে পারবে। তুমি তরুণ। যেসব যুবক বৃদ্ধদের ডাকে নির্বিকার থাকে, তারা তোমার আহবানে নিশ্চয় সাড়া দেবে। তুমি এখানে ও দামিস্ক থেকে কুতায়বার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করতে পারলে তার সবচেয়ে বড় উপকার করা হবে। অপর যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের বাহিনী পশ্চিম আফ্রিকায় পৌছে গিয়েছে। মূসা ইবন্ নাসীর হয়তো যে কোন দিন সমুদ্র পার হয়ে স্পেন আক্রমণ করতে প্রস্তুত হবে। তখন পশ্চিম রণক্ষেত্র তুর্কিস্তানের চেয়ে অধিকতর গুরুত্ব লাভ করবে। কাজেই খলিফার দরবার থেকে আমার চিঠির জবাব না আসা পর্যন্ত এখানেই থাক।

– আচ্ছা, তোমার মামা এখন কূফা থেকে ফিরেছেন কি?

মুহম্মদ ইবন কাসিম জবাব দিল- তিনি হয়তো আজ এসে পড়বেন।

তিনি আসা মাত্র আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। বল যে এটা বসরার শাসনকর্তার হুকুম নয়, হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফের অনুরোধ।

মুহম্মদ ইবন কাসিম বের হতেই এক দাসী বললেন- আপনার চাচী আপনাকে ভেতরে ডেকেছেন। মুহম্মদ ইবন কাসিম অন্দর মহলে প্রবেশ করল। যুবায়দা মায়ের কাছে বসা ছিল। মুহম্মদ ইবন্ কাসিমকে দেখে তার মুখে লজ্জার লালিমা দেখা দিল। সে অন্য ঘরে চলে গেল।

চাচী মুহম্মদ ইবন্ কাসিমকে নিজের কাছে এক কুরসীতে বসালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন- বাবা, তোমার মামুজান ফিরে এসেছেন কি?

মুহম্মদ ইবন কাসিম জবাব দিল- তিনি আজ এসে পড়বেন। কিন্তু তাঁর কি দরকার পড়ে গেল! চাচাও তাঁর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।

কিছু না বাবা, একটু কাজ আছে।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম চাচীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী পৌছলে দেখতে পেল, হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফের এক বৃদ্ধা ঝি বের হয়ে যাচ্ছে। ভেতরে ঢুকে দেখল মা বালিশে হেলান দিয়ে বিছানায় বসে আছেন। তাকে দেখেই মৃদু হেসে তিনি বললেন- বাবা, এখন হয়তো তোমাকে আরো কিছুদিন এখানে থাকতে হবে।

হাঁ আম্মা। চাচা খলিফার দরবারে আমাকে ফৌজী পরামর্শদাতার পদের জন্য সুপারিশ করেছেন। উত্তর আসা পর্যন্ত আমাকে এখানে থাকতে হবে।

বাবা, হাজ্জাজ কখনো কাউকে অনুগ্রহ করেনি। কিন্তু তুমি খুব ভাগ্যবান।

আম্মা, আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই। দামিশকে যেয়ে যদি দেখি আমি আমার নব পদের উপযুক্ত নই, তবে আমি ফিরে চলে যাব। আমার ভয় হচ্ছে সেখানকার অধিক বয়স্ক লোকেরা আমাকে নিয়ে হাসবেন এবং বললেন আমার প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে।

বাবা, হাজ্জাজের অনেক দোষ আছে সত্য, কিন্তু তাঁর একটি গুণ নিশ্চয় আছে। কর্মচারী নির্বাচনে তিনি কখনো ভুল করেন না। আমি নিজেও চাই না, তিনি আমার পুত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন। কিন্তু তিনি যদি কোন অবৈধ পক্ষপাতিত্ব করেও থাকেন, তাহলে আমি চাই তুমি নিজেকে তার উপযুক্ত প্রমাণ করে দেখাও। বরং এটা প্রমাণ কর তুমি এর চেয়ে গুরুতর দায়িত্ব বহন করতে সক্ষম। আমি তোমাকে আর একটি সুখবর দিতে চাই। সেটা কি?

আগে প্রতিজ্ঞা কর আমি যেরূপ বলব- তুমি সেভাবে কাজ করবে।

আম্মা, আজ পর্যন্ত আপনার কোন হুকুম আমি অগ্রাহ্য করেছি?

বেঁচে থাকো বাবা। আমি দু'আ করছি- যতদিন দিনে সূর্য এবং রাতে চন্দ্র ও তারকা আলো দান করবে, ততদিন দুনিয়ায় তোমার নাম উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। কিয়ামতের দিন ইসলামের মুজাহিদগণের মাতৃকুলে আমার শির যেন কারো চেয়ে নিচু না হয়।

আম্মা, সে খবরটা কি?

মা মৃদু হেসে বালিশের নিচ থেকে একখানা পত্র বের করে বললেন, নাও, পড়ে দেখ। তোমার চাচীর চিঠি।

মুহম্মদ ইবন্‌ কাসিম পত্র খুলল। কয়েক ছত্র পড়েই তার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। চিঠি শেষ না করেই সে মায়ের সামনে রেখে দিল। অনেকক্ষণ মাথা নত করে বসে রইল।

হাঁ বাবা, কি ভাবছ?

কিছু না আম্মা।

বাবা, এটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সাধ। হাজ্জাজের প্রতি বিদ্বেষ সত্ত্বেও আমি দু'আ করতাম, যুবায়দা যেন আমার পুত্রবধূ হয়। গত কয়েকদিন যাবত তার পিতাকে লুকিয়ে লুকিয়ে সে আমার রোগ শয্যায় সেবা শুশ্রূষা করছিল। সত্যি বলছি, আমার নিজের কোন মেয়ে থাকত, সেও তারচেয়ে বেশী আমার সেবা করতে পারত না। আমার ভয় ছিল হাজ্জাজ ইবন্‌ ইউসুফ কখনো এটা পছন্দ করবেন না। আমি আল্লাহর কাছে তোমার সম্মান উন্নতি এবং সুনামের জন্য দু'আ করেছি। আমি যখনই যুবায়দাকে দেখেছি, আমার মুখ থেকে এই দু'আ বের হয়েছে- হে আল্লাহ, আমার পুত্রকে এমন বানিয়ে দাও যে হাজ্জাজ তাকে নিজের জামাতা করতে গর্ব বোধ করবে। আজ আমার সাধ পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু তুমি মনে কর না তুমি বসরার শাসনকর্তার জামাতা হবে বলে আমি আনন্দিত হচ্ছি। আমার আনন্দের কারণ হচ্ছে মদীনা দামিশ্‌ক এবং বসরায় আমি যুবায়দার মত মেয়ে দেখি নি। আমি চাই দামিশ্‌ক বা অন্য কোথাও যাবার আগে তোমার বিয়ে হয়ে যাক। বাবা, তোমার তো কোন আপত্তি হবে না?

আম্মা, আপনাকে সুখী করা আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সৌভাগ্য মনে করি। কিন্তু মামুজান হাজ্জাজকে অত্যন্ত ঘৃনা করেন।

তা সত্ত্বেও আমি যুবায়দাকে যে চোখে দেখি তিনিও তাকে সে চোখে দেখবেন। তুমি তার জন্য চিন্তা কর না।

॥ ছয় ॥

তিন সপ্তাহ পরে বসরা, কুফা এবং ইরাকের অন্যান্য শহরের লোকেরা বিস্ময়ের সাথে শুনল হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ, যিনি ইসলামী দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদেরকেও পাত্তা দেন না, নিজের ভাই কাসিমের এতীম ও দরিদ্র পুত্রের সাথে স্বীয় একমাত্র কন্যার বিয়ে দিয়েছেন। বিয়ের দাওয়াতে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি ছাড়াও মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের বহু বন্ধু এবং সহপাঠী যোগ দিয়েছিলেন।

পরদিন হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ মুহম্মদ ইবন্ কাসিমকে ডেকে সুখবর দিলেন যে দামিশ্ক থেকে খলিফার দূত এসেছে। তিনি তোমাকে শীঘ্র দামিশ্ক পাঠিয়ে দিতে লিখেছেন।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম বললেন- আমি যেতে প্রস্তুত। কিন্তু খলিফার দরবারের উচ্চ কর্মচারীগণ আমাকে দেখে ভাববেন আপনার খাতিরে আমার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে।

হাজ্জাজ জবাব দিলেন- মহামূল্য মনির পরিচয় তার স্থলত্বে নয় তার জ্যোতিতে। তোমার স্বাভাবিক ক্ষমতা স্ফুরণের জন্য আমি কেবল অনুকূল পরিবেশের ব্যবস্থা করেছি মাত্র। খলিফার দরবারে জঙ্গী পরামর্শ সভার সভ্য হিসাবে তুমি কাজ করবে। তোমার সহকর্মী এবং খলীফাকে যদি আমার মতই প্রভাবিত করতে পার, তবে তোমার বয়সের স্বল্পতা সম্বন্ধে কারো অভিযোগ থাকবে না সে আশ্বাস আমি তোমাকে দিতে পারি।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম বললেন- আমি বিস্মিত হচ্ছি জঙ্গী সভা দামিশ্কে কি করছে। জঙ্গী ব্যাপারের সমস্ত দায়িত্ব তো খলিফা আপনার হাতে সমর্পণ করেছেন। সেনাপতিদের দূত সোজা আপনার কাছে আসে। সৈন্য সমাবেশ ও চলাচলের সমুদয় আদেশ আপনি দিয়ে থাকেন।

এর কারণ এই যে, পরামর্শ সভায় তোমার মত কর্মতৎপর ও জাগ্রত মস্তিষ্ক লোকের অভাব। এ জন্যই তাদের অধিকাংশ ভার আমার মাথায় তুলে দেওয়া হয়েছে। তুমি সেখানে গেলে অন্ততঃ আফ্রিকার যুদ্ধ-ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধান ভার থেকে আমি নিষ্কৃতি পাব। আফ্রিকার অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন হলেই প্রত্যেক দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে আমীরুল মু'মিনীন আমাকে পরামর্শের জন্য ডেকে পাঠান। তোমার যোগ্যতা ও গুণ দেখার পর হয়তো আমাকে বারবার ডাকার প্রয়োজন মনে করবেন না। তা হলে তুর্কিস্তানের যুদ্ধের প্রতি আমি অধিকতর মনোযোগ দিতে পারব।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম জিজ্ঞেস করল- আমার কখন যাওয়া উচিত?

আমার মতে তুমি কালই যাত্রা কর। কয়েকদিনের মধ্যেই তোমার মাতা ও

যুবায়দাকে দামিশ্‌কে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেব।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম বিদায় নিচ্ছিল এমন সময় এক হাব্‌শী গোলাম এসে হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফকে খবর দিল যে এক যুবক দেখা করার অনুমতি চায়।

সে বলছে সে লংকা হতে জরুরী খবর নিয়ে এসেছে।

হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফ বললেন- তাকে নিয়ে এস। আর মুহম্মদ, তুমিও অপেক্ষা কর। আমার মন বলছে- লংকা থেকে কোন ভাল খবর আসেনি।

একটু পরে যুবায়র প্রবেশ করলেন। তাঁর পোশাক ধূলা-বালিতে মলিন এবং সুন্দর চেহারা ক্লান্ত, শ্রান্ত ও বিষন্ন ছিল। হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফ তাঁকে দেখেই চিনে ফেললেন। বললেন- যুবায়র তুমি এসে গেছ? তোমার জাহাজ...?

যুবায়র উত্তর দিলেন, দুঃখের বিষয়, আমি ভাল খবর নিয়ে আসি নি। সিন্ধ উপকূলে দেবলের শাসনকর্তা আমাদের জাহাজ লুণ্ঠন করেছে। অন্য এক জাহাজে লংকার রাজা আপনার ও খলিফার জন্য উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন, সেটাও লুণ্ঠন করেছে। আমি যে সব মুসলমান এতীম শিশুদের আনতে গিয়েছিলাম তাদেরকে বন্দী করে রেখেছে।

হাজ্জাজ বললেন- তুমি এখানে কি করে পৌঁছলে? আমাকে সব ঘটনা বল।

যুবায়র আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফের চোখে বিষাদ ও ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল। তাঁর চেহারায় প্রাচীন ত্রাসজনক ভাবের উদয় হল। হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ও ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে তিনি ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি দেয়ালে টাঙ্গানো ভারতের মানচিত্র পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। আহত সিংহের গর্জনের ন্যায় তাঁর মুখ থেকে বের হল- 'সিন্ধু রাজের এতো স্পর্ধা'? ছাগও সিংহকে শিং দেখাতে শুরু করল। হয়তো সেও জেনে নিয়েছে আমাদের সৈন্য বাহিনী উত্তর ও পশ্চিমে ব্যস্ত রয়েছে।

একথা বলে তিনি যুবায়রের দিকে ফিরলেন। 'তুমি তো এ খবর এখনো বসরায় কারো কাছে বল নি?'

যুবায়র উত্তর দিলেন- না, আমি সরাসরি আপনার কাছেই এসেছি। হাজ্জাজ বললেন- সিন্ধুর পক্ষ থেকে এর চেয়ে পরিষ্কার ভাষায় আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা সম্ভব নয়। কিন্তু তুমি জান অবস্থা বিপাকে আমরা এখন নতুন রণক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারছি না। আমি চাই এ বেদনাদায়ক সংবাদ এখন জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত না হোক। তারা নিজে জিহাদে যেতে প্রস্তুত হোক কি না হোক, আমাকে অভিশাপ দিতে কার্পণ্য করবে না।

যুবায়র বললেন- এ সমস্ত আপনি চুপ করে সহ্য করবেন, এই কি আপনার অভিপ্রায়?

হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফ জবাব দিলেন- আপাততঃ চুপ করে থাকা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। আমি মকরাণের শাসনকর্তাকে লিখে দিচ্ছি- তিনি যেন নিজে সিন্ধু-রাজের

কাছে যান। হয়তো তিনি তাঁর ভুলের ক্ষতিপূরণ করতে প্রস্তুত হবেন এবং মুসলমান শিশুদেরকে তাঁর হাতে সমর্পণ করবেন।

যুবায়র বলেন- আমি আপনাকে দৃঢ়ভাবে বলতে পারি তিনি নিজের ভুল স্বীকার করতে রাজী হবেন না। আবুল হাসানের জাহাজ নিখোঁজ হবার পর আপনি মকরাণের গভর্নরকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে জাহাজও লুণ্ঠন করা হয়েছে এবং আবুল হাসানও তাঁর কতিপয় সঙ্গী এখনো রাজার বন্দী। আমি আসবার পথে নিজে মকরাণের এক কর্মচারীর সাথে দেখা করেছি। তিনি বলেছিলেন গতবার রাজা ও তাঁর কর্মচারীগণ তাঁদের সাথে অত্যন্ত অপমানজনক ব্যবহার করেছেন। কাজেই তিনি স্বয়ং আবার সিন্ধু যাওয়া পছন্দ করেন না। তা সত্ত্বেও তিনি আপনার পরামর্শ না নিয়েই মকরাণের প্রধান সেনাপতি উবায়দুল্লাহর নেতৃত্বে দেবলের শাসনকর্তার কাছে এক প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছেন। আমি যতদূর দেখেছি, তাতে আমার বিশ্বাস দেবলের শাসনকর্তা একান্ত নিষ্ঠুর ও একগুঁয়ে। উবায়দুল্লাহও যথেষ্ট তেজী লোক। সম্ভবতঃ সেখানে তাঁর সাথেও সেরূপ ব্যবহারই করবে- যেমন আমাদের সাথে করেছে এবং রাজার সাথে দেখা হবার আগেই কোন বিপদের মুখে পড়বেন।

হাজ্জাজ বলেন- তা সত্ত্বেও আমি উবায়দুল্লাহর প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করব।

তিনিও যদি কোন ভাল খবর না আনেন তখন?

আমি কিছুই বলতে পারি না। সিন্ধু বিস্তীর্ণ দেশ। সেখানে সৈন্য প্রেরণের আগে আমাদের দীর্ঘ প্রস্তুতির দরকার। এও সম্ভব যে তুর্কিস্তান, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা, তারপর হয়তো স্পেন বিজয়ের পূর্বে আমীরুল মু'মিনীন আমাদের সিন্ধু দেশে সৈন্য প্রেরণের অনুমতি দেবেন না।

মুহম্মদ ইবন কাসিম চুপ করে এতক্ষণ সব কথা শুনছিল। যুবায়রের নিরাশ নয়ন দেখে অভিভূত হয়ে সে বলল- খলিফাকে রাযী করার ভার আমি নিচ্ছি। আপনার অনুমতি হলে আমি কালকের পরিবর্তে আজই দামিশ্‌ক যাত্রা করব।

হাজ্জাজ উত্তর দিলেন- বৎস, দামিশ্‌ক পৌছেই তুমি খলিফাকে পরামর্শ দিতে গিয়ে নিজের যোদ্ধা যোগ্যতার উত্তম পরিচয় দিতে পারবে না। তোমার জাত্যাভিমান ও বীরত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। কিন্তু শত্রুর দুর্গ কেবল পরামর্শ ও ব্যবস্থার দ্বারাই জয় করা যায় না। এ অভিযানের জন্য বহু সৈন্যের প্রয়োজন। ইরাক, আরব, শাম কোন রণক্ষেত্রেই আমাদের উদ্বৃত্ত সৈন্য নেই।

মুহম্মদ ইবন কাসিম বলল- আমি মুসলমানদের জ্যাত্যাভিমান সম্বন্ধে নিরাশ নই। আয়েশী জীবনে অভ্যস্ত হওয়ার দরুণ যারা জিহাদের প্রেরণা অনুভব করে না তারাও এরূপ সংবাদে বিহ্বল হবে। আপনার বয়সী লোকেরা হয়তো আপনাকে নিরাশ করবে। কিন্তু তরুণরা আমাকে নিরাশ করবে না। আপনার ও খলিফার মতভেদের দরুণ যেসব যুবক তুর্কিস্তান ও আফ্রিকায় গিয়ে যুদ্ধ করতে চায় না, তারাও মুসলিম এতীম শিশুদের

উপর সিন্ধু রাজের অত্যাচার কাহিনী শুনে নিশ্চয় অস্থির হয়ে পড়বে। এখনো এমন হাজার হাজার যুবক বেঁচে আছে, যাদের জ্যাত্যাভিমান ধ্বংস হয়নি। আপনি যাদের সম্বন্ধে নিরাশ হয়েছেন সে সব মুসলমান মরেনি, ঘুমিয়ে আছে। জাতির এতীম শিশুদের ক্রন্দন তাদেরকে ইস্রাফিলের শিংগার মতই জাগিয়ে তুলবে।

হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফ গভীর চিন্তামগ্ন হলেন। যে শ্বেত রুমালের উপর নাহীদের লেখা ছিল, যুবায়র সুযোগ বুঝে হাজ্জাজের সামনে তা স্থাপন করলেন। তিনি বললেন, আবুল হাসানের কন্যা নিজের রক্ত দ্বারা এ চিঠিখানি আপনার নামে লিখেছে। সে আমাকে বলেছিল হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফের রক্ত যদি জমে গিয়ে থাকে, তবেই আমার পত্রখানি দেবে। নচেৎ এর প্রয়োজন নেই।

রুমালের উপর রক্তে লিখিত চিঠিখানির কয়েক ছত্র পড়েই হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফ শিউরে উঠলেন। তাঁর চোখের স্ফুলিঙ্গ অশ্রুতে পরিণত হতে লাগল। তিনি রুমালখানা মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের হাতে দিলেন। নিজে দেয়ালের কাছে গিয়ে আবার ভারতের মানচিত্র দেখতে লাগলেন। মুহম্মদ ইবন্ কাসিম সম্পূর্ণ চিঠিখানা প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পড়ল। তাতে লেখা ছিল ঃ-

"দূতের মুখে মুসলমান শিশু ও নারীদের বিপদের কথা শুনে আমার দৃঢ় বিশ্বাস বসরার শাসনকর্তা স্বীয় সৈন্য বাহিনীর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সৈনিককে অশ্ব প্রস্তুত করার আদেশ দিয়ে দিয়েছেন। সংবাদ বাহককে আমার এ পত্র দেখাবার প্রয়োজন হবে না। হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফের রক্ত যদি শীতল হয়ে জমে গিয়ে থাকে তবে হয়ত আমার এ পত্রও বিফল হবে। আমি আবুল হাসানের কন্যা। আমি ও আমার ভাই এখনো শত্রুর নাগালের বাইরে। কিন্তু আমাদের অন্য সমস্ত সঙ্গী এখন শত্রুর হাতে বন্দী- যার বিন্দুমাত্র দয়া নেই। বন্দীশালার সেই অন্ধকার কুঠরীর কল্পনা করুন- যেখানে বন্দীরা মুসলিম মুজাহিদের অশ্ব ক্ষুরের শব্দ শোনার জন্য উৎকর্ণ ও অস্থির হয়ে আছে। আমাদের জন্য অহরহ সন্ধান চলছে। সম্ভবতঃ অচিরেই আমাদেরকেও কোন অন্ধকার কুঠরীতে বন্দী করা হবে। এও সম্ভব যে, তার পূর্বেই আবার যখন আমাকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌছিয়ে দেবে এবং আমি সে দূরদৃষ্ট হতে বেঁচে যাব। কিন্তু মরবার সময় আমার দুঃখ থেকে যাবে যে, যে সব ঝঞ্ঝা গতি অশ্ব তুর্কিস্তান ও আফ্রিকার দরজায় ঘা মারছে, স্বজাতির এতীম ও অসহায় শিশুদের সাহায্যের জন্য তারা পৌছতে পারল না। এও কি সম্ভব যে তলোয়ার রোম ও ইরানের গর্বিত নরপতিদের মস্তকে বজ্ররূপে আপতিত হয়েছিল, সিন্ধুর উদ্ধত রাজার সামনে তা ভোঁতা প্রমাণিত হল। আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। কিন্তু হাজ্জাজ, তুমি যদি বেঁচে থাক, তবে আত্মমর্যাদাশীল জাতির এতীম ও বিধবাদের সাহায্যে ছুটে এস।

নাহীদ

আত্মাভিমানী জাতির এক অসহায়া কন্যা।"

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম রুমালটি ভাঁজ করে যুবায়রের হাতে ফেরত দিল। সে হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফের দিকে তাকাল। তিনি পরিবেশ সম্বন্ধে প্রায় অচেতন হয়ে মানচিত্র দেখছিলেন।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম জিজ্ঞেস করল- কি সিদ্ধান্ত করলেন?

হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফ খঞ্জর বের করে তার অগ্রভাগ সিন্ধুর মানচিত্রে বিদ্ধ করে বললেন- আমি সিন্ধুর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করছি। মুহম্মদ, তুমি আজই দামিস্কে যাত্রা কর। যুবায়রকেও সঙ্গে নিয়ে যাও। ঐ চিঠিখানাও আমীরুল মু'মেনীনকে দেখিয়ে দেবে। দামিস্কে যত সৈন্য সংগ্রহ করা যায় নিয়ে এখানে চলে এস। আমার চিঠিও আমীরুল মু'মেনীনের কাছে নিয়ে যাও। ফিরে আসতে বিলম্ব কর না। হাঁ, খলিফা যদি বিচলিত না হন, তবে দামেস্কের জনমতকে নিজেদের সহায় করে নিতে চেষ্টা করবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জনসাধারণের মধ্যে জীবনের স্পন্দন দেখে সিন্ধুর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতে তিনি ইতস্ততঃ করবেন না। আমি তোমার উপর এক গুরুতর দায়িত্ব সমর্পণ করছি। দামেস্ক হতে ফিরে আসার পর হয়ত এর চেয়েও অনেক বড় দায়িত্ব তোমার উপর অর্পিত হবে। আমার চিঠি দেখালে রাস্তায় প্রত্যেক ঘাঁটিতে তুমি তাজা ঘোড়া পাবে। এখন বাড়ী গিয়ে প্রস্তুত হয়ে এস। ইতিমধ্যে আমি চিঠি লিখে রাখছি। যুবায়র, তুমিও প্রস্তুত হয়ে নাও।

হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফ হাতে তালি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক হাব্শী গোলাম ছুটে এল।

হাজ্জাজ বললেন- একে অতিথিশালায় নিয়ে যাও। খানা খাওয়ার পর এক পোশাক বদলিয়ে দাও। আর এদের যাত্রার জন্য দু'টি উত্তম ঘোড়া প্রস্তুত কর।

বসরা হতে দামিস্ক পর্যন্ত

॥ এক ॥

কয়েকদিন অশ্ব পৃষ্ঠে ধাবনের পর মুহম্মদ ইবন্ কাসিম এবং যুবায়র এক প্রভাতে দামিস্ক হতে কয়েক ক্রোশ দূরে এক ছোট পল্লীর বাইরে ফৌজী ঘাঁটিতে অবতরণ করেন। মুহম্মদ ইবন্ কাসিম ঘাঁটির কর্মচারীকে হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফের চিঠি দেখিয়ে দুটি তাজা ঘোড়া প্রস্তুত রাখতে এবং খাদ্য আনতে আদেশ দিলেন।

কর্মচারী জবাব দিলেন, খাদ্য আনছি। কিন্তু ঘোড়া আজ আপনি পাবেন কি-না সন্দেহ। এখন আমার কাছে মাত্র পাঁচটি ঘোড়া আছে।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম বললেন- আমাদের তো মাত্র দুটি দরকার।

আমীরুল মু'মেনীনের ভ্রাতা সুলায়মান ইবন্ আব্দুল মালিক ও তাঁর সঙ্গীগণ এসব ঘোড়া নিয়ে দামেস্কে যাবেন। কাল দামেস্কে যুদ্ধবিদ্যার প্রদর্শনী হবে, তাই আজ সন্ধ্যায় তাঁদের সেখানে পৌঁছে যাওয়া দরকার। আমি বসরার শাসনকর্তার আদেশ অমান্য করতে পারি না। আবার আমীরুল মু'মেনীনের ভাইকে অসন্তুষ্ট করতেও সাহস হয় না। আপনি জানেন তিনি খুব কড়া মেজাজের লোক।

তিনি কোথায়?

তিনি ভেতরে বিশ্রাম করছেন। সম্ভবতঃ দু'প্রহরের পর এখান থেকে যাত্রা করবেন। আপনার কাজ যদি খুব জরুরী হয়, তবে তাঁর অনুমতি নিয়ে নিন। দু'প্রহর পর্যন্ত তাঁর নিজের ঘোড়া বিশ্রাম নিয়ে তাজা হয়ে যাবে। এমনি সেগুলো অনেক দূর থেকে আসেনি। আপনি আহার করার পর তাঁকে জিজ্ঞেস করে নিন। আমি আপনাকে নিষেধ করতে পারি না। আপনি ইচ্ছা করলে ঘোড়া নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু আমাকে বিপদে পড়তে হবে।

এক বৃক্ষের নীচে বসে যুবায়র এবং মুহম্মদ ইবন্ কাসিম আহার সমাধা করলেন। মুহম্মদ ইবন্ কাসিম ভেতরে যাবার অভিপ্রায়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু যুবায়র বললেন- সুলায়মানের অনুমতি নেয়ার দরকার আছে কি? এসব ঘোড়া কেবল ফৌজী কাজের জন্য রাখা হয়েছে। সুলায়মান আনন্দ ভ্রমণে দামেস্কে যাচ্ছেন। ফৌজী ব্যাপারে তাঁকে বাঁধা সৃষ্টি করার অধিকার দেয়া যায় না। ঘোড়া আস্তাবলে প্রস্তুত আছে। শাহ্জাদা সুলায়মান দু'প্রহর পর্যন্ত আরাম করবেন। তারপর আয়নার সামনে বসে চাকরদের মুখে স্বীয় সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা শুনবেন। তারপর নিজের কবিতার প্রশংসা আদায় করবেন। পরে অশ্বচালনা ও বর্শা নিক্ষেপ নিজের নৈপূণ্যের তারীফ শুনবেন। সন্ধ্যার সময় সম্ভবতঃ সিপাহীদের বলবেন ঘোড়ার গদী নামিয়ে ফেল। আমরা ভোরে যাব।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম হেসে বললেন- মনে হচ্ছে সুলায়মান ইবন্ আব্দিল মালিক সম্বন্ধে আপনি অনেক কিছু জানেন।

হাঁ, আমি তাঁকে ভাল করেই চিনি। সারা মুসলিম জগতে তাঁর মত গর্বিত ও আত্মম্ভরি লোক আর একটিও নেই। এ জন্যই তাঁর কাছে কোন সঙ্গত উত্তর পাওয়ার আশা বৃথা।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম বললেন- আমার শুধু উদ্বেগ যে, আমাদের চলে যাবার পর ঘাঁটির সিপাহীদের উপর বিপদ না আসে। তাই তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করে নিলে ক্ষতি কি?

আপনার যা ইচ্ছা। আপনি জিজ্ঞেস করতে যান। ইতিমধ্যে আস্তাবল থেকে দু'টি ঘোড়া নিয়ে আসছি।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম দরজা খুলে ভেতরে উঁকি মারলেন। সঙ্গীদের মাঝে সুলায়মান দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। দু'জন চাকর তাঁর পা টিপে দিচ্ছিল।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম আস্সালামু আলায়কুম বলে ভেতরে প্রবেশ করলেন। সুলায়মান নিরুৎসাহে তাঁর সালামের জবাব দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কে? কি চাও?

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম তাঁর উদ্ধত স্বর উপেক্ষা করে বললেন- মাফ করবেন, আমি আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত করলাম। আমি আপনাকে বলতে এসেছিলাম আমি জরুরী কাজে দামেস্কে যাচ্ছি।

যাও, আমি তোমাকে কখন বাঁধা দিলাম। সুলায়মানের সাথীরা জোরে হেসে উঠল। কিন্তু মুহম্মদ ইবন্ কাসিম ভ্রূক্ষেপ না করে বললেন- আমাদের ঘোড়া অত্যন্ত ক্লান্ত। আমি এ ঘাঁটি থেকে দুটি তাজা ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছি। এর জন্য আপনার অনুমতি প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পাছে আপনি ঘাঁটির সিপাহীদের মন্দ বলেন, সে জন্য আপনার সাথে দেখা করা প্রয়োজন মনে করেছি।

সুলায়মান ঠাটের সাথে সোজা হয়ে বসে বললেন- তোমাদের ঘোড়া যদি ক্লান্ত হয়ে থাকে তবে তোমরা হেঁটে যেতে পার।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম জবাব দিলেন- সিপাহীদের পক্ষে পায়ে হাঁটা লজ্জাকর নয়। তবে আমি খুব তাড়াতাড়ি দামিস্কে পৌঁছতে চাই।

তাহলে তুমি একজন যোদ্ধা। তোমার কোষের তলোয়ার কাঠের তৈরী না লোহার? এ কথায় সুলায়মানের সাথীরা আবার জোরে হেসে উঠল।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম আবার শান্ত স্বরে জবাব দিলেন- বাহুতে শক্তি থাকলে কাঠের দ্বারাও লোহার কাজ নেওয়া যায়। তবে আপনাকে আমি আশ্বাস দিতে পারি- আমার অসি লোহার তৈরী এবং আমার বাহুবলের উপরও আমার বিশ্বাস আছে।

সুলায়মান নিজের সাথীর দিকে তাকিয়ে বললেন- সালিহ, এ বালক কথায় বেশ চটপটে মনে হচ্ছে। এবার উঠ দেখি, আমি এর যোদ্ধা শক্তি যাচাই করতে চাই।

বাদামী বর্ণের এক প্রবলকায় ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে মুক্ত অসি নিয়ে অগ্রসর হল।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম বললেন- পথচারীদের সামনে যুদ্ধ ক্ষমতা প্রদর্শনে আমি অভ্যস্ত নই। তাছাড়া আমার সময়ও নেই। সময় থাকলেও আমি ভাড়াটে ভাঁড়দের সাথে

পরিহাস করা এক যোদ্ধার পক্ষে লজ্জাকর মনে করি।

একথা বলে মুহম্মদ ইবন্ কাসিম বের হয়ে এলেন। কিন্তু সালিহ অগ্রসর হয়ে অসির অগ্রভাগ দিয়ে তাঁর পথরোধ করে বললেন- নির্বোধ, তোমার বয়স যদি আর দু'চার বছর বেশী হত তাহলে তোমাকে বলে দিতাম যে ভাড়াটে ভাঁড় কাকে বলে।

সামনে যুবায়র এক ঘোড়ায় আরোহণ করে আর এক ঘোড়ার লাগাম ধরেছিলেন। সুলায়মান বাইরে এসে বললেন- একে যেতে দাও। আল্লাহ জানেন বেচারা কোথা থেকে তলোয়ার কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে। কিন্তু ওটি কে?

সুলায়মান যুবায়রের দিকে ইশারা করে বললেন- ওকে থামাও।

সালিহ যুবায়রের দিকে মনোযোগী হল। তিনি বর্শা উঁচিয়ে ধরলেন।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম তলোয়ার বের করে বললেন- মনে হচ্ছে অন্ধকার যুগের আরব এখনো দুনিয়ায় রয়েছে। কিন্তু তুমি আমাদের বাঁধা দিতে পারবে না।

সালিহ যুবায়রের দিক থেকে ফিরে তাঁর দিকে ঘুরে দাঁড়াল। অসির অগ্রভাগ তাঁর বুকের দিকে বাড়িয়ে বলল- তোমার মুখ থেকে যদি আর একটি কথা বেরোয় তাহলে মনে রেখ আমার অসি রক্ত-স্নান না করে কোষে.....

কিন্তু তার কথা শেষ হল না। মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের অসি হঠাৎ নড়ে উঠল এবং বাতাসে শাঁ করে একটা শব্দ হল। সালিহের তরবারী তার হাত থেকে খসে দশ হাত দূরে ছিটকে পড়ল। বিস্ময়, লজ্জা ও অপমানে হতভম্ব হয়ে সে তার সঙ্গীদের দিকে তাকাল। তার সঙ্গীরা অবাক বিস্ময়ে মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের দিকে চেয়ে রইল।

সঙ্গীদের বিপর্যয় দেখে সুলায়মান জোরে হেসে উঠলেন। কিন্তু মুহম্মদ ইবন্ কাসিমকে ঘোড়ায় চড়তে দেখে তাঁর হাসির কণ্ঠে আটকে গেল। তিনি চীৎকার দিয়ে বললেন- থাম।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম ঘুরে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন- আপনার সাথী বীর বটে। কিন্তু তলোয়ার ধরতে জানে না। সঙ্গীদের দামিস্কের প্রদর্শনীতে নিয়ে যাবার পূর্বে তাদের বরং কোন যোদ্ধার হাতে সোপর্দ করুন। একথা বলে মুহম্মদ ইবন্ কাসিম ঘোড়ালি দ্বারা ঘোড়াকে আঘাত করলেন এবং মুহূর্তে উভয়ে বৃক্ষের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সালিহ ক্রোধে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে আস্তাবলের দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু সুলায়মান বললেন- থাক, আর না। তুমি ওর কিছুই করতে পারবে না। চৌদ্দ পনর বছরের ছেলে আমাদের সকলের মুখে চুন ঢেলে চলে গেল।

রাস্তায় যুবায়র মুহম্মদ ইবন্ কাসিমকে বললেন-শাহজাদা সুলায়মানকে দেখলেন? একথাও বলে দিচ্ছি ইনি আবার খলীফা হবার প্রত্যাশী। মুহম্মদ ইবন্ কাসিম বললেন- আল্লাহ মুসলমানগণকে অনিষ্ট হতে যেন রক্ষা করেন।

যুবায়র বললেন- মুহম্মদ, আজ প্রথমে তোমার মুখে আমি গরিমা দেখেছি। তলোয়ার

টেনে বের করার সময় তোমাকে তোমার বয়সের চেয়ে কয়েক বছরের বড় মনে হচ্ছিল। আর যাকে তুমি পরাজিত করলে, জান সে কে? তার নাম সালিহ। প্রায় দেড় বছর আগে তাকে আমি কূফায় দেখেছিলাম। অসি চালনায় স্বীয় নৈপুণ্য নিয়ে সে বেশ গর্বিত। কিন্তু আজ তার দর্প চূর্ণ হয়েছে।

॥ দুই ॥

দামিস্কের জামে মসজিদে 'আসরের নামায পড়ে যুবায়র ও মুহম্মদ ইবন্ কাসিম খলীফার প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। সংবাদ পাওয়া মাত্র খলীফা ওলীদ তাদেরকে ভেতরে ডেকে নিলেন। ওলীদ ইবন্ আব্দিল মালিক উভয়কে পরপর আপাদমস্তক অবলোকন করে জিজ্ঞেস করলেন- তোমাদের মধ্যে মুহম্মদ ইবন্ কাসিম কোন জন?

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম জবাব দিলেন- আমি।

উপস্থিত সকলে যুবায়রের দিকে তাকিয়েছিলেন। একথা শোনা মাত্র তারা বিস্মিত হয়ে মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তাদের দৃষ্টি যেন পরস্পরের সাথে নীরবে আলাপ করছিল। হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফের পত্র থেকে ওলীদ জেনেছিলেন মুহম্মদ ইবন্ কাসিম অল্প বয়স্ক। তা সত্ত্বেও তিনি অন্যান্য সভাষদগণের মতই তাকে হাজ্জজ ইবন্ ইউসুফের তরুণ ভ্রাতুষ্পুত্র মনে করে রেখেছিলেন। তিনি ষোল সতর বছরের বালককে কুতায়বার সৈন্য বাহিনীর অগ্রণী দলের প্রধান সেনাপতিরূপে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

দরবারীদের দৃষ্টি একবার অস্ফুট সমালোচনায় পরিবর্তিত হচ্ছিল। ওলীদ হঠাৎ অনুভব করলেন তাঁর বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ উপকারক হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফের বিরুদ্ধে, কানাঘুষা চলছে। তিনি দাঁড়িয়ে সাদরে মুহম্মদ ও যুবায়রের করমর্দন করলেন এবং উভয়কে নিজের পাশে গালিচার উপর বসালেন। তিনি বললেন- হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফের ন্যায় লোক চরিত্রাভিজ্ঞ লোক এবং কুতায়বা ইবন্ মুসলিমের মত সেনাপতি যে মুজাহিদ সম্বন্ধে এরূপ উচ্চ ধারণা পোষণ করেন, তাঁকে সম্মান করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। তারপর তিনি মুহম্মদ ইবন্ কাসিমকে জিজ্ঞেস করলেন- আর এ তোমার বড় ভাই?

না, আমীরুল মু'মেনীন, ইনি যুবায়র।

ওলীদ যুবায়রের দিকে মনোযোগের সাথে তাকিয়ে বললেন- বোধহয় পূর্বেও তোমাকে আমি দেখেছি। তুমি বোধহয় লংকার দূতের সাথে গিয়েছিলে। তুমি কবে ফিরলে? সে শিশুরা কোথায়?

খলীফার ন্যায় এবার দরবারের সকলেই যুবায়রের দিকে তাকালেন। কেউ কেউ তাঁকে চিনতে পারলেন। যুবায়রের ইতস্ততঃ ভাব দেখে মুহম্মদ ইবন্ কাসিম তাড়াতাড়ি হাজ্জাজ ইবন্ ইউসুফের চিঠি বের করে তাঁকে দিলেন। তিনি বললেন- আমীরুল মু'মেনীন, আমরা আপনার কাছে অত্যন্ত গুরুতর সংবাদ নিয়ে এসেছি। প্রথমে আপনি চিঠিখানা পড়ে নিন। ওলীদ তাড়াতাড়ি চিঠি পাঠ করে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর

সভাষদগণকে সম্বোধন করে বললেন- সিন্ধুর রাজা আমাদের জাহাজ লুণ্ঠন করেছেন। লংকা হতে আগত বিধবা ও এতীমদের বন্দী করেছেন। যুবায়র, তুমি নিজেই সমস্ত কাহিনী বর্ণনা কর।

যুবায়র আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। কিন্তু উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিবর্তে দরবারে নৈরাশ্যের ছায়া পতিত হল। তা দেখে শেষের দিকে যুবায়রের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে এল। তিনি পকেট থেকে নাহীদের রুমালটি বের করে খলীফার সামনে পেশ করতে করতে বললেন- আবুল হাসানের কন্যা এ চিঠিখানা বসরার শাসনকর্তাকে লিখেছিল।

হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের ন্যায় ওলীদও পত্রখানা পাঠ করে বিশেষ বিচলিত হলেন। তিনি দরবারীদের শোনাবার জন্য পত্রখানা আবার উচ্চস্বরে পড়তে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কয়েকটি কথা পড়েই তাঁর কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেল। তিনি চিঠিখানা মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের হাতে দিয়ে বললেন- তুমি পড়ে শোনাও।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম সমস্ত চিঠিখানা পাঠ করে শুনালেন। সভার সুর পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। উপস্থিত অনেকের মুখেই এরূপ ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল যে, বুদ্ধিগত সতর্কতা মানসিক উত্তেজনার কাছে পরাজয় লাভ করেছে। কিন্তু ওলীদের নীরবতা সবাইকে নির্বাক রেখেছিল। শহরের বৃদ্ধ কাজী এ কষ্টদায়ক নীরবতা বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারলেন না। তিনি বললেন- আমীরুল মু'মেনীন, আপনি কিসের প্রতীক্ষা করছেন? চিন্তার আর সময় নেই। বিধির বিধান অলংঘ্য।

ওলীদ জিজ্ঞেস করলেন- আপনার মত কি?

কাজী উত্তর দিলেন- আমীরুল মু'মেনীন, ফরযের ব্যাপারে মতের অবকাশ নেই। যখন একাধিক পন্থা যুক্ত থাকে, তখনই মত স্থির করা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের সামনে কেবল একটি মাত্র পথ রয়েছে।

ওলীদ বললেন- আমি আপনাদের সকলের মত জিজ্ঞেস করছি?

জনৈক কর্মচারী বললেন- আমাদের কেউই পেছনে হঠতে জানে না।

ওলীদ বললেন- কিন্তু আমাদের কাছে সৈন্য কোথায়? মূসা খবর পাঠিয়েছেন তিনি স্পেনে অভিযান চালাতে চান। অন্যদিকে তুর্কিস্তানে ইরাকের সমস্ত সৈন্যও কুতায়বা যথেষ্ট মনে করেন না। নতুন রণাঙ্গন উন্মুক্ত করতে হলে হয় এদের এক রণাঙ্গনকে দুর্বল করতে হয়, নচেৎ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়।

কাজী জবাব দিলেন- আমীরুল মু'মেনীন, এ পত্র শোনার পর আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে অপেক্ষা করার পরামর্শ দেবে। আপনি যদি ব্যাপারটি সম্বন্ধে জনমত গ্রহণ করেন তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস সিন্ধু রণাঙ্গনের জন্য তুর্কিস্তান বা আফ্রিকা হতে সৈন্য আনাতে হবে না।

ওলীদ বললেন- আপনি যদি জনসাধারণকে জিহাদ করতে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাহলে আমি জিহাদ ঘোষণা করতে প্রস্তুত আছি।

কাজী মনস্থির করতে না পেরে সঙ্গীদের দিকে তাকালেন।

ওলীদ বললেন- আমি জনসাধারণ সম্বন্ধে নিরাশ নই। আমার একমাত্র অভিযোগ এই আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ স্বার্থপর ও আত্মম্ভরি হয়ে পড়েছেন। আপনি জানেন মুসা ইবন্ নাসীর যখন তিউনিস আক্রমণ করেন তখন উচ্চশ্রেণীর মধ্যে যাদের আন্তরিকতা আছে, তারা অলস ও আরামপ্রিয় হয়ে পড়েছেন এবং ঘরে বসে জগতে ইসলামের আধিপত্যের জন্য দু'আ করাই যথেষ্ট মনে করেন। আপনারা সকলে যদি জনসাধারণের কাছে আবেদন করেন, তবে কিছুদিনের মধ্যেই এমন প্রকান্ড এক বাহিনী সংগৃহীত হতে পারে যা শুধু সিন্ধু কেন সমস্ত পৃথিবী জয় করতে পারবে। কিন্তু আশা করি আপনারা ক্ষুব্ধ হবেন না; আপনারা কিছুক্ষণের জন্য বিচলিত হয়েছেন। দু'এক দিনের জন্য জনসাধারণকে বা আপনাদের সমকক্ষ অভিজাত সম্প্রদায়কে এ খবর শোনাতে, এক রকম আনন্দ পাবেন। অত্যাচারী সিন্ধুর রাজকে হয়ত গাল দেবেন। তারপর বনী ইসরাঈলের মত ইহ-পরকালের সমস্ত বোঝা আল্লাহর মাথায় চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিত আরামে বসে থাকবেন। কিন্তু আপনারা যদি সাহস করেন, তবে আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি মুসলিম জনসাধারণ এখনো জীবন্ত ও সচেতন। অভিজাত সম্প্রদায়ের চিত্তবিনোদিনী জলসা ছেড়ে আপনারা যদি দামেস্কের ঘরে ঘরে যেতে, জনসাধারণের সাথে বসতে ও কথা বলতে রাজী হন, তবে আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিতে পারি সিন্ধুর কয়েদখানায় আমাদের যেসব বন্দী কান পেতে বসে আছে, শীঘ্রই তারা উদ্ধারকারী বাহিনীর পদ শব্দ শুনতে পাবে। আল্লাহ সেই বালিকাকে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন দান করুন, যেন সে দেখতে পায় আমাদের অসি এখনো ভোঁতা হয়ে যায়নি।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম বললেন- আমীরুল মু'মেনীনের অনুমতি হলে আমি এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

ওলীদ বললেন- তোমার ব্যাপারে আমার অনুমতির প্রয়োজন নেই।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের পর দরবারে উপস্থিত রাজকর্মচারীরাই নতুন সৈন্য সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন এবং সভা ভঙ্গ হয়।

ঈশার নামাযের পর যখন মুহম্মদ ইবন্ কাসিম ও যুবায়র কথাবার্তা বলছিলেন, তখন একজন লোক এসে সংবাদ দিল আমীরুল মু'মেনীন মুহম্মদ ইবন্ কাসিমকে ডেকেছেন। মুহম্মদ ইবন্ কাসিম চলে গেলে যুবায়র বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ তার প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করলেন। তারপর ঝিমুতে ঝিমুতে এক মনোরম স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করলেন। সেখান থেকে বহু দূরে তিনি নাহীদের সন্ধানে সিন্ধুর শহরে নগরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। দূর্গ-প্রাচীর ও বন্দীশালার ফটক ভাঙ্গছিলেন। নাহীদের সুন্দর হাত থেকে লৌহ-শৃংখল মোচন করছেন। তার কাজল-কালো উজ্জ্বল নয়নের অশ্রু মুছে বলছেন- নাহীদ, আমি এসে পড়েছি। তুমি মুক্ত। তোমার ক্ষত কেমন? দেখ, ব্রাহ্মণাবাদের দুর্গে আমাদের পতাকা উড়ছে।

সে বলছিল- যুবায়র, আমি ভাল আছি। কিন্তু বড্ড দেরী করেছ। আমি নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম।

মনোরম সুবর্ণ স্বপ্নের ধারা ভেঙ্গে গেল। তিনি দেখছিলেন নিতান্ত অসহায় অবস্থা

শৃংখলাবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। রাজার কয়েকজন প্রহরী নগ্ন অসি নিয়ে তাঁর চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে। অপর কয়েকজন নাহীদকে ধরে বন্দীশালার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সে ফিরে ফিরে মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাচ্ছে। নাহীদের পা ভেতরে পড়তেই বন্দীশালার ফটক বন্ধ হয়ে যায়। প্রবল চেষ্টা চরিত্রের ফলে হাত-পায়ের বেড়ী ভেঙ্গে সে সিপাইদের মারতে মারতে ধাক্কা দিয়ে বন্দীশালার দরজায় নিয়ে যায় এবং দরজা খুলতে চেষ্টা করতে থাকে।

যুবায়র নাহীদ নাহীদ করে চীৎকার দিয়ে চোখ খোলেন এবং সামনে ইবন্ কাসিমকে দেখে আবার চোখ বন্ধ করেন।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম তাঁকে স্বপ্নের ঘোরে হাত পা ছুঁড়তে ও নাহীদের নাম নিতে শুনেছিলেন। তা সত্ত্বেও সে সম্বন্ধে কিছু বলা তিনি সংগত মনে করলেন না। তিনি নীরবে নিজের বিছানায় বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর যুবায়র আবার চোখ খুলে বললেন- আপনি ফিরে এসেছেন?

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম বললেন- হাঁ। তারপর একটু ভেবে আবার বললেন, আপনি বর্শা চালনায় কিরূপ?

যুবায়র উত্তর দিলেন- বাল্যকালে কামান ছিল আমার প্রিয় খেলনা। ঘোড়ার রিকাবে পা রাখার উপযুক্ত হবার পর বল্লমের চেয়ে আমার প্রিয়তর আর কিছু ছিল না। বাকী রইল তলোয়ার। তলোয়ার ব্যবহার জান কি-না, কোন আরবকে এ প্রশ্ন করার অর্থ তার আরব হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ করার শামিল। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার শিক্ষার পরিবেশ আপনার চেয়ে ভিন্ন নয়।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম বললেন- কাল আপনার ও আমার পরীক্ষা হবে। আমীরুল মু'মেনীন আমাকে এ জন্যই ডেকেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা আমরা উভয়ে যুদ্ধবিদ্যার প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করি। আমরা উভয়ে যদি প্রতিযোগিতায় সফল হই, তাহলে দামেস্কবাসীর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারব। তখন জিহাদের স্বপক্ষে প্রচারের সুযোগ পাব। আমীরুল মু'মেনীনের ইচ্ছে সুলায়মান ও তাঁর সাথীদের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি।

যুবায়র বললেন- আমিরুল মু'মেনীনের ধারণাই ঠিক। আল্লাহ আমাদের জন্য ভাল সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আপনাকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত মনে করি যে, আপনি সালিহ ও সুলায়মান সম্বন্ধে যেন ভুল ধারণা না করেন। রাস্তায় আপনার হাতে তার পরাজয় একটা আকস্মিক ব্যাপার। তারা উভয়ে বর্শা চালনায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তা সত্ত্বেও আমি প্রস্তুত।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম বললেন- নিজেদের বড়াই করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হবেন। আমীরুল মু'মেনীন আমাদেরকে তাঁর শ্রেষ্ঠ [illegible] দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

আপাদমস্তক দীর্ঘ এক দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে সুলায়মান ইবন আবদিল মালিক বর্ম

ও শিরস্ত্রাণ পরে তাঁর সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন- আমাকে সাধারণ পোশাকেই ভাল দেখায় না যোদ্ধার পোশাকে?

সালিহ উত্তর দিল- আল্লাহ আপনাকে এমন সুন্দর চেহারা দিয়েছেন যে কোন পোশাকেই তা সুন্দর দেখায়।

সুলায়মান আয়নার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন এবং একটু ভেবে বললেন- সে বালকের চেহারা দেখে আমার ঈর্ষা হয়েছিল। সে নিশ্চয় প্রদর্শনী দেখতে আসবে। তোমরা কেউ তাকে পেলে নিশ্চয় আমার কাছে নিয়ে আসবে। সে একজন উদীয়মান সৈনিক। তাকে আমার কাছে রাখতে চাই।

সালিহের মনে হচ্ছিল তার বিক্ষত শিরার উপর অস্ত্র চালান হচ্ছে। সে বলল- আমাকে আর লজ্জা দেবেন না। সে সময় অসির উপর আমার মুষ্ঠি শক্ত করে ধরা ছিল না। আর আমি কল্পনাও করতে পারিনি সে আমার বেপরোয়া অবস্থার সুবিধা নেবে।

সুলায়মান বললেন- যে যোদ্ধা প্রতিদ্বন্দ্বিকে দুর্বল মনে করে, তাকে পরাজয় বরণ করতেই হয়। যা হোক সেটা তোমার পক্ষে ভাল শিক্ষা হয়েছে। আচ্ছা এবার বল দেখি আজ আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে কেউ আসবে কি না?

সালিহ বলে- আমার মনে হয় না কেউ আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে সাহস করবে। গত বছর বর্শা চালনায় সমস্ত প্রসিদ্ধ যোদ্ধাই আপনার নৈপুণ্যের কাছে নতি স্বীকার করেছিল।

কিন্তু আমীরুল মু'মেনীন আমার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না।

তার একমাত্র কারণ আপনি তাঁর ভাই। তিনি এও জানেন আপনার খ্যাতি প্রতিপত্তি তাঁর পুত্রের যৌবরাজ্যের পথে বাধা সৃষ্টি করবে। কিন্তু লোকের মনে আপনি যে স্থান দখল করেছেন, তা আর কেউ পারেনি।

সুলায়মান বললেন- কিন্তু হাজ্জাজ ইবন ইউসুফই আমার পথের সবচেয়ে বড় কাঁটা। ইরাকে তার প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য সে চেষ্টা করছে, যেন আমার ভাইয়ের পরে ভ্রাতুষ্পুত্র খলীফা হয়।

সালিহ বলে, আমার ভ্রাতৃহন্তাকে আল্লাহ ধ্বংস করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তার এ সাধ কখনো পূর্ণ হবে না। লোকের মনে প্রভাব বিস্তার করার জন্য আপনার যেসব গুণ রয়েছে, তা আপনার ভাইয়েরও নেই, অন্য কারো নেই। গত বছর যুদ্ধ বিদ্যার প্রদর্শনীতে নাম করায় আপনার পথ পরিষ্কার হয়ে গেছে। খিলাফতের ব্যাপারে আপনার দাবী উপেক্ষা করা জনমত কিছুতেই সহ্য করবে না।

এক দাস এসে খবর দিল, অশ্ব প্রস্তুত। সালিহ বলল- আমার এখন যাওয়া উচিত। প্রদর্শনী এখন শুরু হবে।

সৈনিক ও রাজকুমার

॥ এক ॥

অন্ধকার যুগেও আরবগণ তীর চালনা, অসি যুদ্ধ ও ঘোড়দৌড়ে অসাধারণ নৈপুণ্য অর্জন করাকে জীবনের শ্রেষ্ঠতম কর্তব্য মনে করত। নেতৃত্ব, সম্মান, খ্যাতি ও প্রতিপত্তির এটাই ছিল শ্রেষ্ঠ কষ্টি পাথর। মরুবাসীদের সভায় যে কবি তীরের শাঁ শাঁ শব্দ ও অসির ঝণাৎকারকে কল্পনার সাহায্যে সব চাইতে ভালভাবে বর্ণনা করতে পারত, তাকেই শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান দেওয়া হত। যাকে মরুবাসী তরুণী প্রিয়ার হাসির চেয়ে বিদ্যুৎগতি অশ্ব-ক্ষুরের শব্দ অধিকতর অভিভূত করতো, যার চোখে ধাবমান ও ধূলি-মলিন অশ্বারোহীর ক্ষণিক দৃষ্টি মানসীর অভিসার গতির চেয়ে বেশী কমনীয় প্রতিভাত হত, সেই ছিল লোকপ্রিয় কবি।

আরবদের ব্যক্তিগত বীরত্বকে ইসলাম মুজাহিদ বাহিনীর অজেয় শক্তিতে পরিণত করে। রোম ও ইরানের যুদ্ধ আরবদের যুদ্ধ-বিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধন করে। মহাবীর খালিদের আমলে সারিবন্দী ও চলাচল ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন প্রচলিত হয়। বর্ম পরিধানের প্রথা আরবদের মধ্যে পূর্বেও ছিল কিন্তু রোম যুদ্ধের সময় বর্ম ও শিরস্ত্রাণ জঙ্গী পোশাকের অপরিহার্য অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়।

দুর্গ প্রাচীর রক্ষিত শহরের অবরোধকালে এমন এক যন্ত্রের প্রয়োজন অনুভূত হয়, যার দ্বারা প্রস্তর-প্রাচীর চূর্ণ করা সম্ভব। এর থেকে আবিষ্কৃত হয় মিনজানীক বা প্রস্তর-নিক্ষেপক যন্ত্র। কাঠের তৈরী এ যন্ত্রের সাহায্যে গুরুভার প্রস্তরখন্ড বেশ দূরে নিক্ষেপ করা হত। হানাদার বাহিনী অবরুদ্ধ দুর্গের বল্লমের পাল্লা থেকে দূরে থেকে এ যন্ত্রের সাহায্যে দুর্গ প্রাচীরের উপর পাথর বর্ষণ সক্ষম হত। ধনুক থেকে এর প্রথম পরিকল্পনা গৃহীত হয়। যুদ্ধবিদ্যা বিশারদগণের কয়েক বছরের চেষ্টায় এ যন্ত্রটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অস্ত্রে পরিণত হয়।

দূর্গ রক্ষিত নগর পরাভূত করার জন্য আর একটি যন্ত্রের ব্যবহার বহুল প্রচলন করেন। এর নাম 'দববাবা'। এটা কাষ্ঠ নির্মিত একটি সচল ক্ষুদ্র দূর্গ বিশেষ, যার নীচে চাকা লাগান থাকত। কিছুসংখ্যক সৈনিক শক্ত কাঠের তক্তার আড়ালে আসন নিত এবং অপর কতিপয় সৈনিক তাকে ঠেলে নগর প্রাচীরের সাথে সংলগ্ন করে দিত। পদাতিক সৈন্য সেটার আড়ালে অগ্রসর হত এবং সেটার সাহায্যে নগরপ্রাচীরের উপর আরোহণ করত।

মুক্ত মাঠে পদাতিক সৈন্যের মত আরব অশ্বরোহীগণও প্রথম প্রথম বল্লমের চেয়ে তলোয়ার ব্যবহারই বেশী অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু বর্ম পরিহিত সৈন্যের বিরুদ্ধে বল্লমের

সার্থকতা তারা অচিরেই অনুভব করে। কয়েক বছরের মধ্যে সারা আরবদেশে তীর চালনা ও অসি যুদ্ধের ন্যায় বর্শা নিক্ষেপের প্রথা জনপ্রিয় হয়ে উঠে। রোমের প্রতিবেশী হিসেবে শামের মুসলমানের উপর তাদের প্রভাব বেশি ছিল। সেখানে ধীরে ধীরে বল্লম নিক্ষেপ অসি যুদ্ধের চেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করে।

ত্যাজী ঘোড়া এবং আরব অশ্বরোহী সারা দুনিয়ার বিখ্যাত। কাজেই যুদ্ধবিদ্যার অন্যান্য শাখার ন্যায় বল্লম নিক্ষেপেও তারা প্রতিবেশী রাজ্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে।

॥ দুই ॥

দামেস্কের শহরতলীতে এক মুক্ত মাঠে প্রায় প্রতিদিনই বর্শা নিক্ষেপের অনুশীলন চলত। বর্শা নিক্ষেপে গ্রীকদের প্রাচীন প্রথা জনপ্রিয় হচ্ছিল।

বীরত্ব প্রদর্শন প্রার্থী বর্ম পরিহিত অশ্বারোহী মুখোমুখী হয়ে পরস্পর থেকে একটু দূরে দাঁড়াত। বিপদ আশংকা পরিহার করবার জন্য বর্ম শিরস্ত্রাণ ও চর্তুমুখীর ব্যবহার সত্ত্বেও ভোঁতা বল্লম ব্যবহৃত হত। কিংবা তার ফলা লৌহ ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা তৈরী হত। সালিস মাঝখানে নিশান নিয়ে দাঁড়াত। তার ইঙ্গিতে বিপরীত দিক থেকে অশ্বরোহী পূর্ণ বেগে অশ্বচালনা করে প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণ করত। যে অশ্বরোহী প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রমণ এড়িয়ে তাকে আঘাত করতে সক্ষম হত, তাকেই বিজয়ী ঘোষণা করা হত। বিজিত অশ্বরোহী ভোঁতা বল্লমের আঘাতে আহত হত না। কিন্তু অনেক সময় বুকে আঘাতের ফলে বা প্রতিদ্বন্দ্বির বল্লমের চোটে ভারসাম্য হারিয়ে ঘোড়া হতে পড়ে গিয়ে দর্শকের হাস্যের খোরাক যোগাত।

অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও প্রদর্শনীতে যোগ দেয়ার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে লোক এসেছিল। বিস্তীর্ণ ময়দানের চতুর্দিকে দর্শকের ভীড় ছিল। ওলীদ ইবন্ আব্দিল মালিক এক কুরসীতে আসীন ছিলেন। তাঁর ডানে বামে দরবারের বড় বড় রাজকর্মচারী বসেছিলেন। অন্যদিকে দর্শক শ্রেণীর সম্মুখে সুলায়মান ইবন্ আব্দিল মালিক তাঁর নিজস্ব গুণগ্রাহী পরিবেষ্টিত হয়ে আসীন ছিলেন।

প্রদর্শনী শুরু হল। অস্ত্রশস্ত্র বিশেষজ্ঞগণ মিনজানীক ও দব্বাবার উন্নততর মডেল পেশ করে পুরস্কার লাভ করলেন। তীরন্দাজ ও অসি যোদ্ধারা স্ব স্ব নৈপুণ্য দেখিয়ে দর্শকদের বাহবা লাভ করলেন।

সুলায়মানের তিনজন সঙ্গী অসি-যুদ্ধ ও তীরন্দাজীতে যোগ দিল। তাদের একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ বলে সাব্যস্ত হল। তার দ্বিতীয় সঙ্গী সালিহ্ অসি-যুদ্ধে পরপর দামিস্কের পাঁচজন বিখ্যাত প্রতিদ্বন্দ্বিকে পরাজিত করে এই প্রতীক্ষায় ছিল যে, খলীফা তাকে ডেকে নিজের পাশে আসন দেবেন। কিন্তু হঠাৎ এক তরুণ ময়দানে এসে

তাকে দ্বন্দ্বে আহবান করে বসল। দীর্ঘ এবং প্রবল প্রতিযোগিতার পর সালিহের তলোয়ার কেড়ে নিল।

এ যুবক ছিলেন যুবায়র। দর্শকগণ অগ্রসর হয়ে সালিহের বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখতে ও তাঁর হস্ত মর্দন করতে অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে ভীড় জমাল। সালিহ ক্রোধ ও লজ্জায় ঠোঁট কামড়াতে লাগল।

ওলীদ দাঁড়িয়ে অগ্রসর হলেন। যুবায়রের হস্ত মর্দন করে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। তারপর সালিহের দিকে তাকিয়ে বললেন- সালিহ, তুমি ক্রুদ্ধ না হলে হয়ত পরাজিত হতে না। তা সত্ত্বেও এ যুবকের ন্যায় তোমাকেও আমি পুরস্কারের যোগ্য মনে করি।

সর্বশেষে বল্লম নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা শুরু হল। প্রাথমিক প্রতিযোগিতার পর আটজন শ্রেষ্ঠ বল্লমধারী নির্বাচিত হল এবং শেষ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল। প্রতিযোগীদের সংখ্যা যতই কমে আসল দর্শকদের উৎসাহ উত্তেজনা ততই বৃদ্ধি পেতে লাগল। অবশেষে একদিকে একজন এবং অপরদিকে দু'জন বল্লমধারী মাত্র রয়ে গেল। একক বল্লমধারী অপরাপর তার উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভূমিসাৎ করে স্বীয় শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলল। দর্শকগণ তাঁকে চিনতে পেরে প্রশংসা ও অভিনন্দনের গগন-বিদারী কলরোল উত্থাপন করল। এ যুবক ছিল এক গ্রীক নও মুসলিম। তার নাম আইয়ুব। আইয়ুব বিজয়ীভাবে বর্শা উঁচিয়ে আখড়ার চারদিকে ঘুরে আবার ময়দানে এসে দাঁড়াল।

ঘোষক হাঁক দিল- এ যুবকের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায় এমন কেউ আছে?

দর্শককের দৃষ্টি সুলায়মান ইবন আবদিল মালিকের উপর নিবদ্ধ। সুলায়মান শিরস্ত্রাণ পরিধান করে তাঁর পার্শ্বে দন্ডায়মান একটি সুন্দর গাঢ় বাদামী রঙের ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। সূর্যালোকে তাঁর বর্ম ঝকঝক্ করছিল। মৃদু বাতাসে তাঁর গ্রীক প্রতিদ্বন্দ্বীকে শিরস্ত্রাণের উপর সবুজ রেশমের গুচ্ছ আন্দোলিত হচ্ছিল।

সুলায়মান ও আইয়ুব পরস্পরেরর মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ালেন। দর্শকগণ নিঃশ্বাস বন্ধ করে সালিসের পতাকার দিকে চেয়ে ইঙ্গিতের অপেক্ষা করছিল। সালিস সংকেত দিয়ে পাশে সরে দাঁড়াল। বিদ্যুৎগতি অশ্ব পরস্পরের দিকে ধাবিত হল। আরোহীরা পরস্পরের নিকট পৌঁছে আত্মরক্ষা করে প্রতিদ্বন্দ্বীকে আঘাত করতে প্রস্তুত হলেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ দেয়ার আগে সুলায়মান প্রতিপক্ষের সমস্ত দাঁও পর্যবেক্ষণ করে আত্মরক্ষার উপায় ভেবে রেখেছিলেন। কাজেই আয়ুবের আক্রমণ ব্যর্থ হল এবং সুলায়মানের বল্লম আইয়ুবের শিরস্ত্রাণের উপর এক প্রচন্ড আঘাতের চিহ্ন সৃষ্টি করল।

সালিস সুলায়মানকে বিজয়ী ঘোষণা করল। ওলীদ উঠে ভ্রাতাকে অভিনন্দন জানালেন এবং আইয়ুবকে উৎসাহ দিলেন।

সুলায়মান শিরস্ত্রাণ নামিয়ে বিজয়ী বেশে দর্শকদের দিকে তাকালেন এবং প্রথমত আখড়ার চতুর্দিকে পরিক্রম করে আবার ময়দানে এসে দাঁড়ালেন।

॥ তিন ॥

ঘোষক তিনবার হেঁকে বলল- এমন কেউ আছে, যে সুলায়মান ইবন্ আবদিল মালিকের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সাহসী? দর্শকগণ আগেই জানত এবার প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেছে। তারা আমীরুল মু'মেনীনের আসন ত্যাগের অপেক্ষা করছিল মাত্র। কিন্তু যখন এক শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে জনৈক আরোহী বল্লম হাতে ময়দানে এসে দাঁড়াল, তখন তাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। সুলায়মান ইবন্ আবদিল মালিকের সাথে এক বল্লমধারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অগ্রসর হয়েছে, দর্শকদের বিস্ময় সেজন্য ছিল না; বরং তারা এ কারণে বিস্মিত হয়েছিল এ অপরিচিত অশ্বারোহীর শরীরে না ছিল বর্ম, না ছিল চর্তুমুখী ঢাল। তার পরিধানে ছিল কালো রংগের আঁটা পোশাক। মাথায় শিরস্ত্রাণের পরিবর্তে ছিল শ্বেত পাগড়ী এবং চক্ষু ছাড়া বাকী চেহারা কালো পর্দায় ঢাকা ছিল।

এরূপ প্রতিযোগিতায় শুধু তারাই বর্ম ছাড়া যোগ দেয়, যারা প্রতিপক্ষের হীনতা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসী। কিন্তু সুলায়মান ছিলেন সেদিনকার বিজয়ী বীর। তাঁর বিরুদ্ধে বর্ম ও শিরস্ত্রাণ ব্যতীত প্রতিযোগিতায় অগ্রসর অশ্বারোহীর বীরত্ব দেখে প্রভাবিত হওয়ার পরিবর্তে তাঁর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে তারা সন্দিহান হয়েছিল।

ওলীদ ও যুবায়র ছাড়া আর কেউ জানতেন না এ বীর কে। কিন্তু তাঁর এরূপ অসম সাহস দেখে ওলীদও বিচলিত হয়েছিলেন। তিনি যুবায়রের কানের কাছে মুখ নিয়ে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন- এ মুহম্মদ ইবন্ কাসিম, না অন্য কেউ?

যুবায়র উত্তর দিলেন- সেই বটে।

কিন্তু সে সুলায়মানকে কী মনে করে? তার পঞ্জর যদি লৌহ নির্মিত না হয়ে থাকে, তাহলে আমার ভয় হয় কাঠের ভোঁতা ফলকও তার পক্ষে বল্লমের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগের চেয়ে কম বিপজ্জনক প্রমাণিত হবে না। তুমি যাও তাকে বুঝিয়ে বল।

যুবায়র বলেন- আমীরুল মু'মেনীন, আমি তাকে বুঝিয়েছি। সে নিজেও এ বিপদ সম্বন্ধে সচেতন। কিন্তু সে বলে এ অবস্থায় সে যদি জয়লাভ করতে পারে তবে যুবকদের উপর উত্তম প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে।

সিন্ধুর অবস্থা বলে তাদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করার সুযোগ পাওয়া যাবে। বর্ম ছাড়া অশ্বারোহী অধিকতর কর্মতৎপর থাকে, এটাও তার মত।

যুবায়রের উত্তরে ওলীদ নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। তিনি উঠে নিজেই মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের দিকে অগ্রসর হলেন। দর্শকগণও অতিশয় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে লাগল।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম সুলায়মানের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ওলীদ কাছে পৌঁছে তাঁকে ডেকে বললেন- বৎস, আমি তোমার বীরত্ব স্বীকার করি। কিন্তু এটা বীরত্ব নয়, নির্বুদ্ধিতা। তুমি বর্ম ও শিরস্ত্রাণ ছাড়াই আরবের শ্রেষ্ঠ বল্লমধারীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছ। তিনি যদি এটাকে তাঁর প্রতি অবজ্ঞা বলে মনে করেন, তবে আমার ভয় হয় তুমি দ্বিতীয়বার ঘোড়ায় চড়ার উপযোগী থাকবে না।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম বললেন- আমীরুল মু'মেনীন, আল্লাহই জানেন আত্মম্ভরিতা আমার উদ্দেশ্য নয়। এক সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এ বিপদের সম্মুখীন হচ্ছি। তাছাড়া এটা খুব বিপদও নয়। আমার মনে হয় বর্ম পরে অশ্বারোহী খুব চটপটে থাকে না।

কিন্তু তোমার তৎপরতা যদি তোমার পঞ্জর রক্ষা করতে না পারে?

তাহলেও আমার দুঃখ থাকবে না। আমার অস্থির পঞ্জরের চেয়ে আমি সেই বালিকার জীবন বেশী মূল্যবান মনে করি, যার বুকে আমাদের নিষ্ঠুর শত্রুর শর দুষ্ট ক্ষত সৃষ্টি করেছে। তার সাহায্য করা যদি আল্লাহর অভিপ্রেত হয় তা'হলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি আজ দামেস্কবাসীর চোখে আমাকে উপহাসের পাত্র হতে দেবেন না। সম্ভবতঃ আমি জয়লাভ করার পর এই লোকারণ্যে তার বাণী পাঠ করে শুনাতে পারব। ব্যক্তিগত প্রচারের দ্বারা যে কাজ অনেক মাসে সম্ভব হবে না, তা আজ কয়েক মুহূর্তে সম্পন্ন হবে। আপনি আমাকে অনুমতি দিন এবং দু'আ করুন- যেন আল্লাহ আমার সহায় হোন।

ওলীদ বললেন- তুমি অন্ততঃ মাথায় শিরস্ত্রাণ পরে নিতে?

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম জবাব দিলেন- আপনি রাগ করবেন না। কিন্তু যে যোদ্ধা বল্লমের আক্রমণ মস্তক দ্বারা রোধ করে, তাকে আমি কৃপার পাত্র মনে করি। আমার মাথার নিরাপত্তার জন্য পাগড়িই যথেষ্ট।

ওলীদ বললেন- বৎস, আজ যদি তুমি সুলায়মানকে হারাতে পার তবে ইনশাআল্লাহ সিন্ধুর হানাদার বাহিনীর পতাকা তোমার হাতেই ন্যস্ত হবে।

ওলীদ ফিরে চললেন। ঘোষককে কি কথা বলে আসন গ্রহণ করলেন।

অন্যদিকে সুলায়মানের কাছে কয়েকজন দর্শক দাঁড়িয়েছিল। সালিহ অগ্রসর হয়ে সুলায়মানকে বলল- আমীরুল মু'মেনীন আপনাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চান। আপনি সতর্ক থাকবেন।

সুলায়মান জিজ্ঞেস করলেন- কিন্তু এ উন্মাদটি কে?

আমি জানি না। কিন্তু সে যে-ই হোক আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে আর ঘোড়ায় চড়বে না।

ঘোষক উচ্চ কণ্ঠে বলল- উপস্থিত দর্শকবৃন্দ, এখন সুলায়মান ইবন্ আব্দিল মালিক এবং মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের প্রতিযোগিতা হবে। কালো পরিচ্ছদধারী তরুণের বয়স সতর বৎসরের কম।

দর্শকবৃন্দ অধিকতর চমৎকৃত হয়ে কালো বেশধারী অশ্বারোহীর দিকে তাকাতে লাগল। সালিস সংকেত করার সাথে সাথেই প্রতিদ্বন্দ্বীরা পূর্ণ বেগে পরস্পরকে আক্রমণ করলেন। দর্শকবৃন্দ বিশ্বভুবন ভুলে নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল। উভয় অশ্বারোহী প্রতিপক্ষের আক্রমণ এড়িয়ে চলে গেলেন। জনসাধারণ তুমুল ধ্বনি তুলল।

তরুণ ও যুবক সম্প্রদায় বহুক্ষণ পর্যন্ত মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের প্রশংসাসূচক জয়ধ্বনিত করে গেল। বয়স্করা বলতে লাগলেন, এ বালক অত্যন্ত দক্ষ ও তৎপর বটে,

কিন্তু সুলায়মান ইবন্ আবদিল মালিকের সাথে এর প্রতিযোগিতা জেনে-শুনেই ওর খাতির করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার যদি সে বেঁচে যায় সে হবে এক মু'জিযা। কোথায় সতর বছরের অপোগন্ড, আর কোথায় সুলায়মানের মত অভিজ্ঞ যোদ্ধা।

যুব-সম্প্রদায় কিন্তু আকাশ মাথায় তুলে নিয়েছিল। সুলায়মানের পরিবর্তে এ সতর বছরের বিদেশীই এখন তাদের একমাত্র বীর নায়কে পরিণত হয়েছিল। তারা তাঁর বিরুদ্ধে কাউকে টু শব্দটি পর্যন্ত করতে দিতে নারাজ। দর্শকদের তর্ক কোথাও হাতাহাতিতে পরিণত হল।

প্রথমত বল্লমধারীদের আর এক সুযোগ দেয়া হল। উভয়ে আবার প্রতিপক্ষরূপে দন্ডায়মান হলেন। বালক ও যুবক-সম্প্রদায় দৌড়ে সেদিকে যাচ্ছিল, সেদিকে ছিলেন তাদের আদর্শ বীর। সকলের দৃষ্টি সে কাপড়ে ঢাকা মুখখানি দেখার জন্য উৎসুক হয়েছিল। সালিস দর্শকদের ঠেলে পেছনে হটিয়ে দিল এবং স্বস্থানে ফিরে দাঁড়াল। সংকেতের পরেই দর্শকগণ আর একবার ময়দানে ধুলি উড়তে দেখতে পেল। মুহূর্তের জন্য আবার পূর্ণ নীরবতা ফিরে এল।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম আবার হঠাৎ একদিকে ঝুঁকে সুলায়মানের বল্লমের আঘাত থেকে বেঁচে গেলেন। সুলায়মানও বামদিকে ঝুঁকে প্রতিপক্ষের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ততোধিক তড়িৎগতিতে মুহম্মদ ইবন্ কাসিম তাঁর বল্লমের গতি মুখ বদলে দিলেন যাতে সুলায়মানের দক্ষিন পঞ্জরে আঘাত লেগে তাঁকে আরো বামে ঠেলে দিল। সুলায়মান ভারসাম্য হারিয়ে নীচে পড়ে গিয়েই আবার উঠে দাঁড়ালেন। অস্থি-পঞ্জরে হাত রেখে তিনি অত্যন্ত অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন।

চতুর্দিক থেকে গগন-বিদারী তুমুল জয়ধ্বনি উঠতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে মুহম্মদ ইবন্ কাসিম অশ্বের মোড় ঘুরিয়ে সুলায়মানের কাছে এসে অবতরণ করলেন। তিনি করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর প্রসারিত হস্ত গ্রহণ না করেই সুলায়মান দ্রুতবেগে একদিকে চম্পট দিলেন।

মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার দর্শক মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের চারদিকে জড় হল। গ্রীক অশ্বারোহী আইয়ুব অগ্রসর হয়ে মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের হাত থেকে ঘোড়ার লাগাম তুলে নিল এবং বলল- আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এখন যদি কোন বাধা না থাকে, তবে আপনার মুখ থেকে পরদা সরিয়ে নিন। আমরা সবাই আপনার চেহারা দেখবার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছি।

॥ চার ॥

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম পরদা খুলে ফেললেন। তরুণ অশ্বারোহীর চেহারা দর্শকদের প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশী তেজোব্যঞ্জক ও গম্ভীর ছিল। তাঁর সুন্দর কালো নয়ন থেকে ঔদ্ধত্যের পরিবর্তে পবিত্রতা ঠিকরে পড়ছিল। লোকের জয়ধ্বনি ও আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি

সত্ত্বেও তাঁর অবিচলিত স্থৈর্য প্রমাণ করছিল বৃহত্তম বিজয়ও তাঁকে বিহ্বল করতে সক্ষম নয়। যুব-সম্প্রদায় তাঁকে কাঁধে তুলে দামেস্কের পথে পথে প্রকান্ড মিছিল নিয়ে যাবার অভিপ্রায়ে এসেছিল। তারা অবাক বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আইয়ুব এক আরব বন্ধুকে বলল- আমি সত্যি বলছি গ্রীসের পাহলোয়ানদের মধ্যেও আমি এরূপ যুগপৎ সুন্দর, পবিত্র, সরল ও সম্ভ্রমপূর্ণ চেহারা দেখিনি!

এক আরব জিজ্ঞেস করল- আপনি কোথা থেকে এসেছেন?

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম জবাব দিলেন- বসরা থেকে।

শুনে কয়েকজন জিদ করতে লাগল- আপনি এখানেই থেকে যান।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন- আমি দামেস্কবাসীর কাছে এক জরুরী বাণী নিয়ে এসেছি। আমাকে শীঘ্রই ফিরে যেতে হবে। আপনারা নীরবে আমার কথাটা শুনলে আমি বিশেষ বাধিত হব।

আরো অধিকসংখ্যক লোক এখন মুহম্মদ ইবন কাসিমের কাছে জমা হচ্ছিল। ওলীদ ইবন্ আব্দিল মালিক রাজকর্মচারীদের সমভিব্যহারে অগ্রসর হলেন। আমীরুল মু'মেনীনকে দেখে লোক সরে দাঁড়াল। ওলীদ মুহম্মদ ইবন্ কাসিমকে বললেন- আমার মনে হয় এখনি শ্রেষ্ঠ সুযোগ। তুমি ঘোড়ায় চড়ে দাও। তা'হলে লোকে তোমার চেহারা দেখতে পাবে।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। লোকের কানে কানে সংবাদ পৌঁছে গেল কালো পোশাকধারী যুবক এক গুরুতর বাণী শোনাতে চায়। যারা সামনের কাতারে ছিল, তারা পরপর মাটিতে বসে পড়ল।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম সংক্ষেপে লংকার মুসলমান বিধবা ও এতিম শিশুদের বেদনাদায়ক কাহিনী বর্ণনা করলেন। তারপর যুবায়রের কাছ থেকে রুমাল নিয়ে নাহীদের চিঠি পড়ে শোনালেন। বিধবা ও এতিম শিশুদের কাহিনী শোনার পর জনসাধারণের মনে নাহীদের চিঠি তীর ও ছুরির কাজ করছিল। চিঠি শোনাবার পর মুহম্মদ ইবন্ কাসিম রুমালখানা যুবায়রকে ফেরত দিয়ে উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন ঃ-

"ইসলামের জন্য উৎসর্গিত প্রাণ ভ্রাতৃবৃন্দ, আমি তোমাদের অনেকের চোখেই অশ্রু দেখছি। কিন্তু মনে রেখ, উৎপীড়িত মানবতার অত্যাচারের কলংক অশ্রু দ্বারা ধৌত হয় না, হয় রক্তের দ্বারা। অত্যাচার ও যথেচ্ছাচারের যে অগ্নি সিন্ধুর বিস্তীর্ণ রাজ্যে জ্বলছে, তার সামান্য আঁচমাত্র আমরা এই দূর দেশে অনুভব করছি এবং তাও শুধু এই কারণে যে আমাদের কতিপয় ভাই, মা ও বোন সেই আগুনে পুড়ে মরছেন। কিন্তু যে লক্ষ লক্ষ অসহায় লোক বহুকাল থেকে সিন্ধুর যথেচ্ছাচারে শৃংখলে আবদ্ধ রয়েছে, তাদের অবস্থা আমাদের জানা নেই। যে তীর এক মুসলিম বালিকার বুকে বিদ্ধ হয়েছে, তা সেই লক্ষ লক্ষ তীরের একটি, যা সিন্ধুর উদ্ধত ও অত্যাচারী শাসনকর্তা স্বীয় অসহায় প্রজাদের বুক লক্ষ্য করে চালিয়ে থাকে। আজ যদি সিন্ধুতে আমাদের ভাইবোনেরা বন্দীশালার

অন্ধকার কুঠরীতে মুসলিম মুজাহিদগণের অশ্ব-ক্ষুরের শব্দ শোনার প্রতীক্ষা করে থাকেন; আজ যদি তাঁরা আল্লাহু আকবর ধ্বনি শোনার প্রতীক্ষায় থাকেন, যা এখনো দেবল দুর্গের শক্ত প্রাচীরে ভূমিকম্প সংগঠনের শক্তি রাখে, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস সিন্ধুর যে জনসাধারণ বছরের পর বছর অত্যাচার ও যথেচ্ছাচারের অগ্নিতে ভস্ম হচ্ছে, তারা পশ্চিম দিক চক্রবালে আশীষরূপী সেই বীরদের প্রতীক্ষা করছে, যা কয়েক বছর পূর্বে ইরানের অগ্নিকুন্ডকে নিভিয়ে দিয়েছিল। তাদের বিক্ষত হৃদয় থেকে প্রার্থনা বের হচ্ছে- হায়, যে মুজাহিদগণ স্বীয় রক্ত দান করে আল্লাহর দুনিয়ায় সাম্য, ন্যায়, সুবিচার ও শান্তির চারাগাছে পানি বর্ষণ করেছেন, তারা যদি সিন্ধুর শাসনকর্তার হাত থেকে অত্যাচারের অসি কেড়ে নিতেন এবং তাঁদের অশ্ব যদি সেই কন্টকময় ঝোপসমূহকে মাড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিত যার সাথে মানবতা ও স্বাধীনতার অঞ্চল জড়িয়ে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে।

মুসলমানগণ, এ সংবাদ আমাদের জন্য মন্দও বটে ভালও বটে। মন্দ এ জন্য যে, আমাদের ভাইবোনদের অবস্থা শুনে আমাদের কষ্ট হয়েছে। ভাল এ জন্য যে, ন্যায় ও সত্যের তলোয়ারের সামনে কায়সার ও কিসরার মত আর এক উদ্ধত শক্তি মাথা তুলেছে। এস আমরা এদেরকে জানিয়ে দেই আমাদের অসি এখনো ভোঁতা হয়নি।

গত কয়েক বছর যাবত আমাদের আভ্যন্তরীণ মতবিরোধ আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। যেসব রাজ্য আমাদের বাপ-দাদার নামে কম্পিত হত, আজ আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে।

উৎপীড়িত বালিকার এ পত্রখানা যদি তোমাদের শিরায় উত্তাপ সৃষ্টি করতে অক্ষম হয়ে থাকবে, তবে মনে রেখ যে ভূ-পৃষ্ঠে আমাদের মহত্ত্ব ও উন্নতির দিন শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু আমি নিরাশ হইনি। তোমাদের কারো চেহারায় আমি নৈরাশ্যের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না। আমি শুধু এটুকু বলব যে, এক বীর জাতি ঘুমিয়ে আছে। আর সেই জাতিরই এক আত্মাভিমানী কন্যা উচ্চস্বরে ডেকে বলছে- ইসলামের আত্মাভিমানী সন্তানগণ, ভূ-পৃষ্ঠের প্রত্যেক বধূ ও কন্যার সতীত্ব রক্ষার জন্য তোমাদের সৃষ্টি। আর আজ তোমাদের এ অবস্থা হয়েছে যে তোমাদের নিজেদের বধূ ও কন্যাদেরকে পায়ে শৃংখল লাগিয়ে ব্রাহ্মণবাদের বাজারে টানা হেঁচড়া করা হচ্ছে।"

প্রবল উত্তেজনায় অভিভূত হয়ে জনসাধারণ ওলীদ ইবন্ আবদিল মালিকের দিকে তাকাচ্ছিল। একজন বয়স্ক লোক অগ্রসর হয়ে বলল- যদি এ সংবাদ আমাদের আগে আমীরুল মু'মেনীনের কাছে পৌঁছে থাকে তবে আমরা আশ্চর্য হচ্ছি তিনি কেন এখনো সিন্ধুর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেননি।

জনতা অগ্নি-গর্ভ পর্বতের ন্যায় গম্ভীর হয়ে বসেছিল। চতুর্দিকে 'জিহাদ, জিহাদ' বলে গগন-বিদারী ধ্বনি গর্জে উঠল। মুহম্মদ ইবন কাসিম উভয় হাত তুলে লোকদের নীরব হতে ইঙ্গিত করে পুনরায় বক্তৃতা শুরু করলেন ঃ-

"যারা সাময়িক উত্তেজনার বশে কয়েকটি ধ্বনি তুলে নীরব হয়ে যায় আমি তাদের কিছুই বলতে চাই না। জীবন্ত জাতি ধ্বনি তুলে তোমরা সহস্র মাইল দূরে অবস্থিত

প্রতীক্ষমান দৃষ্টিকে আনন্দ দিতে পারবে না, যা তোমাদের তলোয়ারের চাকচিক্য দেখবার জন্য অধীর ও উৎকণ্ঠিত। আমিরুল মু'মেনীন স্বীয় দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত। কিন্তু এ পর্যন্ত তিনি শুধু তোমাদের ধ্বনিই শুনেছেন। হায়, এর সাথে যদি তোমাদের অসিও কোষমুক্ত হওয়ার জন্য অধীর হয়ে উঠত, যার অগ্রভাগ দ্বারা তোমাদের বাপ-দাদারা মুসলিম প্রতিপত্তির ইতিহাস লিখে গেছেন। আমি দেখতে চাই কাদিসিয়া ও আজনাদায়নের মুজাহিদগণের বংশধরদের বুকে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস এখনো বাকী আছে কি-না। আমাদের সমস্ত সৈন্য তুর্কিস্তান, আফ্রিকা রণক্ষেত্রে ব্যস্ত রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে তরবারীর ব্যবহার জানে না? তোমরা সাহস কর তবে সিন্ধুর ময়দানে আমরা য়ারমুক ও দামেস্কের স্মৃতি পুনর্জীবিত করতে পারি। তোমাদের বাপ-দাদাদের মত আজ তোমাদের প্রমাণ করতে হবে প্রয়োজনের সময় প্রত্যেক মুসলমান যুদ্ধ করতে পারে। এখন তোমাদের তলোয়ার দেখেই আমি আমীরুল মু'মেনীনের কাছে জিহাদ ঘোষণার প্রার্থনা জানাব।"

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। তাঁর বক্তৃতা শেষ হতে না হতেই কয়েকজন বৃদ্ধ ও যুবক তরবারী তুলেছিল। দশ বছরের এক বালক বহু চেষ্টা-চরিত্র করে লোকের ভিড়ের মধ্যে পথ করে অগ্রসর হল। সে ওলীদের কাছে বলল- আমীরুল মু'মেনীন, আমি জিহাদে যাবার অনুমতি পাব কি? আমার জানা ছিল না। নইলে আমি তলোয়ার নিয়েই আসতাম। কিন্তু আমি এখুনি নিয়ে আসছি। আপনি একে কিছুক্ষণ ধরে রাখুন।

ওলীদ সস্নেহে তার মাথায় হাত রেখে বললেন- তোমাকে কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে।

বালক উৎসুক হয়ে মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের কাছে এসে দাঁড়াল। ওলীদের ইঙ্গিতে একটি কুরসী নিয়ে আসা হল। তিনি কুরসীর উপর দাঁড়িয়ে বললেন- এ যুবকের বক্তৃতার পর আমার আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই। আল্লাহর শোকর তোমাদের জাতীয় মর্যাদাবোধ এখনো জীবন্ত আছে। আমি সিন্ধুর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করছি।

জনতা আর একবার উচ্চ জয়ধ্বনি করে উঠল।

ওলীদ বক্তৃতার ধারা জারী রেখে বললেন- আমি চাই এক সপ্তাহের মধ্যেই দামেস্কের ফৌজ বসরা রওয়ানা হয়ে যাক। সেখানে মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের ন্যায় যদি আরো কয়েকজন যুবক থাকে, তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস কুফা ও বসরা থেকেও বহুসংখ্যক সৈন্য সংগৃহীত হবে। আপনাদের মধ্যে যাঁদের ঘোড়া নেই তাদের জন্য ঘোড়া এবং যাঁদের অস্ত্রশস্ত্র নেই তাদের অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হবে। সবচেয়ে বড় খবর যা আমি আপনাদের শোনাতে চাই, তা এই যে, আমি মুহম্মদ ইবন্ কাসিমকে সিন্ধু অভিযানকারী সৈন্য বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করছি। আমি এই উদীয়মান মুজাহিদের জন্য 'ইমাদুদ্দীন' উপাধী প্রস্তাব করছি। আপনারা দু'আ করুন ইনি যেন সত্য সত্যই 'ধর্মের স্তম্ভ' প্রমাণিত হন।

রাত্রির তৃতীয় যামে দামেস্কের মসজিদে তাহাজ্জুদের নামাযান্তে মুহম্মদ ইবন্ কাসিম অসীম ভক্তি ও মিনতির সাথে দু'আ করছিলেন- হে বিশ্বপালক, আমার দুর্বল কাঁধের উপর এক গুরুভার দায়িত্ব স্থাপিত হয়েছে। এ দায়িত্ব পালনের শক্তি আমাকে দান কর। আমার সঙ্গীদেরকে তাদের বংশগত মানসিক দৃঢ়তা ও স্থৈর্য প্রদান কর। হাশরের দিন রসূলের জন্য উৎসর্গিত-প্রাণ মুজাহিদগণের দলে আমাদের দৃষ্টি যেন লজ্জাবনত না হয়। আমাকে খালিদের দৃঢ়তা ও মুসান্নার ত্যাগ প্রদান কর। আমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত যেন তোমার ধর্মের গৌরব বর্ধনে ব্যয়িত হয়।

দু'আ সমাপ্ত হতেই যুবায়র ছাড়া আরো একজন লোক যিনি মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের দক্ষিণে বসেছিলেন, 'আমীন' বলে উঠলেন। উভয়ে তাঁর দিকে তাকালেন। তাঁর শ্বেত পোশাক ও উজ্জ্বল চেহারায় এক অসাধারণ আকর্ষণ ছিল। তিনি সরে এসে মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের পাশে বসলেন এবং স্নেহ ও বাৎসল্যের সাথে তাঁর দিকে তাকাতে তাকাতে বললেন-

তুমিই মুহম্মদ ইবন্ কাসিম?

জী হাঁ, আর আপনি?

আমি 'উমর ইবন্ আব্দিল আযীয।'

'উমর ইবন্ আব্দিল আযীযের মহত্ত্ব ও পবিত্রতা সম্বন্ধে মুহম্মদ ইবন্ কাসিম অনেক কিছু শুনেছিলেন। তিনি ভক্তিপূর্ণ নয়নে তাকিয়ে তাঁকে বললেন- আপনি আমার জন্য দু'আ করুন।

হযরত 'উমর ইবন্ আব্দিল আযীয বললেন- আল্লাহ তোমার সৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ করুন।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম বললেন- বহুদিন থেকে আমার সাধ ছিল আপনার আর্শীবাদ লাভ করব। আজ আপনার সাক্ষাৎ পাওয়া আমি দৈব আশীষ মনে করছি। আমাকে কিছু উপদেশ দিন।

'উমর ইবন্ আব্দিল আযীয বললেন- আমি তোমাকে শুধু এটুকু বলতে চাই যে, তোমার ন্যায় বীর এবং উদীয়মান সৈন্যাধ্যক্ষের নেতৃত্বে শত্রুর বিরুদ্ধে অসির অভিযান শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তুমি যদি জিহাদের সত্যকার আকর্ষণ নিয়ে সিন্ধুতে যাও, তাহলে সেখানে তোমার সদ্ব্যবহার ও কাজ দ্বারা তোমাকে প্রমাণ করতে হবে তোমরা সিন্ধুর লোককে দাস বানাতে যাওনি, বরং তাদেরকে অসত্যের শৃংখল থেকে মুক্ত করে নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করতে গিয়েছ। তাদেরকে তুমি বলবে তওহীদের গন্ডীতে পা রেখে মানব দুনিয়ার প্রত্যেক দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে। তুমি এমন এক দেশে যাচ্ছ, যেখানকার লোকেরা নীচ জাতের উপর উচ্চ শ্রেণীর লোকের আধিপত্যের জন্মগত অধিকার স্বীকার করে। সিন্ধুর যথেচ্ছাচারতন্ত্রের মূলোৎপাটিত হবার পর তোমরা যদি লোকের সামনে ইসলামী সাম্যের বাস্তব চিত্র স্থাপন করতে পার, তাহলে আমার দৃঢ়

বিশ্বাস তোমরা, তাদের হৃদয়ও জয় করতে সক্ষম হবে। আজ যারা তোমাদের শত্রু, কাল তারাই তোমাদের বন্ধু হবে।

মুসলমান বিধবা ও এতীমদের উপর সিন্ধু-রাজের অত্যাচারী-কাহিনী শুনে অনেক যুবক কেবল প্রতিশোধ নেবার অভিপ্রায়েই তোমার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু তাদের কাউকে পরাজিত শত্রুর উপর আক্রমণ করতে অনুমতি দেবে না। আল্লাহ অত্যাচারীদের কখনো পছন্দ করেন না। অত্যাচারীর হাত থেকে তার তরবারী কেড়ে নেবে, কিন্তু তার উপরও অত্যাচার করবে না। বরং সে অনুতাপ করলে তার অপরাধ মাফ করে দেবে। সে যদি আল্লাহর ধর্ম গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় তাকে বুকে তুলে নেবে। যদি আঘাতে পরিশ্রান্ত হয়ে কেউ তোমার আশ্রয় চায়, তার ক্ষতে মলম লাগাবে। আমাদের বিধবা ও এতিমদের উপর অত্যাচার হয়েছে। কিন্তু ওদের বিধনা ও এতিমদের মস্তকে তুমি স্নেহের হাত বুলাবে। একথা স্মরণ রেখো আল্লাহ প্রতিবেশী রাজ্যের উপর আরবদের রাজনৈতিক আধিপত্য চান না, বরং অধর্মের বিরুদ্ধে সত্য ধর্মের বিজয় চান। এ কাজ যদি আরবদের দ্বারা সম্পন্ন হয়, তবে তারা দুনিয়াতেও কৃতকার্য হবে, পরকালেও তাদের কল্যাণ হবে।

ফজরের নামাযের আযান শুনে উমর ইবন্ আব্দিল আযীয তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। নামাযের পর বিদায়কালে মুহম্মদ ইবন্ কাসিম বললেন- এখান থেকে যাত্রা করতে আমার আরো দিন পাঁচেক লাগবে। এ সুযোগে আপনার জ্ঞান ও মহত্বের দ্বারা আরো উপকৃত হতে পারলে আমি নিজে সৌভাগ্য মনে করব। কিন্তু দিবসের অধিকাংশ সময় নতুন সৈন্যের শিক্ষাদানে আমাকে ব্যস্ত থাকতে হবে। যদি আপনার কষ্ট না হয় তবে রাত্রে কোন সময় আপনার কাছে আমি উপস্থিত হব।

উমর ইবন আব্দিল আযীয জবাব দিলেন- তুমি যখন ইচ্ছা আমার কাছে আসতে পার। এ সময়টা বোধ হয় ভাল হবে। রাত্রির তৃতীয় যামে তুমি রোজ আমাকে এখানে পাবে। আট দশদিন পরে আমিও মদিনা চলে যাব।

মুহম্মদ ইবন কাসিম উমর ইবন্ আব্দিল আযীযের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মসজিদের বাইরে এলে সেখানে যুবকদের এক বৃহৎ দল দেখতে পেলেন। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তিনি তাদের বললেন- আপনারা সবাই ময়দানে চলে আসুন। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি সেখানে পৌঁছে যাব।

মুহম্মদ ইবন কাসিমের বাসস্থানের দরজায় দুই সিপাহী ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুহম্মদ ও যুবায়র ঘোড়ায় আরোহণ করে সিপাহীদের হাত থেকে বর্শা নিয়ে ঘোড়া চালিয়ে দিলেন। নগরের পশ্চিম দরজা দিয়ে বের হয়ে শস্য-শ্যামল উদ্যান পার হয়ে তাঁরা এক নদীর তীরে এসে থামলেন। ঘোড়া থেকে নেমেই তাঁরা পানিতে লাফিয়ে পড়লেন। পরিষ্কার স্বচ্ছ পানিতে কিছুক্ষণ ডুব ও সাঁতার দিয়ে উঠে তাঁরা কাপড় বদলালেন। তারপর সম্মুখের শস্য-শ্যামল পর্বতের শোভা উপভোগ করলেন। সঙ্গীয় মগ্নাবস্থা দেখে মুহম্মদ ইবন্ কাসিম বললেন- কাল আমরা খুব সকাল সকাল এখানে

আসব। এখন আমাদের যাওয়া উচিত। লোকে আমাদের প্রতীক্ষা করছে বোধ হয়।

যুবায়র চমকে মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের দিকে তাকিয়ে বললেন আপনি কি বললেন?

আমাদের দেরী হচ্ছে।

চলুন।

উভয়ে আবার অশ্বারোহণ করলেন। মুহম্মদ ইবন্ কাসিম জিজ্ঞেস করলেন- কি ভাবছিলেন?

বিষণ্ন স্বরে যুবায়র বললেন- আমি কল্পনায় লংকার শ্যামল শোভা দেখছিলাম।

কিন্তু আমাদের লক্ষ্য তো সিন্ধুর মরুভূমি।

তা আমি সর্বদাই দেখি। কিন্তু মাঝে মাঝে লংকার শ্যামলিমাও মনে পড়ে।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম বললেন- কাল আপনি স্বপ্নে নাহীদকে ডাকছিলেন। আমি তা উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করিনি। এখন যদি মনে কিছু না করেন তবে জিজ্ঞেস করব স্বপ্নে আপনি কি দেখেছিলেন?

যুবায়রে ওষ্ঠে উদাস হাসির আভাস দেখা গেল। তিনি বললেন- স্বপ্নে দেখছিলাম দেবলের কতিপয় সিপাহী মুক্ত অসি নিয়ে আমার চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে। অপর কয়েকজন নাহীদকে ধরে বন্দীশালায় নিয়ে যাচ্ছে। আমি ছুটে তাকে ছাড়াতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু নগ্ন তরবারী আমার পথরোধ করছিল।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম বললেন- মনে হচ্ছে নাহীদের স্মৃতি আপনার হৃদয় ও মস্তিষ্কে গভীর রেখাপাত করেছে।

আমি তা অস্বীকার করতে পারব না। যে অবস্থায় আমাদের মিলন ও বিচ্ছেদ ঘটেছে, তাতে কেউ হয়ত সেই বীর জাত্যাভিমানী বালিকাকে হৃদয়ে স্থান দিতে অস্বীকার করতে পারত না।

কাছ দিয়ে একটা হরিণ দৌড়ে গেল। মুহম্মদ ইবন্ কাসিম বর্শা সামলাতে সামলাতে বললেন- ওর পিছনের পা বিক্ষত। মনে হচ্ছে কোন অপটু তীরন্দাজ এর উপর আক্রমণ করেছিল। আসুন আমরা এর পশ্চাদ্ধাবন করি।

যুবায়র এবং মুহম্মদ ইবন্ কাসিম চটপট হরিণের পিছনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। আহত হরিণ বেশী দূর যেতে পারল না। মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের বর্শার এক আঘাতেই মাটিতে পড়ে গেল। যুবায়র ঘোড়া থেকে নেমে হরিণটি যবেহ্ করলেন। পিছনের উরু থেকে তীর বের করতে করতে তিনি বললেনঃ

-আমরা একে না দেখলে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে, অতি কষ্টে এর মৃত্যু হত।

বৃক্ষের আড়াল থেকে কয়েকজন অশ্বারোহী দেখা দিল। তাদের মধ্যে সুলায়মানকে চিনতে পেরে মুহম্মদ ইবন্ কাসিম বললেন- আরে, এরা তো আমাদের পুরাতন বন্ধু!

সুলায়মান কাছে এসে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলেন এবং বললেন- এ শিকার

আমাদের।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম জবাব দিলেন- আপনি নিয়ে যেতে পারেন। আমরা শুধু একে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছি। এর পা বিক্ষত ছিল। আমরা ভাবছিলাম ওটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে যাবে।

সালিহ্ বলল- তোমার কথা ঠিক নয়। তোমরা পতিত হরিণকে যবেহ্ করেছ।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম দৃঢ়ভাবে জবাব দিলেন- হরিণটা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা আমার বর্শার আঘাতে। আপনি যদি তীর মেরে থাকেন তা হলে ওর পা দেখতে পারেন।

সালিহ্ ক্রোধান্ধ হয়ে তলোয়ার বের করল। কিন্তু সুলায়মান কঠোরভাবে বললেন- তুমি এদের ক্ষমতা দেখেছ। তীর চালনা সম্বন্ধে তোমার দম্ভ ছিল, আজ তাও দূর হয়ে গেল।

একথা বলে তিনি মুহম্মদ ইবন্ কাসিমকে বললেন- আমার বন্ধুর ক্রোধ যত বেশী, বুদ্ধি ততই কম। দরকার হলে আপনি এ শিকার নিয়ে যেতে পারেন।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম উত্তর দিলেন- না, ধন্যবাদ। আমার দরকার থাকলে নিজেই শিকার করতাম।

এ কথা বলে তিনি যুবায়রকে ইঙ্গিত দিলেন এবং ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উভয়ে তৎক্ষণাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

প্রথম বিজয়

॥ এক ॥

ফজরের নামাযের পর দামেস্কের লোক বাজারে এবং ঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের সৈন্যের মিছিল দেখছিল। দূর দেশে আক্রমণকারী সৈন্যের নেতৃত্বে এক সতরো বছর বয়স্ক তরুণের উপর ন্যস্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম। দামেস্ক হতে বসরা পর্যন্ত প্রত্যেকে শহর ও বস্তী থেকে অল্প বয়স্ক বালক, যুবক ও বৃদ্ধ এ সৈন্যের সাথে যোগ দিয়েছিল। মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের যাত্রার খবর কূফা ও বসরাতে পৌঁছে গিয়েছিল। তরুণীরা স্ব স্ব পতিকে, মাতারা পুত্রকে এবং বোনেরা ভাইদেরকে তরুণ সেনাপতির সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে উদ্বুদ্ধ করছিল। আত্মাভিমানী জাতির অসহায় বালিকার ফরিয়াদ কূফা ও বসরার প্রতি ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল। বসরার মেয়েদের মধ্যে যুবায়দা প্রচার কার্য চালান। ফলে নারীদের সমস্যা জাতির প্রত্যেক মা-বোনের সম্মানের সমস্যারূপে পরিগণিত হয়। বিভিন্ন মহল্লার তরুণীরা যুবায়দার বাড়ী এসে তাঁর বক্তব্য শুনে নতুন প্রেরণা নিয়ে ফিরে যায়। অসুস্থতা সত্ত্বেও মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের মাতা বয়স্কা নারীদের এক দলের সাথে জিহাদের পক্ষে প্রচারের জন্য বসরার প্রত্যেক মহল্লার মেয়েদের কাছে যান। কয়েকজন নবীন সৈনিককে অশ্ব ও অস্ত্র সরবরাহের জন্য যুবায়দা তাঁর সমস্ত অলংকার বিক্রি করে ফেলেন। বসরার ধনী-গরীব সকল ঘরের মেয়েরাই তাঁর অনুকরণ করতে থাকে। মুজাহিদগণের সাহায্যের জন্য তারা কয়েকদিনের মধ্যেই বসরার ধনাগারকে সোনা-রূপায় পূর্ণ করে ফেলে। ইরাকের অন্যান্য শহরের নারীগণ এ পূর্ণ কাজে বসরার নারীদের কাছে হার মানতে অস্বীকার করেন। সেখানেও লক্ষ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম বসরায় তিনদিন অবস্থান করেন। তাঁর আগমনের পূর্বে বসরায় মকরাণের শাসনকর্তা মুহম্মদ ইবন্ হারুনের বার্তা পৌঁছে গিয়েছিল উবায়দুল্লাহর নেতৃত্বে বিশজন লোকের যে প্রতিনিধিদল দেবলে প্রেরিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে মাত্র দু'জন যুবক জীবন্ত মরকানে ফিরে আসতে পেরেছে। বাকী সবাইকে দেবলের শাসনকর্তা হত্যা করেছেন। প্রতিশোধ স্পৃহায় ধূমায়িত অগ্নিতে এ খবর তেল সংযোগ করে।

দামেস্ক হতে যাত্রা করার সময় মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের সৈন্য সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার মাত্র। কিন্তু বসরা হতে যাত্রার সময় এ সখ্যা বার হাজারে পরিণত হয়। এদের ছয় হাজার অশ্বারোহী, তিন হাজার পদাতিক এবং তিন হাজার রসদবাহী উটের সাথে ছিল।

॥ দুই ॥

মুহম্মদ ইবন্‌ কাসিম সিরাজ হয়ে মকরাণে পৌঁছলেন। মকরাণের সীমান্ত অতিক্রম করার সময় লাসবেলার পার্বত্য অঞ্চলে তাঁকে অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। ভীম সিংহ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে লাসবেলার সিন্ধী শাসনকর্তার সাহায্যে পৌঁছেছিল। একটি দৃঢ় পার্বত্য দূর্গকে কেন্দ্র করে সে সমস্ত পথে তীরন্দায স্থাপন করেছিল। পিতার বাধা সত্ত্বেও সে রাজাকে আশ্বাস দিয়েছিল তার বিশ হাজার সৈন্য মুসলমানদের বার হাজার সৈন্যকে লাসবেলা অতিক্রম করে অগ্রসর হতে দেবে না।

মুসলমানগণ পার্বত্যাঞ্চলে প্রবেশ করতেই ভীম সিংহের সৈন্যরা একা একা ও জোড়ায় জোড়ায় তাদের আক্রমণ শুরু করে। ত্রিশ চল্লিশ জন সৈন্যের এক দল হঠাৎ কোন টিলা বা পর্বতচূড়ায় দেখা দেয় এবং অকস্মাৎ মুহম্মদ ইবন্‌ কাসিমের সৈন্য বাহিনীর কোন অংশের উপর তীর এবং প্রস্তর বর্ষণ করে হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। অশ্বারোহী সৈন্যগণ এদিক ওদিক সরে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। কিন্তু উষ্ট্রারোহী সৈন্যদের পক্ষে এসব আক্রমণ বিপর্যয়কর প্রমাণিত হয়। সময় সময় বিশৃংখল উটগুলোকে পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ করা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনের চেয়ে দুষ্করতর হয়ে উঠে।

অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে মুহম্মদ ইবন্‌ কাসিম পদাতিক অগ্রণী সৈন্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। কিন্তু হানাদারদের একদল সামনের দিক থেকে ছেঁটে পালিয়ে যেত এবং দ্বিতীয় দল পিছন দিয়ে এসে আক্রমণ করত। একদল কোন পাহাড়ে চড়ে সৈন্য বাহিনীর দক্ষিণ বাহুর মনোযোগ আকর্ষণ করত এবং অপর দল বাম বাহুর উপর আক্রমণ চালিয়ে দিত। মুহম্মদ ইবন্‌ কাসিমের সৈন্য যতই অগ্রসর হতে লাগল, এসব আক্রমণের তীব্রতা ততই বৃদ্ধি পেতে লাগল। রাত্রে বিশ্রামের জন্য শিবির স্থাপনের পর নিশীথ হত্যার আশংকায় কমপক্ষে এক চতুর্থাংশ সৈন্যকে আশ-পাশের টিলা অধিকার করে পাহারায় নিযুক্ত থাকতে হত।

এক সন্ধ্যায় মুহম্মদ ইবন্‌ কাসিমকে এক গুপ্তচর খবর দিল উত্তর দিকে প্রায় বিশ ক্রোশ দূরে এ দৃঢ় দূর্গে শত্রু বাহিনীর মূল কেন্দ্র। তিনি স্বীয় অভিজ্ঞ সেনাপতিদের এক পরামর্শ সভা ডাকলেন। কয়েকজন সেনাপতি পরামর্শ দিলেন এ পথ পরিত্যাগ করে সমূদ্র উপকূলের অপেক্ষাকৃত সমতল পথ গ্রহণ করা হোক। উক্ত দূর্গ থেকে আমরা যতই দূরে থাকব তাদের আক্রমণ থেকে ততই নিরাপদ থাকব। কিন্তু মুহম্মদ ইবন্‌ কাসিম তাদের সাথে একমত হতে পারলেন না। তিনি বললেন- যতক্ষণ এ অঞ্চল শত্রু শূন্য না হয়, ততক্ষণ আমাদের অগ্রসর হওয়া বিপজ্জনক। আমাদের উদ্দেশ্য দেবলে পৌঁছা নয়, সিন্ধু জয় করা। এই কিল্লা শত্রুর প্রধান প্রতিরোধ ঘাঁটি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ কিল্লা আমরা জয় করতে পারলে শত্রুরা বাধ্য হয়ে এ সমস্ত অঞ্চল ছেড়ে পালাবে। তাদের যেসব সৈন্য এখান থেকে পালিয়ে দেবলে যাবে তারা এক পরাজিত মনোভাব সংক্রামিত করবে। কিন্তু আমরা যদি এদেরকে এড়িয়ে চলে যাই, তবে এদের মনোবল

বৃদ্ধি পাবে এবং আমাদের পশ্চাদ্দিক সর্বদা অরক্ষিত থাকবে। এ কিল্লা জয় করাই আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য। এ কিল্লা জয়ের পর যদি পর্বতে বিক্ষিপ্ত সৈন্যের সংখ্যা যথেষ্ট হয় তবে এ অঞ্চলেই শত্রু আমাদের সাথে এক চূড়ান্ত যুদ্ধ করতে চেষ্টা করবে। তাতেও আমাদের কল্যাণ। আমার মনে হয়, আমাদের অগ্রগতি রোধ করার জন্য এ দুর্গরক্ষীদের অধিকাংশই আশ-পাশের পাহাড়ে বিভক্ত হয়ে আছে। আজ সূর্যোদয়ের পূর্বেই আমি এ কিল্লা আক্রমণ করতে চাই। এ উদ্দেশ্য আমার সাথে মাত্র পাঁচশত পদাতিক সৈন্য নিয়ে যেতে চাই। আপনারা বাকী সৈন্যসহ সমস্ত রাত্রি অগ্রসর হবেন। এর ফলে তারা চতুর্দিকে চিন্তা ছেড়ে কেবল আপনাদের পথরোধ করতে চেষ্টা করবে। জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে আপনাদের অগ্রগতির পথ বেশী বিপজ্জনক হবে না। ভোর পর্যন্ত যদি কিল্লা জয়ের খবর পেয়ে যান, তবে অগ্রগমন স্থগিত রেখে আমার নির্দেশের অপেক্ষা করবেন। কিল্লা জয়ের পর শত্রু যদি কোথাও একত্রিত হয়ে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে সাহস করে, তাহলে আমি দূর্গ রক্ষার জন্য কিছু লোক রেখে আপনাদের সাথে এসে মিলিত হব। তারা যদি আবার কিল্লা জয়ের চেষ্টা করে তবে আপনারা সেখানে পৌছবেন।

এক বৃদ্ধ সেনাপতি বলে উঠলেন- আমার দৃঢ় বিশ্বাস সিন্ধু জয়ের জন্য আল্লাহ আপনাকেই নির্বাচিত করেছেন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনার কোন পরিকল্পনাই ভুল প্রমাণিত হবে না। কিন্তু সৈন্যাধ্যক্ষকে সৈন্যের সাথে থাকাই উচিত। সৈন্যাধ্যক্ষের জীবন অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি সৈন্য বাহিনীর শেষ আশ্রয়। এ বিপজ্জনক অভিযানে যদি আপনি দুর্ঘটনায় পতিত হন তবে?

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম জবাব দিলেন- কাদিসিয়ার যুদ্ধে বিরাট সৈন্য বাহিনী থাকা সত্ত্বেও ইরানীদের পরাজয় এজন্য হয়েছিল যে, তারা স্বীয় শক্তির চেয়ে রুস্তমের ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করেছিল বেশী। রুস্তম যেই নিহত হলেন, তারা মুসলমানদের মুষ্টিমেয় সৈন্যের ভয়ে পলিয়ে গেল। কিন্তু অপর পক্ষে মুসলমানদের সেনাপতি সা'আদ ইবন্ আবী ওক্কাস ঘোড়ায় চড়তে অসমর্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে ময়দানের এক পাশে বসে থাকতে হয়। কিন্তু মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস এত দৃঢ় ছিল যে, তারা সেনাপতির অনুপস্থিতি অনুভব করেনি। আমাদের ইতিহাসে এমন কোন দৃষ্টান্ত পাবেন না, যখন সেনাপতি শহীদ হওয়ায় মুজাহিদগণ সাহস হারিয়ে পরাজয় স্বীকার করেছেন। আমরা রাজা বা সেনাপতির জন্য যুদ্ধ করি না, বরং আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করি। রাজা ও সেনাপতির উপর নির্ভরকারীরা তাদের মৃত্যুতে নিরাশ হতে পারে। কিন্তু আমাদের আল্লাহ চিরঞ্জীব। কুরআনে তাঁর আদেশ লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমি দু'আ করি, যেন আল্লাহ জাতির জন্য আমাদের রুস্তম না বানান; বরং হযরত মুসান্না হবার শক্তি দান করেন যিনি শহীদ হওয়াতে প্রত্যেক মুসলমান শহীদ হবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিল। যে সেনাপতির প্রাণ স্বীয় সৈন্যের তলোয়ারের প্রহরায় রক্ষিত হয় এবং যিনি অধীনস্থ বীরবৃন্দকে প্রাণপণ করার পরিবর্তে প্রাণ রক্ষায় উৎসাহ দেন, আমার চোখে তার প্রাণের কোন মূল্য নেই। এ কিল্লা জয় করা যদি এত গুরুত্বপূর্ণ না হতো, তা হলে হয়ত এ অভিযানের ভার অন্য কারো উপর দিতাম। কিন্তু এ অভিযানের বিপদ ও গুরুত্ব

অত্যাধিক বলেই আমাকে স্বয়ং এটা পরিচালনা করতে হবে।

যুবায়র বললেন- আমি আপনার সাথে যেতে চাই।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম বললেন- না, আমি এক দুর্গ জয় করতে দুই মস্তিষ্কের আবশ্যকতা দেখছি না। আমার অনুপস্থিতিতে সৈন্য বাহিনীর সাথে আপনার থাকা প্রয়োজন। আমার স্থলে আমি মুহম্মদ ইবন্ হারুনকে নিযুক্ত করছি। আপনি তাঁর সহকারী ও প্রতিনিধি।

।। তিন ।।

'এশার নামাযের পর মুহম্মদ ইবন্ কাসিম উক্ত অভিযানের জন্য পাঁচশত যুবক নির্বাচিত করেন। তাদের অশ্বগুলো মূল বাহিনীর হাতে সোপর্দ করেন। তিনি মুহম্মদ ইবন্ হারুনকে অগ্রসর হওয়ার হুকুম দেন। উৎসর্গিত প্রাণ সঙ্গীদের সাথে নিজে এক পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকেন।

মধ্যরাতের পর চাঁদ ডুবে যায়। মুহম্মদ ইবন্ কাসিম কিল্লার পথ ধরেন। রাস্তার সমস্ত পর্বত রক্ষীগণ মুহম্মদ ইবন্ হারুনের অগ্রগতিকে সমুদয় বাহিনীর অগ্রগতি মনে করে সমস্ত ঘাঁটি ছেড়ে দিয়ে পূর্ব দিকে চলে গিয়েছিল। সিন্ধু অশ্বারোহীগণ পূর্বদিকে মুসলমানদের অপ্রত্যাশিত অগ্রগমণের খবর কিল্লায় ভীম সিংহের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছিল। সে তিনশত লোক দুর্গ রক্ষার জন্য রেখে বাকী সৈন্য নিয়ে মুসলিম বাহিনীর পথ রোধ করতে চলে গিয়েছিল। রাত্রির তৃতীয় যামে মুহম্মদ ইবন্ কাসিম কিল্লা হতে এক মাইল দূরে এক পাহাড়ে পৌঁছে গেলেন। দূরে মরুভূমিতে ভীম সিংহের অশ্বারোহীদের ধাবনশব্দ প্রতিধ্বনিত হল এবং মুহম্মদ ইবন্ কাসিম সঙ্গীদের বললেন- তারা কিল্লা খালি করে যাচ্ছে। আমাদের ত্বরা করতে হবে। অবশ্য দুর্গ রক্ষার জন্য অল্পসংখ্যক সৈন্য সেখানে আছে। তাই তোমাদের পক্ষ থেকে যেন কোন শব্দ না হয়। কারণ সামান্য শব্দ পেলেই দুর্গ রক্ষীগণ সতর্ক হয়ে যাবে। তাদের সংখ্যা যদি কেবল চল্লিশ জনও হয়, তবুও তারা অনেকক্ষণ কিল্লার বাইরে আমাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে।

এসব নির্দেশ দেয়ার পর মুহম্মদ ইবন্ কাসিম নিজের বীর সৈনিকদেরকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে কিল্লার দিকে অগ্রসর হলেন।

কিল্লার নিকট পৌঁছে এসব সৈনিক টিলার পেছনে লুকিয়ে বসে রইল। দুর্গ প্রাচীরের উপর প্রহরীদের কণ্ঠস্বরে ক্লান্তি ও নিদ্রার আমেজ পাওয়া যাচ্ছিল। তারা কথা বলার পরিবর্তে বিড়বিড় করছে বলেই মনে হচ্ছিল। মুহম্মদ ইবন্ কাসিম দশজন সঙ্গী নিয়ে দুর্গ প্রাচীরের এক অপেক্ষাকৃত নীরব অংশের দিকে অগ্রসর হলেন। ফাঁদের সাহায্যে প্রাচীরে উঠে রুজ্জুর সিঁড়ি ভেতরে ফেলে দিলেন। সেখানে দু'জন প্রহরী গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল। মুহূর্তের মধ্যে মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের ছ'জন সঙ্গী প্রাচীরে উঠে গেল। সপ্তম সাথী উপরে পৌছবার আগেই কয়েক হাত দূরে এক প্রহরী চমকে উঠে মশাল উঁচু করে জিজ্ঞেস করল- কে?

দ্বিতীয় প্রহরী চীৎকার দিল- শত্রু এসে পড়েছে, হুঁশিয়ার।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম সজোরে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি তুললেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল আক্রমণ চালিয়ে প্রাচীরের অনেকটা অংশ দখল করে নিলেন। ধ্বনি শুনে কিল্লার বাইরের লুক্কায়িত সৈন্যরা অগ্রসর হলেন এবং ফাঁদের সাহায্যে প্রাচীরে উঠতে লাগলেন। কিল্লার ভেতরে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন সৈন্যরা তাদের অসি সামলাবার আগেই মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের পঞ্চাশজন সৈন্য প্রাচীরে উঠে পড়ল। প্রহরীরা দুর্গ-প্রাকারের উপর বেশীক্ষণ বাঁধা দানের পরিবর্তে ভেতরে যেয়ে গভীর নির্দাভিভূত সঙ্গীদের জাগিয়ে তোলা বেশী সঙ্গত মনে করল এবং তারা বেশীক্ষণ তিষ্ঠে যুদ্ধ করার পরিবর্তে সুড়ঙ্গের পথে পলায়ন শ্রেয়তর মনে করল। সুড়ঙ্গ অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল এবং সমস্ত সিপাহী একই সঙ্গে তাতে প্রবেশ করতে চেষ্টা করছিল। কয়েকজন নিরাশ হয়ে কিল্লার ফটক খুলে দিল। কেউ পায়ে হেঁটে এবং কেউ বা অশ্ব পৃষ্ঠে বাইরে চলে এল। কিল্লার দরজা খোলা পেয়ে মুসলমানরাও প্রাচীরে আরোহণ চেষ্টা ছেড়ে দরজার দিকে ধাবিত হল। কাজেই বেশী শত্রু পলায়ন করতে পারল না। চতুর্দিকে থেকে নিরাশ হয়ে তারা অসি ধারণ করল। কিন্তু অল্পক্ষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পরেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল।

কিল্লার ভেতরে সুড়ঙ্গে প্রবেশকারী সৈন্যরা পরস্পরের সাথে হাতাহাতি শুরু করে দিল। গন্ডগোল শুনে মুহম্মদ ইবন্ কাসিম একটি মশাল তুলে নিয়ে কয়েকজন সৈনিকের সাথে কতগুলো ঘর পার হয়ে মাটির নীচের গুপ্ত ঘরে প্রবেশ করলেন। সুড়ঙ্গে প্রবেশকারীদের দুরবস্থা দেখে তিনি ফারসী ভাষায় বললেন- তোমাদের মধ্যে যারা পালাতে চাও তাদের জন্য দুর্গের ফটক খোলা আছে। অস্ত্র রেখে দিয়ে তোমরা চলে যেতে পার।

একথা বলে তিনি একদিকে সরে দাঁড়ালেন। রাজার সৈন্যদের মধ্যে যারা ফারসী জানত তারা অপরদিকে মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের কথার মর্ম বুঝিয়ে দিল। তারা মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের দিকে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে সুড়ঙ্গ হতে বের হয়ে এল। কেউ কেউ সুড়ঙ্গের আশ্রয়ে থাকা পছন্দ করছিল। কিন্তু মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের ইঙ্গিতে কয়েকজন সৈনিক নীচের গুপ্ত ঘরে প্রবেশ করে মুক্ত অসি হস্তে সুড়ঙ্গের মুখে দাঁড়াল।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম বললেন- খোলা পথ থাকা সত্ত্বেও তোমরা সুড়ঙ্গের অন্ধকার ও সংকীর্ণ পথে কেন যেতে চাও। আমাদের উপর বিশ্বাস কর তোমাদের হত্যা করার ইচ্ছা থাকলে দেখতেই পাচ্ছ যে তোমাদের গ্রীবা আমাদের অসি থেকে দূরে নয়।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের একথা শুনে বাকী সৈন্যরাও অস্ত্র ফেলে গুপ্ত ঘর থেকে বের হয়ে এল। মুহম্মদ ইবন্ কাসিম ফিরে দুর্গের ফটকে গিয়ে স্বীয় সৈন্যদের আদেশ দিলেন যে, যারা কিল্লার বাইরে যেতে চায় তাদের যেন বাধা না দেওয়া হয়।

দুর্গ রক্ষীরা সন্দেহে পা তুলে ও বারবার পেছন ফিরে তাকিয়ে তাকিয়ে বাইরে চলে গেল। পরাজিত সৈন্যের সাথে এরকম ব্যবহার সিন্ধুর ইতিহাসে এক অভিনব ব্যাপার

ছিল। একজন বয়স্ক সৈন্য আস্তে আস্তে দরজা পর্যন্ত পৌছে আবার কি ভেবে ফিরে এল।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম বললেন- যদি দুর্গের মধ্যে তোমার কিছু হারিয়ে গিয়ে থাকে, খুঁজে দেখতে পার। সে মনোযোগের সাথে মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের প্রতি তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল- আরব, সৈন্যের সেনাপতি কি আপনি?

হাঁ, আমিই। মুহম্মদ ইবন্ কাসিম জবাব দিলেন।

শত্রু কোন অবস্থাতেই সদ্ব্যবহার পাবার অধিকারী নয়। আপনি আমাদের সাথে এরূপ ব্যবহার করলেন কেন জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

শত্রুকে ধ্বংস করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং তাকে শান্তির পথ দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য।

তা'হলে আপনি বিশ্বাস করুন আপনাদেরকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না। আজ যেসব লোককে আপনি দয়া করলেন, কাল তারাই আপনার পতাকাতলে সমবেত হয়ে সেই অহংকারী রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যারা পতিত শত্রুর প্রতি দয়া করতে জানে না। এ কথা বলে সে বাইরে চলে গেল।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম কিল্লার ভেতর ঘুরে ফিরে সব দেখে নিলেন। এক প্রশস্ত ঘরে প্রচুর খাদ্য সামগ্রী মজুদ ছিল। আস্তাবলে ষাটটি ঘোড়া ছিল।

মুহম্মদ ইবন হারুনের পশ্চাদ্ধাবণকারী সৈন্য এ কিল্লা পতনের খবর পেলেই ফিরে আসবে, এ বিশ্বাস মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের ছিল। তিনি আস্তাবল থেকে ঘোড়া আনিয়ে চারজন অশ্বারোহীকে মুহম্মদ ইবন হারুনের কাছে পাঠালেন এ নির্দেশ দিয়ে যে, তিনি যেন কোন নিরাপদ স্থানে তাঁবু ফেলে পরবর্তী আদেশের জন্য অপেক্ষা করেন। এরপর তিনি কিল্লার ফটক বন্ধ করে প্রাচীরের চতুর্দিকে তীরন্দাজ বসিয়ে দিলেন এবং কিল্লার নানা স্থানে ইসলামী পতাকা স্থাপন করলেন।

।। চার ।।

প্রাকারে দাঁড়িয়ে মুহম্মদ ইবন কাসিম সূর্যোদয়ের শোভা দেখছিলেন। পূর্বদিক থেকে ত্রিশ-চল্লিশজন অশ্বারোহীর একটা দল কিল্লার দিকে অগ্রসর হচ্ছে লক্ষ্য করলেন। মুহম্মদ ইবন কাসিম বসে রইলেন। কিল্লার প্রায় একশত গজ দূরে অশ্বারোহীরা থেমে গেল। একজন অশ্বারোহী পৃথকভাবে অশ্ব ছুটিয়ে কিল্লার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। তীরন্দাজগণ মুহম্মদ ইবন কাসিমের সংকেতের প্রতীক্ষায় ছিল। তিনি ইঙ্গিতে তাদের নিরস্ত করলেন। অশ্বারোহী প্রাচীরের নীচে পৌছে ঘোড়া থামাল। আরবী ভাষায় বলল- আমরা যুবায়রের সঙ্গী। আমাদের ভেতরে আসতে দাও।

মুহম্মদ ইবন কাসিম নীচের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন- তোমার নাম কি খালিদ?

জী হাঁ- সে জবাব দিল।

তোমার সঙ্গীদের ডেকে নাও।

খালিদ পেছনে ঘুরে সঙ্গীদের আসবার জন্য ইঙ্গিত করল। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম প্রহরীদেরকে কিল্লার ফটক খুলে দিতে আদেশ দিলেন। কিল্লার বাইরে গিয়ে তিনি খালিদকে জিজ্ঞেস করলেন- তোমার বোন কোথায়?

খালিদ উত্তর দিল- তিনি আমার সঙ্গে এসেছেন। কিন্তু যুবায়র আসেননি।

তিনি বাকী সৈন্যের সঙ্গে আছেন। আমরা এখানে আছি তা তোমরা কি করে জানলে?

আপনি মকরাণের সীমান্ত অতিক্রম করেছেন সে খবর আমরা পেয়েছিলাম। আমরা সিন্ধী সৈন্যের বেশ ধরে এখানে পৌঁছি। আপনি শুনে বিস্মিত হবেন রাজার সেনাপতি এখান থেকে চার মাইল দূরে এক পর্বত পাহারা দেয়ার জন্য আমাদের নিযুক্ত করে। আমরা অধীর আগ্রহে আপনাদের প্রতীক্ষা করছিলাম। কিল্লা থেকে পলায়মান সৈন্য আজ সেখানে পৌঁছে সংবাদ দেয় এ দুর্গ জয় করা হয়ে গিয়েছে। আমরা আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রধান সেনাপতি কোথায়?

মৃদু হেসে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম এক সঙ্গীর দিকে তাকালেন। সে বলল- তুমি প্রধান সেনাপতির সাথেই কথা বলছ।

অল্পক্ষণের মধ্যেই খালিদের অন্যান্য সাথীরা তাদের কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামছিল। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম তাদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন- কিন্তু তোমার বোন কোথায়?

খালিদ মুচকি হেসে মুখ ঢাকা এক পুরুষবেশীর দিকে ইঙ্গিত করল।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম বললেন- আল্লাহর শোকর, আপনার স্বাস্থ্য এখন ভাল। যুবায়র বাকী সৈন্যের সাথে আছেন।

যুবায়রের নাম শুনে নাহীদ হঠাৎ তার কানে ও কপোলে উত্তাপ অনুভব করল। সে মুখ ফিরে মায়ার দিকে তাকাল। মায়াও তার মত পুরুষের বেশ পরিহিত ছিল। সে অপরের দৃষ্টি বাঁচিয়ে নাহীদের বাহুতে চিমটি কাটলো এবং চুপি চুপি বলল- নাহীদ, অভিনন্দন।

॥ পাঁচ ॥

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম আবার খালিদের সমস্ত সঙ্গীর দিকে তাকালেন। জনৈক শ্বেত-শ্মশ্রু ও প্রবলকায় লোকের করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে তিনি বললেন- বোধ হয় তুমিই গংগু। আমি তোমার এবং তোমার সাথীদের কাছে কৃতজ্ঞ।

গংগু মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের হাত নিজ হাতে গ্রহণ করতে করতে খালিদের দিকে

তাকাল। খালিদ বলল- গংগু ও তার সাথীরা মুসলমান হয়ে গেছে। গংগু নিজের জন্য সা'আদ নাম পছন্দ করেছে।

মুহম্মদ ইবন কাসিম 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে পরপর সকলের সাথে মুসাফিহা করলেন। নাসিরুদ্দীন- (জয়রাম)-এর সাথে করমর্দনের সময় বললেন- আপনি বোধ হয় নাসিরুদ্দীন। আপনি আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করেছেন। আল্লাহ আপনাকে যোগ্য পুরস্কার দিন। আর ইনি বোধ হয় আপনার বোন।

খালিদ বলল- ইনিও মুসলমান হয়েছেন। এ'র নাম যুহরা।

যুহরা নাসিরুদ্দীনের কাছে এসে কানে কানে জিজ্ঞেস করল- ইনি কে? নাসিরুদ্দীন তাকে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করে খালিদকে সে প্রশ্ন করলেন।

খালিদ উচ্চস্বরে বলল- ইনি আমাদের প্রধান সেনাপতি।

সা'আদ (গংগু) ও তার সাথীগণ বিস্মিত হয়ে মুহম্মদ ইবন কাসিমের দিকে তাকাতে লাগল।

দূরে অশ্ব ক্ষুরের শব্দ শোনা গেল। প্রাচীরের উপর থেকে এক প্রহরী ডেকে বলল- শত্রু সৈন্য আসছে।

এরা তাড়াতাড়ি কিল্লার ভেতরে ঢুকে পড়ল। মুহম্মদ ইবন কাসিম দুর্গপ্রাকারে দাঁড়িয়ে বহু দূর পর্যন্ত দৃষ্টিক্ষেপ করতে লাগলেন। দক্ষিণ ও পূর্ব দিক থেকে সিন্ধুর হাজার পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য কিল্লার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। মুহম্মদ ইবন কাসিম দশজন অশ্বারোহীকে আদেশ দিলেন যে, তারা সহকারী সেনাধ্যক্ষকে খবর পৌছাবে সন্ধ্যার পূর্বে এখানে পৌছে যেতে।

অশ্বারোহীদের মুহম্মদ ইবন কাসিম নির্দেশ দিলেন যে, তারা পশ্চিম দিক দিয়ে ঘুরে হানাদার বাহিনীর পাল্লার বাইরে চলে যাবে। তারপর অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হবে। তারা ঘোড়া ছুটিয়ে কিল্লা থেকে বের হয়ে গেল। হানাদার সৈন্য নিকটে এসে পড়ছিল। কিল্লার ফটক বন্ধ করার হুকুম দিয়ে মুহম্মদ ইবন কাসিম দুর্গ-প্রাকারে উঠে ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলেন। তিনি তীরন্দাজদের সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিলেন। প্রাকারের এক কোণে খালিদ ও তাঁর সাথীগণ অধীর হয়ে শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করছিল। তাদের মধ্যে নাহীদ ও যুহরাকে দেখে মুহম্মদ ইবন কাসিম বললেন- খালিদ, এদের কিল্লার ভেতরে নিয়ে যাও। এদের এখানে প্রয়োজন নেই।

নাহীদ জবাব দিল- আমাদের জন্য আপনি চিন্তা করবেন না, আমরা তীর চালাতে জানি।

তোমাদের ইচ্ছা। তবে এখন একটু মাথা নিচু করে বস। একথা বলে মুহম্মদ ইবন কাসিম অগ্রসর হলেন।

ভীম সিংহের সৈন্যরা টিলার আড়ালে ঘোড়া রেখে দূর্গ অবরোধ করল। প্রস্তর ঢিবির আড়াল থেকে তারা কিল্লার উপর তীর বর্ষণ করতে লাগল। কিল্লার প্রাচীর আড়ালে যারা

বসেছিল, এসব তীর তাদের কোন ক্ষতি করতে পারল না। মুহম্মদ ইবন কাসিম নিজের সৈন্যদেরকে আদেশ দিলেন কিল্লার উপর আক্রমণ রোধ করার জন্যই কেবল তারা তীর ব্যবহার করবে।

ভীম সিংহের সৈন্যদের তীর বর্ষণে উত্তর কিল্লা থেকে কোন প্রতিক্রিয়া না হওয়ায় তারা 'রাজা দাহিরের জয়' ধ্বনি করে উঠল। টিবি ও প্রস্তুরের আড়ালে লুক্কায়িত সৈন্যরা চতুর্দিক থেকে কিল্লার দিকে ধাবিত হল।

এসব সৈন্য যেই দূর্গ রক্ষীদের তীরের পাল্লার মধ্যে এসে পড়ল মুহম্মদ ইবন কাসিম সজোরে তকবীর ধ্বনি করলেন। ধ্বনি আকাশে মিলিয়ে যাবার আগেই কিল্লা থেকে তীর বর্ষণ শুরু হল এবং ভীম সিংহের সৈন্য বিক্ষত হয়ে ভূপতিত হতে লাগল। কিন্তু বিশ সহস্র সৈন্য কয়েকশত সৈন্যক্ষয় অবহেলা করেই দূর্গ প্রাচীর পর্যন্ত পৌছে গেল। কয়েকজন সৈনিক একটি ভারী কড়িকাঠ তুলে অগ্রসর হল এবং উহার আঘাতে তারা কিল্লার ফটক ভাঙ্গতে চেষ্টা করতে লাগল। বাকী সৈন্য ফাঁদের সাহায্যে, প্রাচীর আরোহণে সচেষ্ট হল। কিন্তু তীরের বৃষ্টির সামনে তারা অগ্রসর হতে পারল না। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ভীম সিংহের প্রায় দু'হাজার হতাহত সৈন্য প্রাচীরের আশেপাশে পড়ে গেল। তাঁকে বাধ্য হয়ে সৈন্য সরাবার আদেশ দিতে হল।

তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত ভীম সিংহ কিল্লার উপর তিনবার আক্রমণ করেন। কিন্তু প্রত্যেক বারেই তাঁকে হতাশ হয়ে ফিরতে হয়।

চতুর্থ প্রহরে ভীম সিংহ যখন এক চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতি করেছিলেন তখন পেছন থেকে মুহম্মদ ইবন কাসিমের বাকী সৈন্যের আগমন বার্তা পৌছল। তিনি অশ্বারোহীদের আদেশ দিলেন পিছনে সরে তাদের ঘোড়া সামলাতে। পদাতিক সৈন্যদের তীরন্দাযদেরকে আশ-পাশের পাহাড়ে স্থাপন করলেন। শত্রুর চলাফেরা দেখে মুহম্মদ ইবন কাসিমের দৃঢ় বিশ্বাস হল শত্রু মুহম্মদ ইবন হারুনের আগমনবার্তা পেয়ে গেছে। তাঁর আশংকা হল যে, কিল্লার নিকট পৌছে তাঁরা চতুর্দিকের পর্বত ও টিলার উপর থেকে শত্রু তীরের পাল্লায় পড়ে যাবেন। তিনি তাড়াতাড়ি কাগজে একটি নকশা আঁকলেন এবং মুহম্মদ ইবন হারুনের নামে কয়েকটি নির্দেশ লিখে দিলেন। স্বীয় সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন- মুহম্মদ ইবন হারুন এখানে পৌছবার আগেই এ চিঠিখানা তাঁর হাতে পৌছান একান্ত জরুরী। কিন্তু এ কাজ যেমনি গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বিপজ্জনক। এখন শত্রুর মনোযোগ অপর দিকে নিবদ্ধ আছে। উত্তর দিক প্রায় শত্রু শূন্য। আমরা প্রাচীর থেকে লোক নামিয়ে দিতে পারি। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুহম্মদ ইবন হারুন পর্যন্ত পৌছতে বহু বিপদের সম্মুখীন হতে হবে।

এ কাজের জন্য একজন স্বেচ্ছাসেবক-

খালিদ মুহম্মদ ইবন কাসিমের কথা শেষ হতে না দিয়েই বলে উঠল- আমাকে অনুমতি দিন।

অনেক সৈনিক খালিদের প্রতিবাদ করল এবং স্ব স্ব নাম পেশ করল। সা'আদ বলল- আমি শুনেছি, মুসলমানরা তাঁদের নও-মুসলিম ভাইদের ইচ্ছায় বাধা দেন না। আপনি আমাকে অনুমতি দিন। আমার পোশাক দেখে কেউ সন্দেহ করবে না এবং আমি এ অঞ্চলের প্রত্যেক ধূলিকণার সাথে পরিচিত।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম দেখতে পেলেন তাঁর সৈন্য বাহিনী শত্রু সৈন্যের পিছনে দু'তিন মাইল দূরে এক টিলা হতে অবতরণ করছে। তিনি সা'আদের হাতে চিঠিখানা দিয়ে বললেন- যাও, আল্লাহ তোমার সহায় হোন।

সা'আদ ছুটে উত্তর প্রাচীরে গিয়ে এক রজ্জুর সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

॥ ছয় ॥

মুহম্মদ ইব্‌ন হারুন দূর থেকে ভীম সিংহের অশ্বারোহীদেরকে আক্রমণে উদ্যত দেখে নিজের সৈন্যকে থামতে হুকুম দিলেন। প্রতি আক্রমণের জন্য তিনি প্রয়োজন মতো ব্যূহ রচনা করে অগ্রসর হবার আদেশ দিতে যাচ্ছিলেন, তখন বাহিনীর দক্ষিণ বাহুর সেনাপতি ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁর কাছে এলেন। তিনি তাঁর হাতে একখানা চিঠি দিতে দিতে বললেন- এ হস্তাক্ষর তো প্রধান সেনাপতিরই মনে হচ্ছে। কিন্তু এ বলছে যুবায়র তাকে চেনেন। নিজের নাম কখনো সা'আদ কখনো গংগু বলে।

যুবায়র চমকে বললেন- আমি তাকে চিনি।

মুহম্মদ ইব্‌ন হারুন চিঠি পাঠ করে বললেন- প্রধান সেনাপতির চিঠি দেখার পর বাহক সম্বন্ধে তোমার অনুসন্ধান করার প্রয়োজন ছিল না। তুমি তার সাথে কোন দুর্ব্যবহার করে থাকলে তার কাছে গিয়ে মাফ চাও। আর তোমার অশ্বারোহীদের গিয়ে আদেশ দাও আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে। যুবায়র, আমাদের দক্ষিণে ও বামে সবগুলো পর্বত শত্রুর তীরন্দাজের দখলে রয়েছে। তুমি বাম পার্শ্বের উষ্ট্রারোহীদের উট হতে নামিয়ে নাও এবং উভয় বাহু থেকে পর্বতের উপর আক্রমণের আদেশ দাও। বাম বাহুর অশ্বারোহীদেরকেও অগ্রবাহিনীর সাথে যোগ দিতে বল। যতক্ষণ পর্যন্ত এ সমস্ত পাহাড়ে শত্রুর তীরন্দাজগণ থাকবে, ততক্ষণ আমরা অগ্রসর হতে পারব না।

ভীম সিংহের পরিকল্পনা খুব বিজ্ঞোচিত ছিল। মুহম্মদ ইব্‌ন হারুন সরাসরি সামনে থেকে আক্রমণ করলে তার উভয় বাহু পর্বতে লুকায়িত তীরন্দাজদের দরুণ ভীষণ বিপদে পতিত হত। কিন্তু তাঁর প্রত্যাশার বিরুদ্ধে যখন মুসলিম বাহিনীর দক্ষিণ ও বাম উভয় বাহুর পদাতিক সৈন্যরা পর্বতারোহণ আরম্ভ করল, তখন তিনি নিজের সৈন্যদিগকে অগ্রসর হয়ে আক্রমণের আদেশ দিলেন।

কিল্লার মধ্যে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম এ সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন। তিনি পঞ্চাশজন সৈন্য দূর্গ রক্ষার জন্য নিযুক্ত করলেন। বাকী সৈন্যকে কিল্লার বাইরে গিয়ে শত্রুর পেছন থেকে আক্রমণ চালাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে আদেশ দিলেন। পদাতিক ও অশ্বারোহী

সৈন্যরা কিল্লার ফটকে জমা হল। মুহম্মদ ইবন কাসিম উভয় সৈন্যের চলাচল পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

খালিদ, নাসিরুদ্দীন ও তাদের সাথীরা কিল্লায় অবস্থানকারী সৈন্যদের কাছ থেকে শিরস্ত্রাণ, বর্ম ও আরবী পোশাক নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসল। হঠাৎ নাহীদ এবং যুহরা অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয়ে এক কামরা থেকে বের হয়ে এল এবং ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

খালিদ বলল, নাহীদ-যুহরা তোমরা যাও। কিল্লার বাইরে তোমাদের কোন কাজ নেই।

নাসিরুদ্দীন তাকে সমর্থন করলেন। মুহম্মদ ইবন কাসিম ফিরে তাকিয়ে বললেন- আমি তোমাদের জিহাদের আগ্রহের প্রশংসা করি। কিন্তু তোমরা আমাদের দুর্গরক্ষী সৈন্যদের সাথে থেকে আমাদের অধিকতর সাহায্য করতে পারবে। জাতির জন্য বীর মাতার স্তন্য তাদের রক্তের চেয়ে বেশী মূল্যবান। বিপদের সময় এলে তারা গৃহের দেয়ালকে পতনোন্মুখ জাতির পক্ষে শেষ দুর্গে পরিণত করতে পারে। তোমরা এখানে থাকলে এখানকার মুষ্টিমেয় রক্ষী দুর্গ রক্ষার জন্য তাদের শেষ রক্তবিন্দু দান করতে কুণ্ঠিত হবে না। কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈনিকেরা যুদ্ধ করার চেয়ে তোমাদের রক্ষার জন্য বেশী ব্যস্ত হবে। তোমাদের একজন আহত হয়ে পড়লে শত শত সৈনিক হতাশ হয়ে পড়বে। তাছাড়া এ যুদ্ধ এমন নয়, যাতে তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন হবে। তোমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নাও। হয়ত সারারাত আহতদের সেবা করতে তোমাদের জাগতে হবে। খালিদ, এদের ভেতরে নিয়ে যাও। একথা বলে তিনি আবার ছিদ্র পথে বাইরের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। যখন উভয় বাহিনী পরস্পরের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করলো তখন মুহম্মদ ইবন কাসিম ঘোড়ায় চড়ে কিল্লার ফটক খুলতে হুকুম দিলেন।

খালিদ নাহীদ ও যুহরাকে ঘরে রেখে ফিরে এল। সে তখনও দরজায় পৌঁছেনি। এমন সময় যুহরা ছুটে এসে তার কাপড় ধরে বলল- আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমাকে সংগে নিয়ে যান। আমি জীবনে মরণে আপনার সংগ ছাড়তে পারি না।

খালিদ রেগে জবাব দিল- যুহরা অবুঝ হয়ো না। তুমি প্রধান সেনাপতির আদেশ শুনেছ। আমাকে যেতে দাও। সৈন্য কিল্লার বাইরে বের হচ্ছে।

যুহরা সজল চোখে বলল- আল্লার দোহাই, আমাকে ভীরু ভাববেন না। কিন্তু আমি আপনার সাথে প্রাণ দিতে চাই।

যুহরা, যুহরা আমাকে ছেড়ে দাও। একথা বলে সে যুহরার হাত সরিয়ে দিল। কিন্তু যুহরা আবার পথ আগলে দাঁড়াল। সে অগ্রসর হয়ে বলল- আপনি যদি এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকতে না চান, তবে আমাকে কেন বঞ্চিত করতে চান?

যুহরা, এটা প্রধান সেনাপতির আদেশ। জিহাদে প্রধান সেনাপতির আদেশের ব্যতিক্রম করা সবচেয়ে বড় অপরাধ।

যুহরা নিরুৎসাহ হয়ে খালিদের কাপড় ছেড়ে দিল এবং ফোঁপাতে ফোঁপাতে নাহীদকে জড়িয়ে ধরল।

খালিদ দৌড়ে ফটকে পৌছল। সৈন্যরা চলে গিয়েছিল এবং ফটক বন্ধ ছিল। খালিদ প্রহরীকে ফটক খুলতে বলল। কিন্তু প্রহরী জবাব দিল, বাইরে থেকে প্রধান সেনাপতির হুকুম না আসা পর্যন্ত ফটক খুলতে পারি না।

খালিদের পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে গেল। সে মনে করল তিনি তাকে ভীরু মনে করে ফেলে গেছেন। সে ছুটে গিয়ে ফটকের ছিদ্রপথে বাইরে চেয়ে দেখল কিল্লার পদাতিক সৈন্য পেছন থেকে ভীম সিংহের সৈন্যের উভয় বাহুকে আক্রমণ করেছে এবং মুহম্মদ ইবন কাসিম ষাটজন অশ্বারোহী সৈন্যসহ সরাসরি শত্রু বাহিনীর কেন্দ্রস্থলে আক্রমণ চালিয়েছেন। খালিদ শত্রু সৈন্যের ঠিক মাঝখানে অর্ধচন্দ্র শোভিত পতাকা উড়তে দেখে মুষ্টি বদ্ধ করে এবং ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে প্রহরীদের বলল- তিনি হয়ত আমার প্রতীক্ষা করেছিলেন। হয়ত বুঝেছেন মৃত্যু ভয়ে আমি কিল্লার মধ্যে কোথাও লুকিয়ে রয়েছি। আল্লাহর ওয়াস্তে ফটক খুলে আমাকে যেতে দাও।

প্রহরী উত্তর দিল- আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, প্রধান সেনাপতি আপনাকে ভীরু বলে সন্দেহ করেন না। নইলে হয়ত তিনি আপনাকে কতল করার হুকুম দিতেন। তিনি বলছিলেন স্ত্রীলোকদের কাছে আপনার থাকা ভাল হবে। ফটক খোলার অনুমতি আমাদের নেই।

তা'হলে আমি প্রাচীরের উপর থেকে লাফ দিয়ে পড়ব। একথা বলে সে প্রাচীরের সিঁড়ি দিকে ছুটল। পথে যুহরা দাঁড়িয়েছিল। সে কিছু বলতে চাচ্ছিল। কিন্তু খালিদের রাগ দেখে চুপ করে গেল। খালিদ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল- এখন তুমি খুশি হয়েছ, না?

যুহরা বলল আমাকে মাফ করুন। আমি নারী বই ত নই।

জাগ্রত জাতিকে আল্লাহ তোমার মত নারীর হাত থেকে রক্ষা করুন। একথা বলে সে ছুটে সিঁড়ি বেয়ে প্রাচীরে উঠে গেল। মুহূর্তের মধ্যে রজ্জুর সিঁড়ি বেয়ে কিল্লার বাইরে নেমে গেল।

যুহরা দৌড়ে গিয়ে ঘর থেকে তরবারী হাতে নিল। নাহীদ জিজ্ঞেস করল- যুহরা তুমি কোথায় যাচ্ছ?

যুহরা জবাব দিল- নাহীদ, তোমার ভাই সর্বদাই আমাকে ভুল বোঝেন। আমি যদি ফিরে না আসি, তবে তাঁকে বল, আমি ভীরু নই। হায়, আমাদের সমাজ যদি নারীকে পতির চিতায় পুড়ে মারার পরিবর্তে কোন সৎ উদ্দেশ্য জীবন উৎসর্গ করতে শিক্ষা দিত!

নাহীদ বললো- যুহরা, দাঁড়াও। যুহরা, যুহরা ....

কিন্তু যুহরা ঝড়ের মত ঘরে প্রবেশ করেছিল এবং ঘূর্ণিবায়ুর মত বের হয়ে গেল। নাহীদ তার পেছনে দৌড় দিল। কিন্তু সে সিঁড়ির কাছে পৌছতেই যুহরা প্রাচীরের উপর

থেকে রুজ্জুর সিঁড়ি নীচে ফেলে দিয়েছিল। প্রহরীরা তাকে বাধা দিতে চায়। কিন্তু সে বলে, আমার পথ রোধ করলে আমি প্রাচীর থেকে লাফিয়ে পড়ব।

প্রহরীরা বিচলিত হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাতে থাকে।

ততক্ষণে যুহরা নীচে নেমে গেল। নাহীদ প্রাচীরের উপর পৌঁছে ডাক দিল- যুহরা, যুহরা পাগল হয়ো না। ফিরে এসো।

কিন্তু নাহীদের প্রত্যেক ডাকে তার গতি বৃদ্ধি পেতে লাগল। নিরাশ হয়ে নাহীদ নিজেই নীচে নামতে চাইল। কিন্তু এক বৃদ্ধ সৈনিক বললো- স্ত্রীলোকের ঝোঁক অন্ধ। আপনি ওর পশ্চাদ্ধাবন করলে সে বেপরোয়াভাবে শত্রু সৈন্যের মধ্যে ঢুকে পড়বে।

নাহীদ নিরাশ হয়ে এক সৈন্যের দ্বারা তীর ধনুক আনিয়ে নিল এবং প্রাচীরের এক স্থানে বসে পড়ল। একটা ঘোড়া আরোহীকে ফেলে এদিক ওদিক ঘুরছিল। যুহরা উভয় ঠোঁটের সাহায্যে শব্দ করে তার লাগাম ধরে ফেললো এবং তার উপর চড়ে বসল। তাকে অশ্বপৃষ্ঠে দেখে নাহীদ খানিকটা নিশ্চিন্ত হল এবং যুহরার নিরাপত্তার জন্য দু'আ করতে লাগল।

॥ সাত ॥

মুসলিম বাহিনীর উপর ভীম সিংহের সৈন্যের প্রথম আক্রমণ খুব প্রবল ছিল। ফলে এক সংকীর্ণ উপত্যকায় তাদেরকে একটু পেছনে হঠতে হয়েছিল। কিন্তু পদাতিক সৈন্য আশ-পাশের পর্বত অধিকার করে তীর বর্ষণ আরম্ভ করায় সিন্ধী সৈন্যের মনোযোগ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়। ঠিক সে সময় মুহম্মদ ইবন কাসিম কিল্লার ফটক খুলে পেছন থেকে এসে আক্রমণ করে এবং কয়েকজন অশ্বারোহীসহ শত্রু সৈন্যকে ছত্রভংগ করে দিয়ে বাহিনীর কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে যান।

বাহিনীর ঠিক মধ্যস্থলে সবুজ নিশান দেখে মুহম্মদ ইবন হারুন স্বীয় সৈন্যকে তিনদিক থেকে একযোগে আক্রমণ করতে আদেশ দেন। পাঁচশত অশ্বারোহী নিয়ে যুবায়র মুহম্মদ ইবন কাসিমের সাহায্যে অগ্রসর হন। মুহূর্তের মধ্যে তাঁরা এসে মুহম্মদ ইব্ন কাসিমের সাথে মিলিত হন। ভীম সিংহের সৈন্য হতভম্ব হয়ে দুর্গের দিকে হটতে থাকে। উপত্যকায় উত্থিত ধূলিরাশি সাঁঝের গোধূলির সাথে মিশে প্রায় রাত্রির মত অন্ধকার সৃষ্টি করল। ভম সিংহ শেষ বারের মত তাঁর ছত্রভঙ্গ সৈন্যের মধ্যে শৃংখলা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যুবায়রের অনুসরণে মুহম্মদ ইবন হারুনের অন্যান্য সৈন্যরাও ময়দান পরিষ্কার করতে করতে মুহম্মদ ইব্ন কাসিমের সাথে যুক্ত হল।

ভীম সিংহের সৈন্য কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ করছিল। মুসলমানদের চাপে পেছনে হটে কিল্লার নিকটে পৌঁছে গিয়েছিল। দুর্গরক্ষীগণ যখন তাঁদের উপর তীর বর্ষণ করতে আরম্ভ করল, তখন তারা দিক্‌বিদিক পালাতে লাগল।

খালিদ তীরন্দাযদের এক দলের সাথে এক টিলা [illegible]

করে শত্রুর এক দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হতভম্ব সৈন্যরা একদিকে সরে পড়ল। খালিদ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। শত্রু সৈন্য সুযোগ বুঝে তাকে ঘিরে ফেলল। হঠাৎ এক অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটিয়ে তীব্রবেগে অগ্রসর হল এবং আল্লাহু আকবর বলে সেই দলের উপর আক্রমণ করল। খালিদ তার কণ্ঠস্বর চিনে চমকে উঠল। সে ছিল যুহ্‌রা। যুহ্‌রার তলোয়ার পর পর দুজন সৈন্যের মস্তকে চমকিয়ে উঠল এবং উভয়ে মাটিতে পড়ে গেল। অপর এক সৈনিক অগ্রসর হয়ে যুহ্‌রার উপর আক্রমণ করল। যুহ্‌রা ঘোড়া হঠাৎ সামনের পা তুলে দাঁড়িয়ে গেল এবং তলোয়ারের আঘাত অশ্বের পায়ে লেগে গেল। কয়েকটি লাফ দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঘোড়াটি মাটিতে পড়ে গেল। মুসলিম সৈন্যের কয়েকটি দলকে এদিকে অগ্রসর হতে দেখে ভীম সিংহের সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রের এ অংশও শূন্য করে চলে গেল। খালিদ ছুটে যুহ্‌রার কাছে পৌছল। সে ঘোড়ার কাছেই উপুড় হয়ে পড়েছিল। নিকটে গিয়ে খালিদের হাত পা অবশ হয়ে গেল। তার মুখ থেকে একই সঙ্গে উহু, ফোপানী ও দু'আ বের হল। সে থামল, শিউরে উঠল, কম্পিত হল। পরক্ষণেই ছুটে যুহ্‌রাকে তুলে ধরল। যুহ্‌রার পৃষ্ঠে রক্তের দাগ এবং বর্মে বিদ্ধ দুটি তীর দেখতে পেল। প্রাণের সমস্ত গতি তার চোখে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। পর পর উভয় তীর টেনে বের করে ফেলে দিল। যুহ্‌রা শিউরে উঠে চক্ষু খুলল। সে উঠে বসল। খালিদ ম্লান চন্দ্রালোকে তার পান্ডুর মুখ দেখে বলল- তুমি আহত!

যুহ্‌রার মুখে বিজয়ের মৃদু হাসি খেলে গেল। সে বলল- না তো, আমিও তীরগুলো অনুভবই করিনি। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। আমি সম্পূর্ণ ভাল আছি। ময়দানের অবস্থা কি?

ময়দান শূন্য হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ আমাদের জয়ী করেছেন। কিন্তু নাহীদ কোথায়?

তিনি কিল্লায় আছেন। আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

আপনি আমার উপর রাগ করেননি তো?

উহু, যুহ্‌রা, আমাকে লজ্জা দিও না। আমার রূঢ় কথার জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত।

সে বললো, না আমারি ভুল হয়েছিল। আমার আশংকা হয়েছিল হয়ত আপনি জীবন্ত ফিরে আসবেন না। কিন্তু আজ আমি দেখেছি মানুষ তার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে মরতে পারে না। আমি তীর বৃষ্টির মধ্য দিয়ে ময়দানে পৌছি। কিন্তু আমি অনুভব করি বিধাতার অদৃশ্য শক্তি আমাকে রক্ষা করেছে।

বিজয় ধ্বনি করতে করতে মুসলিম সৈন্য কিল্লার ফটকের সম্মুখে জমা হচ্ছিল। খালিদ বলল- চল যুহ্‌রা, নাহীদ উৎকণ্ঠিত রয়েছে।

যুহ্‌রা উঠে খালিদের সাথে কয়েক পা অগ্রসর হল। কিন্তু তার মাথা ঘুরে ওঠায় সে মাটিতে বসে পড়ল।

সে পানি চাইল। এক পতিত সৈনিকের পানির বোতল খুলে খালিদ তার মুখে ধরল।

যুহ্‌রা কয়েক ঢোক পানি খেয়ে অনেকটা সুস্থ বোধ করল। খালিদ বলল- যুহ্‌রা তোমাকে আমি তুলে নিচ্ছি। অধিক রক্তক্ষয় বশতঃ তুমি দুর্বল হয়ে পড়েছ।

যুহ্‌রা বল- পিপাসার দরুণ আমার মাথা ঘুরছিল। আমি একটু ভর দিয়েই চলতে পারব।

যুহ্‌রার ভর দেয়ার জন্য খালিদ বাহু বাড়িয়ে দিল। সে ধীরে ধীরে খালিদের সাথে হাঁটতে লাগল। কয়েকপদ অগ্রসর হয়েই সে নাসিরুদ্দীনের স্বর শুনতে পেল, যুহ্‌রা, যুহ্‌রা।

সে খালিদকে বলল- ভাই আমাকে ডাকছেন। জবাব দিন।

খালিদ উচ্চস্বরে বলল- যুহ্‌রা আমার সাথে আছে। এদিকে।

নাসিরুদ্দীন, যুবায়র ও নাহীদ সবেগে তাদের কাছে এসে পৌঁছল। নাহীদ ছুটে গিয়ে যুহ্‌রাকে জড়িয়ে ধরে বলল- যুহ্‌রা, যুহ্‌রা বোন আমার, তুমি কেমন আছ?

সে উত্তর দিল- আমি সম্পূর্ণ ভাল আছি।

কিন্তু নাহীদ আঙ্গুলে রক্তের আর্দ্রতা অনুভব করে তার পিঠে হাত বুলিয়ে চমকে বলল- যুহ্‌রা, তুমি আহত। ভাই নাসিরুদ্দীন, একে কিল্লার ভেতর নিয়ে চলুন।

নাসিরুদ্দীন অগ্রসর হয়ে যুহ্‌রাকে তুলে নিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু যুহ্‌রা বলল- ভাই, আমি সম্পূর্ণ ভাল আছি। আমি হাঁটতে পারি। আর ইনি কে? যুবায়র ভাই? ভাই, আমাকে মাফ করুন, আমি চিনতে পারিনি।

যুবায়র বললেন- ছোট্ট বোনটি আমার, তুমি ভাইদের বড় চিন্তায় ফেল। এখন চল, তোমার ক্ষতে মলম দেয়ার ও পট্টি বাঁধার ব্যবস্থা করতে হবে।

আরো কয়েকপদ অগ্রসর হবার পর তারা সা'আদকে দেখতে পেল। সে নুইয়ে নুইয়ে ময়দানে পতিত লাশগুলো দেখছিল।

খালিদ ডেকে বলল- চাচা, কাকে খুঁজছেন? আমরা এদিকে। সে ছুটে তাদের কাছে গিয়ে বিচলিত হয়ে বলল- বাবা আমার, মা আমার, তোমরা কোথায় ছিলে?

খালিদ হেসে জবাব দিল- আমরা আপনাকে খুঁজছিলাম।

তোমরা আমাকে খুঁজছিলে? মিথ্যুক কোথাকার! নাহীদকে জিজ্ঞেস কর আমি কি রকম বিচলিত ছিলাম।

নাহীদ বলল- সত্যি তোমাদের জন্য ইনি বিশেষ উৎকণ্ঠিত ছিলেন। আমরা ময়দানে একবার ঘুরেছি, আর ইনি বোধ হয় অন্ততঃ তিনবার ঘুরেছেন।

সা'আদ বলল- কেবল এই ময়দানেই নয়। আমি তো আশ-পাশের সমস্ত পাহাড় থেকেও নিরাশ হয়ে এসেছি। তোমরা না হয় ডাক দিতে, আমার তো স্বর বসে গেছে।

খালিদ বলল- আমি আপনার ডাক শুনিনি। নইলে নিশ্চয় জবাব দিতাম।

সা'আদ বলল- আহতদের চীৎকার ও কান্নার মধ্যে কি করে আর ডাক শোনা যাবে।

এরা কথা বলতে বলতে কিল্লার দরজার কাছে পৌঁছলে নাহীদ সা'আদের কানে কানে কি বলল। কয়েকবার মাথা দুলাবার পর সে নাসিরুদ্দীনকে বলল- আমি আপনার সাথে নিরালায় কথা বলতে চাই।

নাসিরুদ্দীন তার সাথে কয়ক পদ চলে বললেন- বল, কি আদেশ?

আশে-পাশে একত্রিত সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে সা'আদ বলল- এখানে নয়। এখানে অনেক লোক।

নাসিরুদ্দীন বলল- বেশ, যেখানে হয় নিয়ে চল।

কিল্লার দরজা থেকে প্রায় পাঁচশত কদম দূরে গিয়ে সা'আদ এক পাথরের উপর বসতে বসতে বলল- আপনিও বসুন।

নাসিরুদ্দীন তার সামনে, অন্য পাথরের উপর বসলেন।

সা'আদ বলল- প্রথমে আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে, আমার কথা শোনবার পর আমার মাথা ফাটিয়ে দেবেন না।

নাসিরুদ্দীন জবাব দিলেন- যদি মাথা ফাটাবার কথা হয়, নিশ্চয় ফাটাব।

সা'আদ কিছুক্ষণ ভেবে বলল- তেমন কিছু কথা নয়। তবে পরের হাতের বিশ্বাস কি? আচ্ছা, আমি বলেই ফেলি। কথা এই যে, মায়া, না যুহ্‌রা আপনার বোন। আমারও সে কন্যার চেয়ে কম নয়। খালিদও আমার খুব প্রিয়। আমার পুত্রের মতই। এরপর আমি কি বলব ভেবে পাচ্ছি না। আমার ভয় হয় আপনি রাগ করবেন।

নাসিরুদ্দীন বললেন- আমি বুঝেছি। তুমি বলতে চাও খালিদের সাথে যুহ্‌রার বিয়ে হোক।

হাঁ, হাঁ, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। আমি একথাই বলতে চাচ্ছিলাম।

শুধু এ কথার জন্যই আমাকে এখানে টেনে এনেছ?

সা'আদ জবাব দিল- আমি ভাবলাম আপনি রাগ করে যদি আমার দাড়ি ছিঁড়েন, তবে অন্য কেউ যেন আমার দুর্দশা না দেখে।

নাসিরুদ্দীন বললেন- আমাকে এ রকম বদ লোক মনে করেন দেখে আমি বিস্মিত। আমি গংগুকে দেখতে পারতাম না সত্য, কিন্তু রাজপুতের মনে পিতার জন্য যে রকম সম্মান থাকা উচিত, সা'আদের জন্য আমার মনে সে রকম সম্মানের আসন রয়েছে। আপনি যখনই চান, তখনই তাদের বিয়ে হতে পারে।

সা'আদ বলল- আমি তো চাই এখুনি হয়ে যাক।

কিন্তু যুহ্‌রা এখন আহত।

সা'আদ চমকে বলল- যুহ্‌রা আহত? কেউ আমাকে বলেনি কেন? চল যাই।

নাসিরুদ্দীন সান্ত্বনা দিয়ে বললেন- ঘাবড়াবার কারণ নেই। তার ক্ষত সামান্য।

সর্ব সহায়

॥ এক ॥

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের শ্রান্ত সৈনিকরা অর্ধরাত্রি পর্যন্ত আহতদের সেবা শুশ্রুষা এবং শহীদগণের দাফন-কাফনে ব্যস্ত থাকে। রণক্ষেত্রের চতুর্দিক থেকে আহত শত্রু সৈন্যের চীৎকার শোনা যাচ্ছিল। শহীদগণের জানাযার নামায শেষ করে মুসলিম বাহিনির সতর বৎসর বয়স্ক সেনাপতি নিজের পিঠে পানির মশক নিয়ে আহত ও আর্ত শত্রু সৈন্যের পিপাসা নিবারণ করতে অগ্রসর হলেন- যদিও কয়েক রাত পর্যন্ত বিশ্রামের অভাবে তাঁর শরীর ক্লান্তিতে অবসন্ন ছিল এবং তাঁর বাহু সারাদিন তলোয়ার ও বর্শা চালিয়ে অবশ হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধের সময় যে নয়নে দৃঢ়তা ও ক্রোধের বহ্নি জ্বলছিল, পতিত ও আর্ত শত্রুর জন্য সে নয়নে এখন ক্ষমা দয়ার অশ্রু বইছিল। যে হস্তের অসি শত্রুর মস্তকে বজ্রের ন্যায় পতিত হচ্ছিল, এখন সে হস্তই তাদের ক্ষতে মলম লাগাতে ব্যস্ত ছিল।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের সৈন্যরাও ক্লান্তিতে অবসন্ন ছিল। কিন্তু তাদের তরুণ ও প্রিয় সেনাপতির অনুসরণে তারা এক স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করছিল। তারা আহত শত্রু সৈন্যদের তুলে এনে কিল্লার সামনে সারি সারি শুইয়ে দিল।

পর্বত পার্শ্ব থেকে কার কাতর কণ্ঠ মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের কানে এল। মশাল হাতে তিনি সেদিকে অগ্রসর হলেন। সাঈদ, যুবায়র, সা'আদ, নাসিরুদ্দীন এবং কয়েকজন সেনাপতি তাঁর সঙ্গে ছিলেন। মশালের আলোকে কয়েকটি মৃতদেহের মাঝখানে বর্ম পরিহিত এক যুবককে তিনি দেখতে পেলেন। বর্মের উপর রক্তের কয়েকটি চিহ্ন ছিল। পাঁজরে একটি তীর বিদ্ধ ছিল। তাঁর ডান হাত থেকে অসির হাতল খুলে গিয়েছিল। কিন্তু বাম হাতে তখনো সিন্ধুর পতাকা শক্ত করে ধরে রেখেছিল। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম মশাল অন্যের হাতে দিয়ে মাটিতে হাঁটু পেতে বসে তাকে তুলে ধরলেন এবং পানি খাওয়ালেন। কয়েক ঢোক পানি খেয়ে যুবক চোখ খুলল। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম ও তাঁর সঙ্গীদের মনোযোগ দিয়ে দেখে উভয় হাতে পতাকাটি শক্ত করে ধরে নিল।

নাসিরুদ্দীন যুবায়রকে বললেন- যুবায়র, আপনি একে চিনলেন না? যুবায়র অগ্রসর হয়ে আহত যুবককে দেখে বললেন- ওহো, এ যে ভীম সিংহ।

ভীম সিংহ চোখ খুলে ম্লান হাসি হেসে বললেন- আপনাদের বিজয় 'মুবারক'।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের অনুরোধে যুবায়র ভীম সিংহের কথার আরবী তরজমা করে তাঁকে শোনালেন। শুনে তিনি বললেন- আমি আশ্চর্য হচ্ছি এরূপ বীর সেনাপতি থাকা সত্ত্বেও সিন্ধুবাহিনী রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল কেন। যুবায়র আপনি ওকে সাহায্য

করুন, আমি ওর তীরে টেনে বের করছি।

যুবায়র অগ্রসর হয়ে ভীম সিংহকে ধরলেন। মুহম্মদ ইবন কাসিম তীরের দিকে হাত বাড়ালেন। কিন্তু ভীম সিংহ পতাকা ফেলে তাঁর হাত ধরে ফেললেন।

মুহম্মদ ইবন কাসিম নাসিরুদ্দীনকে ইশারা করলেন। তিনি ভীম সিংহের উভয় হাত ধরে রাখলেন। মুহম্মদ ইবন কাসিম তীর টেনে ফেলে দিলেন এবং তাঁর বর্ম খুলে ফেলার আদেশ দিলেন।

ভীম সিংহের ক্ষত গভীর ছিল না। কিন্তু অত্যধিক রক্তক্ষয়ে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর ক্ষতস্থান ওষুধ দিয়ে পট্টি বেঁধে মুহম্মদ ইবন কাসিম তাঁকে দুর্গের ভেতর নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন। তিনি নিজে অন্যান্য আহতদের সেবায় মনোযোগী হলেন।

॥ দুই ॥

যুহরা তার ক্ষতকে আমল দিল না। অন্যান্য দিনের মত সে প্রত্যূষে উঠে নাহীদের সাথে ফজরের নামায পড়তে দাঁড়িয়ে গেল। নামায শেষ করে বিছানায় শুতে শুতে যুহরা বলল- হায়, আমার ক্ষত যদি গুরুতর হত, তা হলে তোমার সেবা শুশ্রূষা উপভোগ করতে পারতাম।

মুচকি হেসে নাহীদ বলল, তুমি আমার সেবার কল্পনা করছ, না খালিদের?

যুহরার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। দরজায় টোকা মেরে নাসিরুদ্দীন বললেন- ভেতরে আসতে পারি?

নাহীদ উঠে অন্য ঘরে যেতে যেতে বলল- নাও, এবার উঠে বস। নইলে- নইলে কি হবে?

নাহীদ বলল- নইলে হয়ত তোমার বিয়ে দেবল বিজয় পর্যন্ত স্থগিত হয়ে যাবে।

যুহরার বুক দুরু দুরু করতে লাগল। সে উঠে নাহীদের কাপড় টেনে বলল- নাহীদ, নাহীদ আপা, সত্য বলতো, ব্যাপার কি?

নাহীদ কাপড় ছাড়িয়ে বলল- পাগলী, তোমার ভাই বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে ছেড়ে দাও।

না, যতক্ষণ তুমি আমাকে পরিষ্কার করে খুলে না বলবে, আমি তোমাকে ছাড়ব না। ভাই, একটু দাঁড়ান। আমি নাহীদ আপার সাথে একটা কথা বলছি। হাঁ, এখন বল।

নাহীদ বলল- আচ্ছা, বলছি শোন। রাত্রে ময়দান থেকে ফিরবার সময় সা'আদ তোমার বিষয় জিজ্ঞেস করেছিল। আমি তাকে সব কথা বলেছি। তোমার মনের অবস্থা আগেও তার কাছে গোপন ছিল না। তোমার মনে থাকতে পারে, যখন আমরা কিল্লায় প্রবেশ করেছিলাম, সে তোমার ভাইকে ধরে একদিকে নিয়ে গিয়েছিল ...।

তা'হলে সে ভাইকে কি বলেছে?

এই যে- খালিদের সাথে তোমার বিয়ে দেওয়া হোক।

আপা সত্যি বল। তুমি রহস্য করছ!

পাগলী! আমি রহস্য করছি না। তোমার ভাই এখুনি আমার কথার সত্যতা সমর্থন করবেন।

যুহ্‌রার চোখে আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ হল। নাহীদ বলল- হায়, হায়, তুমি তো কাঁদছো। আমার ভাইকে বুঝি তোমার পছন্দ হয় না।?

মুচকি হেসে সে বলল- না!

তা'হলে আমি নিজেই তোমার ভাইকে বলছি তিনি যেন তোমাকে এ বিয়েতে বাধ্য না করেন। বলব? একথা বলে নাহীদ দুষ্টু হাসি হেসে দরজার দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু যুহ্‌রা এগিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল।

আমার বোন, আমার আপা। চোখ মুছতে মুছতে সে বলল।

নাহীদ বলল- তা'হলে খালিদের সাথে বিয়েতে তোমার মত আছে।

যুহ্‌রা তার দিকে তাকাল। মুচকি হেসে তাকে অন্য কামরার দিকে ধাক্কা দিয়ে বলল- যাও, তুমি বড় দুষ্ট।

নাসিরুদ্দীন বাইরে থেকে বললেন- যুহ্‌রা, তোমার কথা শেষ হবে কখন?

সে বিছানায় বসে জবাব দিল- আসুন ভাই। বোন নাহীদ অন্য ঘরে চলে গেছেন।

॥ তিন ॥

নাসিরুদ্দীন ভেতরে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করলেন- তোমার ক্ষতের অবস্থা কেমন?

সে উত্তর দিল- ভাই সে সামান্য আঁচড় মাত্র ছিল। আমি সম্পূর্ণ ভাল আছি।

নাসিরুদ্দীন তার কাছে চৌকির উপর বসলেন। যুহ্‌রার হৃদয় দুরু দুরু করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ ভেবে নাসিরুদ্দীন বললেন- যুহ্‌রা, খালিদ এক বীর বালক। আমার ইচ্ছা তার সাথে তোমার বিয়ে হোক। এ সম্বন্ধে তোমার পছন্দ হয়?

উত্তর দেয়ার পরিবর্তে যুহ্‌রা উভয় হাতের মধ্যে মুখ লুকাল।

কিছুক্ষণ ভেবে নাসিরুদ্দীন বললেন- আমার ইচ্ছা ছিল সিন্ধু বিজয়রে পর খুব ধুমধামের সাথে বিয়ে হবে। কিন্তু মুসলমানরা এসব প্রথা পছন্দ করে না। তা ছাড়া সিন্ধুর সঙ্গে চূড়ান্ত যুদ্ধ এখনো বাকী। যোদ্ধার জীবনের কোন ভরসা নেই। আমার সাধ যে আমি নিজের হাতে তোমাকে খালিদের হাতে তুলে দেব। নাহীদ তোমাকে খুব ভালবাসে। সে তোমার যত্ন করবে। আমি অধিকতর নিশ্চিন্ত মনে ইসলামের সেবা

করতে পারব। যুহ্‌রা, আমার বর্তমান নিঃস্ব অবস্থায় নেক দু'আ ছাড়া আর কিছুই তোমার জন্য নেই। কিন্তু বিশ্বের সমস্ত ঐশ্বর্য যদি আমার থাকত, তোমার জন্য উৎসর্গ করে দিতাম।

যুহ্‌রা ভাইয়া, ভাইয়া বলে ফোঁপাতে ফোঁপাতে নাসিরুদ্দীনের কোলে মাথা রেখে বলল- আমার কিছুর প্রয়োজন নেই।

সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে তিনি আবার বললেন- যুহ্‌রা, আমার ইচ্ছা আজ রাত্রেই তোমার বিয়ে হয়ে যাক। সৈন্য বাহিনী এখানে আরো দু'চার দিন থাকবে। কিন্তু দেবল থেকে রাজ-সৈন্যের আগমণ বার্তা পেলে হয়ত হঠাৎ আমাদের যাত্রা করতে হবে। সা'আদ মুহম্মদ ইবন কাসিমের কাছে কথা পেড়েছিলেন। তিনি বিশেষ আনন্দিত। সা'আদ খালিদকেও জিজ্ঞেস করেছে। হাঁ, বোন নাহীদকেও অভিনন্দন জানাও। প্রধান সেনাপতি নিজেই তার ভাইকে ডেকে তার মত নিয়েছেন। তিনি নিজেই তোমাদের উভয়ের বিয়ে পড়াবেন।

বাইরে থেকে সা'আদ নাসিরুদ্দীনকে ডাকায় তিনি বের হয়ে গেলেন।

যুহ্‌রা উঠে সামনের ঘরের দরজা খুলতে খুলতে বলল- নাহীদ, নাহীদ, শুনেছ? আজ তোমার বিয়ে!

আমার বিয়ে? লজ্জা ও আনন্দে নাহীদের মুখে এক ঝলক রক্ত খেলে গেল।

হাঁ নাহীদ, তোমার বিয়ে। এখন বলতো যুবায়র ভাইকে তোমার পছন্দ হয় কি না? বল না। আমি তাঁকে এখুনি ডেকে বলে দিচ্ছি তিনি যেন অন্য কনে খুঁজে নেন।

নাহীদ বলল- যুহ্‌রা, তুমি বড় দুষ্টু।

খালিদ বারান্দা থেকে অন্য ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে নাহীদকে ডাকল। যুহ্‌রা হেসে বলল- নাহীদ শিগ্‌গীর যাও, নইলে তোমার বিয়ে সিন্ধু বিজয় পর্যন্ত স্থগিত হয়ে যাবে। আমি রহস্য করছি না। তোমার ভাই এখুনি আমার কথার সমর্থন করবেন।

সস্নেহ দৃষ্টিতে নাহীদ যুহ্‌রার দিকে তাকাতে তাকাতে অন্য ঘরে প্রবেশ করল। তার হৃদয় আনন্দে নাচছিল। তার পা কাঁপছিল।

॥ চার ॥

সন্ধ্যার সময় কিল্লার এক প্রশস্ত ঘরে সৈন্য বাহিনীর সেনাপতিগণ যুবায়র ও খালিদকে তাদের বিবাহোপলক্ষ্যে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন। নাহীদ ও যুহ্‌রা এক ঘরে বসে কথাবার্তা বলছিল। নাহীদ বলল- যুহ্‌রা, বিয়ের সময় তোমার কণ্ঠ এরূপ মূক হয়েছিল কেন?

নাহীদ, আমি জানি না। তুমি জান, আমার আশা ছিল না সমস্ত ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে যাবে। আমার কান শাঁ শাঁ করছিল। আমি কোথায় তাও আমার মনে

ছিল না। তাই যদি মুহম্মদ ইবন কাসিম ছাড়া অন্য কেউ বিয়ে পড়াতেন, তা হলে হয়ত আমি এতটা বিচলিত হতাম না। তাঁর চেহারায় কী শৌর্য এবং তাঁর কণ্ঠস্বর কী গুরুগম্ভীর। সত্য বলতে কি তিনি মানুষ নন, দেবতা। আমরা দেবতার ভয় করতে শিখেছি। নাহীদ, তুমি আমার কাছে না থাকলে হয়ত আমার মুখ মোটেই খুলত না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন- খালিদকে তুমি গ্রহণ করছ? আর আমি লজ্জায় মাটিতে যেন মিশে যাচ্ছি। নাহীদ, আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না, তোমার ভাইয়ের সাথে সত্যি সত্যি আমার বিয়ে হয়ে গেছে। কখনো কখনো আমার মনে হয় আমি স্বপ্ন দেখছি। আচ্ছা, তোমার বিয়ে তোমার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হয় নাকি?

নাহীদ, মুচকি হাসল। যুহরা উভয় বাহু দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল। নাহীদ তার ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ নিয়ে খেলতে লাগল। হঠাৎ তার কি কথা মনে হল এবং সে তার কণ্ঠ হতে মুক্তার মালা খুলে যুহরার গলায় পরিয়ে দিল।

যুহরা বলল- না, না এটা তোমার গলায় বেশী শোভা পায়।

নাহীদ বলল- আমার আর একটা আছে। আমাকে খালিদ দিয়ে গেছে। একথা বলে স্বীয় হীরার আংটি খুলে যুহরার প্রতিবাদ সত্ত্বেও তার আঙ্গুলে পরিয়ে দিল। পরে বলল- দেখ, আমাকে খুশী করতে চাইলে এ আংটি খুলো না।

যুহরা একটু যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেল এবং নাহীদের দিকে তাকিয়ে রইল।

নাহীদ বলল- যুহরা তুমি বিষণ্ণ হলে কেন? অলংকার আমার ভাল লাগে না। কিন্তু তোমাদের দেশেতো অলংকার পরবার প্রথা রয়েছে।

যুহরা বলল- কিন্তু আমাদের দেশে ভাবী ননদের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করে না; বরং দান করে। আমি বাড়ী থেকে এত দূরে...

নাহীদ বাধা দিয়ে বলল- পাগলী, ভাবী তো তুমি আজ হলে। কিন্তু এর আগে অনেকদিন পর্যন্ত তুমি আমার ছোট বোন ছিলে তো।

যুহরা বলল- নাহীদ, সিন্ধু বিজয়রে পর ভাইয়ের ইচ্ছা তিনি কাঠিয়াওয়াড়ে গিয়ে ইসলাম প্রচার করবেন। আমারও ইচ্ছা কিছুদিনের জন্যে আমি সেখানে যাই। হায়, তুমিও যদি কিছুদিনের জন্য আমাদের সাথে যেতে পারতে! আমাদের বাড়ী সমুদ্র তটে একটি ছোট দুর্গের মধ্যে। তার তিন দিকে প্রশস্ত আম বাগান। মাঝখান দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত। সেই নদীর তীরে আম গাছে আমি দোলনায় দুলতাম। বর্ষাকালে নদীর স্রোত প্রখর হত। সখীদের সাথে আমি তাতে স্নান করতাম। বৃষ্টিতে আমরা আম পেড়ে খেতাম। মধুর মত মিষ্টি আম। বাগানের পেছনে একটি সুন্দর দীঘি ছিল। আমরা পানিতে নেমে কানামাছি খেলতাম। পদ্মফুল ছিঁড়ে পরস্পরকে ছুঁড়ে মারতাম। নাহীদ, আমি তোমাকে নিশ্চয় সেখানে নিয়ে যাব।

নাহীদ জবাব দিল- আল্লাহ আমাদের জয় দিন। সম্ভবতঃ সিন্ধুর পরে আমাদের বাহিনী তোমাদের দেশের দিকে অগ্রসর হবে।

যুহ্‌রা বলল- আল্লাহ সে দিন শীঘ্র আনুন। আমি নিজের হাতে ইসলামের পতাকা সে দুর্গের উপর উত্তোলন করব। নাহীদ, আমি বিস্মিত হচ্ছি আমার মনে এরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্তন কি করে এলো। আমি অচ্ছুৎদের ভীষণ ঘৃণা করতাম। একদিন আমি সখীদের সাথে দীঘিতে স্নান করতে যাই। সেখানে এক অচ্ছুৎ বালক স্নান করছিল। আমরা প্রস্তর নিক্ষেপ করে করে তাকে অচেতন করে ফেলি। আর একদিন এক নীচ জাতীয় পথিক আমাদের জাতীয় বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে মাটিতে পড়া কয়েকটি আম কুড়িয়ে নেয়। আমাদের চাকর তাকে অষ্ট প্রহর পর্যন্ত এক গাছের সাথে বেঁধে রাখে। আমি কতবার সেখান দিয়ে যাতায়াত করেছি। অথচ আশ্চর্যের বিষয় তাকে বুভুক্ষু ও তৃষ্ণার্ত দেখেও তার প্রতি আমার কিছুমাত্র দয়া হয়নি। এখন আমি সেখানে ফিরে গেলে আশ-পাশের বস্তিবাসী সমস্ত অচ্ছুৎদের দাওয়াত দেব আমাদের বাগানে এসে আম খাবার জন্য। আমাদের নদীতে স্নান করতে এবং আমাদের কূপের ঠান্ডা সুস্বাদু পানি পান করতে। তাদের সবচেয়ে বড় দুঃখ ছিল আমাদের মন্দিরে এসে আমাদের দেবতাদের পূজা করতে পারত না।

আমি এখন ঘোষণা করে দেব মুসলমান এদেশে এরূপ প্রার্থনা মন্দির স্থাপন করবার জন্য এসেছে, যেখানে যে কোন অস্পৃশ্য ব্রাহ্মণের সঙ্গে, এমন কি তার পুরোভাগেও দাঁড়াতে পারে।

নাহীদ বলল- আল্লাহ তোমার আশা পূর্ণ করুন।

॥ পাঁচ ॥

সমস্ত বাহিনীর জন্য কিল্লা অপরিসর প্রতিপন্ন হওয়ায় মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম অর্ধেক সৈন্যের জন্য বাইরে তাঁবু খাটিয়ে দিলেন। নিজ বাহিনীর আহতদের মত তিনি ভীম সিংহের সৈন্যের আহতদেরকেও তাঁবুতে আশ্রয় দিলেন। স্বীয় বাহিনীর চিকিৎসক এবং অস্ত্রোপচারকদের আদেশ দিলেন- তারা যেন আহত শত্রু- সৈন্যের চিকিৎসায় শৈথিল্য না করেন। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম নিজেও চিকিৎসা শাস্ত্রে এবং অস্ত্রোপচারে যথেষ্ট নৈপুণ্যের অধিকারী ছিলেন। প্রভাত ও সন্ধ্যায় তিনি আহতদের তাঁবুতে গিয়ে তাদের খোঁজ খবর নিতেন। পৃথকভাবে প্রত্যেকের অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন, তাদের সান্ত্বনা দিতেন। আহত সৈন্যের সাথে কথা বলার জন্য তিনি সা'আদকে দোভাষী হিসেবে নিয়ে যেতেন। কাউকে ক্লান্ত ও বিষণ্ণ দেখলে বলতেন- তুমি শীঘ্রই ভাল হয়ে যাবে। মনে করো না তোমাদের আমরা বন্দী করেছি। ভাল হয়ে যেখানে চাও তোমরা যেতে পারবে।

কৃতজ্ঞ নয়নে তাঁর দিকে চেয়ে তারা বলত- ভগবানের দোহাই, আমাদের আর লজ্জা দেবেন না। আপনাকে এত কষ্ট দেয়ার আমাদের কোন অধিকার নেই। আপনি বিশ্রাম করুন।

তিনি জবাব দিতেন- এটা আমার কর্তব্য।

ভীম সিংহ সম্বন্ধে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের গভীর উৎসুক্য ছিল। তিনি নিজে দু'বেলা তাঁর ক্ষত দেখতেন এবং নিজ হাতে ঔষধ লাগাতেন। নাসিরুদ্দীন এবং যুবায়র সর্ব প্রকারে তাঁর চিত্তবিনোদন করতেন। ভীম সিংহ প্রথমে ভেবেছিলেন এ সদ্ব্যবহার তাঁর সঙ্গীদের ফুসলিয়ে নেয়ার জন্য মুসলমানদের একটি চাল। কিন্তু তিন চার দিন পরেই তিনি অনুভব করলেন এটা লোক দেখানো কৃত্রিম দয়া নয়। বরং মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম এবং তাঁর সহযোগীদের স্বভাবই সাধারণ লোকের চেয়ে পৃথক।

তাঁর নিজের ক্ষত বিশেষ গুরুতর ছিল না। তবে অধিকতর রক্তক্ষয় বশতঃ শরীর দুর্বল ছিল। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের চিকিৎসা এবং যুবায়র ও নাসিরুদ্দীনের সেবা শুশ্রূষায় চতুর্থ দিনেই তিনি চলাফেরা করার শক্তি অর্জন করলেন।

পঞ্চম দিন 'এশার নামাযের পর মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম সা'আদকে সঙ্গে নিয়ে যথারীতি আহতদের তাঁবুতে ঘুরছিলেন। ভীম সিংহের তাঁবুতে এসে দেখেন তিনি বিছানায় শুয়ে স্বপ্নে বিড়বিড় করছেন, না না। আমাকে আবার তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠাবেন না। তিনি মানুষ নন, দেবতা। আপনি বন্দীদের ছেড়ে দিন। তিনি আপনার অপরাধ মাফ করে দেবেন। না, না। আমি যাব না। রাজার পাপের শাস্তি প্রজা কেন ভোগ করবে? আমি মৃত্যুকে ডরাই না। কিন্তু আমার প্রাণ বিসর্জন দিয়ে তুমি সমাগত বিপদ এড়াতে পারবে না।

অত্যাচারী! কাপুরুষ! হায় ভগবান ....

ভীম সিংহ শিউরে উঠে চোখ খুললেন এবং বিস্ময়ের সাথে সা'আদ ও মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের দিকে তাকাতে লাগলেন। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম বললেন- মনে হচ্ছে তুমি এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখছিলে।

ভীম সিংহ চিন্তায় পড়ে গেলেন। তাঁর কপালের স্বেদ বিন্দু প্রকাশ করছিল স্বপ্নের মধ্যে তিনি ভীষণ মানসিক সংঘাতে লিপ্ত ছিলেন।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম অগ্রসর হয়ে তাঁর নাড়ী পরীক্ষা করে বললেন- তোমার শরীর সম্পূর্ণ ভাল আছে। ক্ষতে কোন বেদনা নেই তো?

বিষণ্ণ ম্লান হেসে তিনি উত্তর দিলেন- না।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম বললেন- আমার বাহিনী কাল প্রাতে এখান থেকে যাত্রা করবে। দুঃখের বিষয় কোন কারণ বশতঃ এখানে আমরা বেশী দিন থাকতে পারছি না। নচেৎ আমি আরো কিছুদিন তোমার সেবা-শুশ্রূষা করতাম। যা হোক, আমি এখানে পাঁচশত সৈন্য রেখে যাচ্ছি। তারা তোমার যত্ন করবে। তোমার বাহিনীর আহত সৈন্যদের মধ্যে যারা সুস্থ হয়ে উঠেছে তারা আগামী কাল স্ব স্ব গৃহে ফিরে যাবার অনুমতি পাবে। তুমি যতদিন অশ্বারোহণ করতে সক্ষম না হও, ততদিন এখানেই থাকো।

ভীম সিংহ বললেন- এর অর্থ আপনি সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দেবেন?

মুহম্মদ ইবন কাসিম জবাব দিলেন- মানুষকে বন্দী করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং তাদেরকে স্বেচ্ছাচারী শাসন হতে মুক্তি দিয়ে এমন এক শাসন ব্যবস্থার সাথে আমরা পরিচিত করাতে চাই, যার মূলনীতি 'মানুষের সাম্য'। আমাদেরকে বিদেশী হানাদার মনে করে তোমার সৈন্যরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিল। তাদের জানা ছিল না আমাদের যুদ্ধ মাতৃভূমির নামে নয় বা জাতির নামে নয়। আমরা সিন্ধুর উপর আরব প্রতিপত্তি চাই না। আমরা ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত মানব জাতির কল্যাণের জন্য এক বিশ্বব্যাপী বিপ্লব চাই। এমন বিপ্লব, যা উৎপীড়িতদের শির উচ্চ রাখবার জন্য অত্যাচারীর অস্ত্র কেড়ে নেবে। আমাদের যুদ্ধ রাজা-মহারাজার যুদ্ধ নয়। বরং রাজার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের যুদ্ধ। আমাদের উদ্দেশ্য এ নয় যে, আমরা সিন্ধু-রাজের মুকুট নিয়ে নিজের মাথায় পরবো। আমরা প্রমাণ করতে চাই মুকুট ও সিংহাসনের মালিক হয়ে নিজের আইন প্রবর্তন করার অধিকার কোন লোকেরই নেই। মুকুট ও সিংহাসন স্বার্থপর লোকের তৈরি প্রতিমা মাত্র। যে আইন এসব প্রতিমার মাহাত্ম্য চিরস্থায়ী করার জন্য তৈরী, তা চিরকাল মানব গোষ্ঠীকে দ্বিধা বিভক্ত করে রাখবে- অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত, মজলুম। তোমরা এদেরকে রাজা ও প্রজা বলে থাক। সিন্ধুর রাজা আমাদের জাহাজ লুট করে আমাদের নারী ও শিশুদের বন্দী করেছে এ জন্যই যে সে মনে করে মুকুট ও সিংহাসনের মালিক হয়ে প্রত্যেক মানুষের উপর তার অত্যাচার করার অধিকার আছে। সে এখন আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, কারণ তার অত্যাচারের অস্ত্র হৃত হওয়ার আশংকা আছে। এসব সৈন্য আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে এ জন্য যে, অত্যাচারের সহায়তা করার প্রতিদান তারা পায়। মানুষ ভারবাহী পশুকে যেভাবে ব্যবহার করে, এ বেচারাদেরকে, সেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। স্বেচ্ছাচারী শাসনের দরুণ জীবিকা অর্জনের পথ সংকীর্ণ। তাই তারা এরূপ কাজ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অত্যাচারের সহায়তা করতে গিয়ে এরা নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত বিক্রয় করতে প্রস্তুত। যে বিপ্লবের বিরুদ্ধে এরা বাধা সৃষ্টি করছে, তারা জানে না যে তাতেই তাদের কল্যাণ নিহিত আছে। আমাদের সম্বন্ধে এদেরকে ভয় দেখানো হয়েছে। এখন বিজয়ের পরে না আমি অত্যাচারিত হতে চাই, না এদেরকে অত্যাচারিত করতে চাই।

ভীম সিংহ বললেন- আপনি কি বিশ্বাস করেন এরা ফিরে গিয়ে সৈন্য বাহিনীতে আবার যোগ দেবেন না?

মুহম্মদ ইবন কাসিম জবাব দিলেন- ফিরে গিয়ে এদের কার্যপন্থা কি হবে তা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি না। কিন্তু এদের পক্ষ থেকে আমার কোন ভয় নেই। আমি আল্লাহর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করছি। উচ্চ আদর্শের জন্য যারা যুদ্ধ করে, তাদের শক্তি বাড়তেই থাকে, কমে না। এর পূর্বে কয়েক জাতিই, স্ব স্ব রাজার পক্ষে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু এখন তারা অনুভব করেছে যে, আমাদের শাসন প্রণালী উন্নত ধরণের, তখন তারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে। তোমার সৈন্যদের মধ্যে

যাদেরকে আল্লাহ ভাল-মন্দ বিচারশক্তি দিয়েছেন, তারা ফিরে গিয়ে নিশ্চয় অত্যাচারের তরণীকে নিমজ্জন হতে রক্ষা করতে চেষ্টা করবে না। যারা দ্বিতীয়বার আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে সাহস করবে, আরো দু'একটি যুদ্ধের পরেই তাদের বিশ্বাস হবে আমাদের তলোয়ার ভোতা হবার নয়।

ভীম সিংহ বললেন- আপনি মুকুট ও সিংহাসনের শত্রু। মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্বে বিশ্বাসী নন। কিন্তু শাসন ব্যবস্থা না থাকলে দেশে শান্তি থাকবে কি করে?

মুহম্মদ ইবন কাসিম জবাব দিলেন- স্বেচ্ছাচারের দন্ড অত্যাচারিতের কণ্ঠ চেপে রাখলে তার অর্থ এ নয় যে, দেশে শান্তি বিরাজিত। আমি আগেই বলেছি আমরা দুনিয়ার মানুষের গড়া আইন চাই না। আল্লাহর আইন প্রবর্তন করতে চাই।

ভীম সিংহ বললেন- আইন যারই হোক, তাকে প্রতিষ্ঠিত করবে মানুষেই। তাদেরকে রাজা বাদশা না বললেও তারা শাসনকর্তা নিশ্চয় হবেন। পৃথিবীতে যতদিন আইন ভংগকারী লোক থাকবে, ততদিন শক্তির দন্ড ব্যতীত আইন রক্ষা সম্ভব হবে না।

মুহম্মদ ইবন কাসিম বললেন- এ কথা সত্য। কিন্তু এ আইনের প্রথম আবশ্যকতা এই যে, প্রতিষ্ঠাতাগণ সদাচারী ব্যক্তি হবেন। আমরা যতদিন সৎ থাকব, ততদিন আল্লাহর আইন রক্ষার ভার আমাদের উপর থাকবে। কাল যদি তোমার জাতি সদাচারী হয়, তাহলে সে আইন রক্ষার দায়িত্ব তারাই গ্রহণ করবে। কিন্তু শক্তির দন্ড তার নিজস্ব মর্যাদা রক্ষার জন্য নয়, বরং আইন রক্ষার জন্য মাত্র ব্যবহারের অনুমতি থাকবে। মুসলমানের হাকিম এবং অন্য জাতির রাজার মধ্যে পার্থক্য এই যে, তিনি শক্তির দন্ড অত্যচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের সাহায্যে ব্যবহার করেন; এবং রাজারা তা শুধু নিজেদের প্রতিপত্তি স্থায়ী রাখার জন্য ব্যবহার করেন।

কিছুক্ষণ ভেবে ভীম সিংহ জিজ্ঞেস করলেন- তবে আমাকেও এসব লোকের সাথে ফিরে যাবার অনুমতি দেওয়া হবে?

আমি পূর্বেই বোধ হয় বলেছি যে সুস্থ হওয়ার পর তুমি যখনই যেতে চাইবে যেতে পারবে।

ভীম সিংহ বললেন- আমি এখন ভ্রমণ করতে পারব। যদি আপনি অনুমতি দেন, তবে আমি কালই যাত্রা করব।

এখনো তোমার ক্ষত সম্পূর্ণ শুকায়নি। তবুও যদি তুমি কাল যেতে চাও আমি বাধা দেব না।

ভীম সিংহ কিছুক্ষণ ভেবে বললেন- আপনি বোধ হয় জানেন না, আমি সিন্ধুর সেনাপতির পুত্র। ফিরে গিয়ে আমার সৈন্য বাহিনীতে যোগদান আপনার পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে। তাই আমি ফিরে গিয়ে আবার সৈন্য বাহিনীতে যোগ দেব না, আমাকে ছাড়বার আগে যদি এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিতে চান, তবে সে শর্তে আমি যেতে রাযী নই।

আমি তোমাকে এরূপ প্রতিজ্ঞা করতে বলিনি। হ্যাঁ, তোমাকে আমি শুধু একটি কথা বলব- তুমি রাজা দাহিরকে এ খবরটি পৌঁছিয়ে দেবে যে, আরব আর বেশী দূরে নয়। যদি আরব বন্দীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা হয়, তবে তার পক্ষে ভাল হবে না।

ভীম সিংহ উত্তর দিলেন- আমি প্রতিজ্ঞা করছি এবং আমি আশা করছি আমাদের আহত সৈন্যদের সাথে আপনার ব্যবহারের কথা জানতে পারলে তিনিও নিশ্চয় নরম হবেন।

আমি উপকারের প্রতিদান চাই না। আমি শুধু চাই তুমি তার চোখ থেকে অহংকারের পর্দা সরিয়ে দাও এবং তাকে বলে দাও সে এক আগ্নেগিরি পার্শ্বে দন্ডায়মান রয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের এ বাক্যালাপের মধ্যে হয়ত আমি কোন কড়া কথা বলে ফেলেছি। যদি আমার কোন কথায় তোমার মনে আঘাত লেগে থাকে, তবে একজন মানুষ হিসেবে তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম একথা বলে তাঁবুর বাইরে চলে গেলেন। ভীম সিংহ বারবার মনে মনে বলতে লাগলেন- তুমি মানুষ নও, দেবতা।

শুক তারা

॥ এক ॥

কয়েকদিন পরে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের বাহিনী দেবল থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে তাঁবু ফেলেছিল। রাত্রির তৃতীয় যামে উঠে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম তাহাজ্জুদের নামায পড়লেন এবং যুবায়রকে সাথে নিয়ে শিবিরের চতুর্দিকে একবার ঘুরে এলেন। সমস্ত দিনের ক্লান্ত সৈন্য গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল। প্রহরীরা নিজ নিজ স্থানে সতর্ক হয়ে দন্ডায়মান ছিল। সমুদ্রাগত আর্দ্র বায়ুতে কয়েক ঘন্টা ঘুমিয়ে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যংগে শৈথিল্য অনুভব করছিলেন। তিনি যুবায়রকে বললেন- আসুন, আমরা এই টিলার উপরে উঠি। দেখি, কে আগে চড়তে পারে। হুঁশিয়ার, এক-দুই-তিন।

উভয়ে দৌড়ে টিলার শিখরের কাছে পৌছলেন। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম যুবায়রের কয়েক পদ আগে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু উপর থেকে প্রহরী হাঁক দিল- থাম, কে?

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম থেমে জবাব দিলেন- মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম।

প্রহরীর কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে বলল- প্রধান সেনাপতি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা কর্তব্যের প্রতি উদাসীন নই। ততক্ষণে যুবায়র মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের সঙ্গে মিলিত হলেন। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম সমুদ্রের নির্মল হাওয়ায় কয়েকটি গভীর শ্বাস নিলেন এবং চারদিকে দৃষ্টিপাত করলেন। কৃষ্ণা দ্বিতীয়বার চন্দ্রলোকে নক্ষত্রগুলো নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। উড়ন্ত জোনাকীর আলো ভোরের প্রদীপের মত মনে হচ্ছিল। চন্দ্রালোকে নীল সমুদ্রের জলরাশি উজ্জ্বল দর্পণের ন্যায় চক্‌চক্ করছিল। পূর্বাকাশে শুকতারা দেখা দিল। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম বললেন- যুবায়র দেখুন, এ নক্ষত্রটি দেখছেন, এর গুরুত্ব কত বেশী অথচ এর জীবন কত ক্ষণস্থায়ী। প্রতি উষায় পৃথিবীকে সূর্যের আগমন বার্তা দিয়েই সে অপসৃত হয়। অন্য সূর্যের মুখ থেকে অন্ধকারে অবগুন্ঠন সরিয়ে নিজের মুখ ঢেকে নেয়। তা সত্ত্বেও এ নক্ষত্রটির যে গুরুত্ব রয়েছে, অন্য তারকার তা নেই। অন্যান্য তারকার মত এও যদি সারা রাত্রি চমকাতো, তা হলে আমাদের চোখে এর মর্যাদা এত উচ্চ হতো না। প্রতি রাতে আকাশে আমরা কোটি কোটি তারকা দেখতে পাই, কিন্তু এ শুকতারাটি আমাদের মনযোগ আকর্ষণ করে সবচেয়ে বেশী। সাধারণ নক্ষত্রের জীবন-মৃত্যু আমাদের পক্ষে বিশেষ কোন অর্থ জ্ঞাপক নয়। ঠিক সে সব লোকের মত, যারা কয়েক বছর দুনিয়ায় উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপন করে মরে যায়, যারা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জীবনকে আঁকড়ে থাকতে চায় অথচ পৃথিবীকে স্বীয় জীবন-মৃত্যুর উদ্দেশ্য বুঝাতে অক্ষম। যুবায়র, এ নক্ষত্রটির ক্ষণিক জীবনের প্রতি হিংসা হয়। এ জীবন যেমনি ক্ষণিক, তার উদ্দেশ্য তেমনি উচ্চ। সে যেন দুনিয়াকে ডেকে

বলছে, আমার ক্ষণিক জীবনের জন্য দুঃখ করো না। বিধাতা আমাকে সূর্যের আগমনী ঘোষণা করতেই পাঠিয়েছেন। আমার কর্তব্য সম্পন্ন করে আমি যাচ্ছি। হায়, আমি যদি শুকতারার মতই এদেশে ইসলামের আগমনী ঘোষণা করতে পারতাম।

যুবায়র মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর চেহারায় শিশুর সারল্য, চন্দ্রের সৌন্দর্য, সূর্যের গৌরব এবং শুকতারার সুষমা একত্রিত হয়ে এক অপূর্ব শোভা সৃষ্টি করেছিল।

কয়েক গজ দূরে এক প্রহরী হাক দিল- থামো, কে?

নীচের দিক থেকে জবাব এল- আমি সা'আদ।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে সা'আদকে সিন্ধী পোশাকে টিলায় আরোহণ করতে দেখে প্রহরীকে ডেকে বললেন- ওকে আমার কাছে আসতে দাও।

সা'আদ টিলায় চড়ে শিবিরের দিকে নামতে চাইল। কিন্তু প্রহরী তার পথরোধ করল। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের দিকে দেখিয়ে বলল- আগে ওদিকে যাও।

সা'আদ বেপরোয়াভাবে জবাব দিল- না, আমি প্রধান সেনাপতির সাথে দেখা করার আগে অন্য কারো সাথে কথা বলতে পারব না।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম ডেকে বললেন- সা'আদ, আমি এখানে।

সা'আদ চমকে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের দিকে তাকাল এবং অগ্রসর হল।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম বললেন- বল, কি খবর এনেছ?

সা'আদ জবাব দিল- দেবল-রক্ষী সৈন্যের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার। আমার মনে হয়, সিন্ধুর অন্যান্য শহর থেকে আরো সাহায্যের প্রতীক্ষায় তারা কিল্লায় থেকে যুদ্ধ করতে চেষ্টা করবে।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম বললেন- আমি যদি এখানে আরো দু'তিন দিন থাকি, তাহলে শহর থেকে বের হয়ে আমাদের উপর তাদের আক্রমণ করার সম্ভাবনা আছে কি?

সা'আদ উত্তর দিল- এরূপ কোন সংকেত পাওয়া যাচ্ছে না। লাসবেলার পার্বত্য দুর্গ জয় হওয়ার পর অসমতল ভূমিতে যুদ্ধ করা শত্রুপক্ষ সুবিধাজনক মনে করছে না।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম বললেন- তাহলে অবিলম্বেই আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত।

॥ দুই ॥

পাঁচদিন হয় দেবল অবরোধ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের সৈন্য 'দব্বাবা'র সাহায্যে কয়েকবার শহরের প্রাচীরে উঠবার চেষ্টা করেছে কিন্তু সফল হয়নি। কাঠের 'দব্বাবা' প্রাচীরের কাছে পৌছতেই রাজসৈন্য তার উপর জ্বলন্ত তেল ঢেলে দিত। কাজেই অগ্নিশিখার সম্মুখে মুসলিম সৈন্য আর অগ্রসর হতে পারে না। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম সঙ্গে একটি বৃহৎ (মিনজানীক) (ক্ষেপণ যন্ত্র) এনেছিলেন। সেটা টানতে পাঁচশত লোক লাগত। তার নাম 'বিয়ের কনে' (আরূস)। নামটি বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করে। পার্বত্য পথের অসমতার দরুণ 'বিয়ের কনে'কে সমুদ্র পথে দেবলের কাছে

এনে তীরে নামানো হয়। অবরোধের পঞ্চম দিন মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের সৈন্যরা তাকে ঠেলে নগর-প্রকারের সম্মুখে উপস্থিত করে। এর আগে কয়েকটি ছোট ছোট 'মিনজানীক' এর আক্রমণে প্রাচীরের কয়েক স্থান দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। নগররক্ষীদল 'বিয়ের কনে'র অসাধারণ প্রকান্ড অবয়ব ও দৃঢ়তা উপলব্ধি করে ভীত হয়ে গেল। সন্ধ্যার পূর্বেই 'বিয়ের কনে'র সাহায্যে কয়েকটি ভারী পাথর শহরে নিক্ষিপ্ত হল। রাজা অনুভব করলেন দেবলের শক্ত প্রাচীরও এ ভয়ংকর যন্ত্রের সামনে বেশীদিন টিকবে না।

ষষ্ঠ দিন প্রভাত হতে না হতেই মুহম্মদ ইবন কাসিম 'বিয়ের কনে'র সাহায্যে শহরের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ শুরু করলেন। শহরের মাঝখানে একটি উচ্চ গুম্বজের উপর লাল নিশান উড়ছিল। মন্দির চূড়ার উচ্চতার দরুণ এ নিশানটি অন্যান্য নিশানের তুলনায় সর্বোচ্চ স্থাপিত ছিল। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম এ পতাকার গুরুত্ব অনুভব করলেন। কথিত আছে দেবলের শাসনকর্তা দ্বারা উৎপীড়িত এক ব্রাহ্মণ শহর থেকে পালিয়ে এসে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমকে জানিয়ে দেন উক্ত পতাকা পতিত না হওয়া পর্যন্ত শহরবাসীর মনোবল অক্ষুণ্ণ থাকবে।

'মিনজানীক' ব্যবহারের মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম অসাধারণ নৈপুণ্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি 'বিয়ের কনে'র গতিমুখ ঠিক করে সৈন্যদের প্রস্তর নিক্ষেপের হুকুম দিলেন। ভারী প্রস্তরাঘাতে মন্দির চূড়ান্ত চূর্ণ হতে এবং সঙ্গে সঙ্গে লাল পতাকা পতিত হতে লাগল।

মন্দির-চূড়া ধ্বংস হয়ে রক্তনিশান পতিত হওয়ায় রাজার কুসংস্কারাচ্ছন্ন সৈন্যদের সাহস নষ্ট হয়ে গেল। তা সত্ত্বেও তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত মুসমিল বাহিনীকে দুর্গের কাছে ভিড়তে দিল না। গোধুলির অন্ধকারে প্রাচীরের তীরন্দাযদের রক্ষণকার্য শিথিল হয়ে গেল। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম এক চূড়ান্ত আক্রমণের আদেশ দিলেন। তাঁর সৈন্যগণ 'আল্লাহু আকবর' রবে 'দব্বাবা', রজ্জু সিঁড়ি এর ফাঁদের সাহায্যে দুর্গ-প্রাকারে আরোহণ করতে লাগল।

রাজ-সৈন্য রাত তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত বাধা দিল। কিন্তু ইতিমধ্যে মুসলমানদের শত শত সৈন্য দুর্গ-প্রাকারের উপর উঠে পড়েছিল। 'মনজানীক' এর প্রস্তর নিক্ষেপের দরুণ দুর্গ-প্রাচীর এক স্থানে রাজা দাহির অবস্থা সংগীন দেখে শহরের পূর্ব দরজা খুলে দিলেন। হাতীর সাহায্যে রাস্তা পরিষ্কার করে সৈন্যরা বাইরে বের হয়ে গেল। মুসলমান সৈন্য নগর-প্রাচীরের চারদিকে বিভক্ত থাকায় দরজায় বিশেষ কার্যকরী বাধা দিতে পারল না। পূর্ব ফটকের কাছে হাতী তাদের অবরোধ ভেঙ্গে বের হয়ে গেল এবং হাতীর পিছনে রাজা ত্রিশ হাজার সৈন্য যুদ্ধ করতে করতে বের হয়ে গেল। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের সৈন্য চারদিক থেকে ঘিরে এসে দরজায় আবার প্রচন্ড আক্রমণ করে দিল এবং বাকী সৈন্যের বহির্গমনের পথে প্রবল বাধা সৃষ্টি করল। রাজভক্তির চেয়ে তাদের মনে স্ব স্ব পরিণামের ভয় ছিল বেশী। তারা রাস্তা পরিষ্কার করার জন্য কয়েকবার প্রবল আক্রমণ করল। কিন্তু মুসলমানগণ মুহূর্তের মধ্যেই দরজার সামনে মৃতদেহের স্তুপ গড়ে তুলল। রাজসৈন্য সাহস হারিয়ে পিছনে সরতে লাগল। মুসলমান সৈন্য এক প্রবল স্রোতের মত

শহরের ভেতরে প্রবেশ করল।

ইতিমধ্যে অন্য পথেও কয়েকটি ছোট ছোট দল নগর-প্রাচীরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল।

রাজার অবশিষ্ট সৈন্য চতুর্দিক থেকে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি শুনে আত্মসমর্পণ করল।

॥ তিন ॥

মুহম্মদ ইবন কাসিম স্বীয় সৈন্যসহ দেবলের শাসনকর্তার প্রাসাদে ফজরের নামায পড়লেন। সূর্যোদয়ের সময় দেবলের ভীত নগরবাসীগণ ছাদের উপর দাঁড়িয়ে বিজয়ী বাহিনীর সতের বছর বয়স্ক সেনাপতির শোভাযাত্রা দেখছিল। বেলা দুর্গ বিজয়ের পর মুহম্মদ ইবন কাসিম যে সব বন্দীকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং যে সব আহতদের সেবা শুশ্রূষা করেছিলেন তারা জনাধারণকে ভারতে এক নতুন দেবতার আগমনী সংবাদ পূর্বেই জ্ঞাপন করেছিল। তাঁর বয়সের অল্পতা, বীরত্ব এবং দয়ামায়া সম্বন্ধে এবং সব কাহিনী প্রচারিত হয়েছিল স্বেচ্ছাচারী শাসনে উৎপীড়িত জনসাধারণ যার সত্যতা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। গত কয়েক দিন রাজসৈন্য দেবলবাসীকে যথেষ্ট উৎপীড়ন করেছে। রাজসৈন্য দেবলে পৌঁছবার পর থেকে তারা 'আপন ঘরে পরবাসী' হয়ে পড়েছিল। সৈন্যরা রাত্রে মত্তাবস্থায় লোকের ঘরে প্রবেশ করে লুটপাট ও ব্যভিচার চালিয়ে যেত। প্রভাতে লজ্জা-সংকোচে দেবীরা ছিন্ন বস্ত্র ও বিস্রস্ত কেশ নিয়ে বাজারে ভ্রাম্যমান রাজকর্মচারীদের কাছে উৎপীড়নের করুণ কাহিনী বর্ণনা করত। কিন্তু উত্তরে লজ্জাজনক এক উচ্চ হাসি ব্যতীত অন্য প্রতিকার তারা পেত না।

স্বজাতীয় সৈন্যের এ ব্যবহার দেখার পর দেবলবাসীগণ মুহম্মদ ইবন কাসিমের দয়া ও ক্ষমা সম্বন্ধে বহু কাহিনী শোনা সত্ত্বেও বিজয়ী সৈন্যের কাছে সদ্ব্যবহার আশা করতে ভরসা পাচ্ছিল না। কিন্তু মুহম্মদ ইবন কাসিমের সৈন্য যখন নিজেদের প্রধান সেনাপতির মতই সংযত নত দৃষ্টি নিয়ে দেবলের একটি বাজার অতিক্রম করল তখন নগরবাসীর সন্দেহ ক্রমে ক্রমে দূর হতে লাগল। তখন পুরুষদের সাথে নারীরাও মিছিল দেখার জন্য ছাদে উঠে ভিড় করে দাঁড়াল। শহর পরিক্রম করে মুহম্মদ ইবন কাসিম যখন পুনরায় প্রাসাদের কাছে এসে পৌঁছলেন, এক অভিন্ন যৌবনা বালিকা ছুটে এসে তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়াল। নিজের ঠোঁট কামড়িয়ে ধরে মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে সে মুহম্মদ ইবন কাসিমের দিকে তাকাতে লাগল। তার করবী বিস্রস্ত, কমনীয় চেহারায় নখের আঁচড় এবং দুঃখ ও ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ ছিল। মুহম্মদ ইবন কাসিমের চোখে মনে হল যেন একটি কমনীয় গোলাপ ফুলকে কোন নির্দয় হস্ত রগড়ে পিষে দিয়েছে।

তিনি দোভাষীর সাহায্যে তাকে বললেন- মহাশয়া, এ যদি আমার কোন সৈনিকের কাজ হয় তাহলে আপনার চোখের সামনেই আমি তাকে কতল করে ফেলব।

বালিকা মাথা নেড়ে অস্বীকার করল। তাঁর ওষ্ঠ কম্পিত এবং চোখ থেকে অশ্রুধারা

ফেটে পড়ছিল।

এক সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ অগ্রসর হয়ে করযোড়ে বললো- অন্নদাতা, যে সব বালিকা বর্বর রাজ-সৈন্যের দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছে এ তাদেরই একজন। আপনার কাছে সুবিচার প্রার্থনা করতে এসেছে।

উক্ত বৃদ্ধের কথা তরজমা করতে গিয়ে নাসিরুদ্দীন মুহম্মদ ইবন কাসিমকে জানালেন যে, বৃদ্ধটি দেবলের পুরোহিত।

মুহম্মদ ইবন কাসিম জবাব দিলেন- আপনি আমার সামনে করজোড়ে দাঁড়াবেন না। এ বালিকার প্রতি যে অত্যাচার করা হয়েছে তার প্রতিকার করা হবে আমার প্রথম কর্তব্য। রাজার বারো হাজার সৈন্য আমাদের হাতে বন্দী হয়েছে। আপনি একে তাদের কাছে নিয়ে যান। তাদের কেউ অপরাধী হলে তাকে আমি আপনাদের হাতে সমর্পণ করব। নইলে এদেশের শেষ সীমা পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করে অপরাধীকে ধরে আনব।

বালিকা বলল দেবলের শাসনকর্তাই আমার উৎপীড়ক। পরশুদিন সে আমার পিতাকে বন্দী করে এবং আমাকে ...। এ পর্যন্ত বলে তার কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যায়। নয়ন হতে আবার অশ্রু উথলে ওঠে। মুহম্মদ ইবন কাসিম তাঁর এক সেনাপতিকে ডেকে বললেন, আমি দেবলের সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দিচ্ছি। তুমি বন্দীশালার দরজা খুলে দাও।

॥ চার ॥

পরদিন দেবলের বৃহত্তম মন্দিরের পুরোহিত পূজারীদের কাছে প্রচার করছিল এক তরুণ আরবের রূপ ধরে ভগবানের নব অবতারের আবির্ভাব হয়েছে। দেবলের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর দেবলের ত্রাণকর্তার প্রতি ভক্তি ও প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নগরের শ্রেষ্ঠ মন্দিরের সৌন্দর্য বর্দ্ধনের জন্য উক্ত তরুণ সেনাপতি প্রস্তরমূর্তি খোদাইয়ের কাজ আরম্ভ করেছিল। যুদ্ধে নিহতদের উত্তরাধিকারীদের জন্য মুহম্মদ ইবন কাসিম যোগ্য ভাতা মনযুর করেন। নাসিরুদ্দীনকে তিনি দেবলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। যে মন্দিরটি 'মিনজানীক' দ্বারা প্রস্তরঘাতে চূর্ণ হয়েছিল তার মেরামতের জন্য মোটা টাকা প্রদান করেন।

দশদিন পরে তিনি নীরূনের দিকে যাত্রা করেন। ইতিমধ্যে তাঁর সদ্ব্যবহারে দেবলবাসী মুগ্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধের অসি-ক্ষতও শুকিয়ে আসছিল। তিনি অধিকাংশ নগরবাসীর হৃদয় জয় করতে সম্পূর্ণ সক্ষম হন। দেবল থেকে বিদায় নেয়ার সময় হাজার হাজার নরনারী ও বৃদ্ধ কৃতজ্ঞতার অশ্রুজলে তাঁকে বিদায় দেয়। দেবলের পাঁচ হাজার সৈন্য তাঁর সৈন্য বাহিনীতে ইতিমধ্যেই যোগ দিয়েছিল।

বিদায়ের পূর্বে মুহম্মদ ইবন কাসিম যুবায়র, খালিদ ও যুহ্‌রাকে নাসিরুদ্দীনের সাথে দেবলে অবস্থান করার অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু শহরের প্রাসাদে বিলাসী জীবন যাপনের পরিবর্তে রণক্ষেত্রে কষ্টের জীবনকেই তারা বেশী পছন্দ করেন। তবুও মুহম্মদ ইবন কাসিমের সাথে একমত হয়ে যুবায়র ও খালিদ, নাহীদ ও যুহ্‌রাকে দেবলে রেখে গেলেন।

সিন্ধুর নব সৈন্যাধ্যক্ষ

॥ এক ॥

নীরুন দুর্গের এক প্রশস্ত ঘরে রাজা দাহির এক স্বর্ণ-সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। সিন্ধুর সেনাপতি উদয় সিংহ এবং যুবরাজ জয়সিংহ তাঁর সামনে দন্ডায়মান ছিলেন। উদয় সিংহ বলেন- মহারাজ, অনুমতি হলে ভীম সিংহকে ভেতরে ডেকে আনি।

রাজা তিক্ত স্বরে বললেন- আমি তার মুখ দেখতে চাই না। তোমার পুত্র না হলে তাকে আমি মত্ত হস্তী দ্বারা পিষে মারতাম।

উদয় সিংহ বলেন- মহারাজ, সে নিরপরাধ। আমরা পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে দেবল রক্ষা করতে পারিনি। আর সে বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে কি করে তার পথ রোধ করবে?

কিন্তু সে দাবী নিয়ে গিয়েছিল সে শত্রুকে পার্বত্য অঞ্চল থেকে অগ্রসর হতে দেবে না। সে বলেছিল যদি শত্রুবাহিনী আমাদের বিশ হাজার সৈন্যের প্রস্তর বর্ষণের ফলে ডুবে না যায়, তবে সে ফিরে এসে মুখ দেখাবে না।

মহারাজ, আমি তাকে কখনো সমর্থন করিনি। ওর বীরত্ব সম্বন্ধে আমার মোটেই ভুল ধারণা ছিল না। যদি দেবলে আমাদের পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের তীর বর্ষণের মধ্যে তারা ফাঁদ ফেলে দুর্গ-প্রাচীরে উঠতে পারে, তবে বিশ হাজার সৈন্যের প্রস্তর বর্ষণ তাদের পার্বত্য অঞ্চল দখলে কি করে বাধা দিতে পারত।

রাজা গর্জে বললেন- আমার সামনে দেবলের পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের নাম নিও না তাদের অর্ধেকেরও বেশী ছিল দেবলের ভীরু ব্যবসায়ী। হায়, আমি যদি আগে জানতাম যে প্রতাপরায় দেবলের রাজকোষ শূন্য করে যোদ্ধার পরিবর্তে কতগুলো শৃগাল পুষেছে।

উদয় সিংহ বলেন- মহারাজ, আপনার দেবল যাওয়ার বিরুদ্ধে আমি প্রথম থেকেই আপত্তি তুলেছিলাম। রাজা পরাজিত হয়ে পালিয়ে এলে সৈন্যের উপর তার প্রভাব অত্যন্ত খারাপ হয়।

রাজা বললেন- ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমি তোমার কথা শুনিনি। নইলে, এ ত্রিশ হাজার সৈন্যও বেঁচে আসতে পারত না।

উদয় সিংহ বলেন- মহারাজ, আপনি যদি অত তাড়াতাড়ি পালিয়ে ....

রাজকুমার জয় সিংহ উদয় সিংহের কথা শেষ হতে দিলেন না। তিনি চীৎকার দিয়ে বললেন- উদয় সিংহ, সাবধানে কথা বল। তোমার মত নিষ্কর্মা ও ভীরু সহকর্মী থাকার দরুণই তো দেবল ছেড়ে চলে আসতে হল।

উদয় সিংহের ধৈর্যের সীমা শেষ হয়ে গিয়েছিল। তবুও সংযত স্বরে বললেন- রাজকুমার, আপনি জানেন মহারাজের সম্মান আমার চেয়ে বেশী কারো হৃদয়ে নেই। আপনি একথাও জানেন ভীম সিংহ কাপুরুষ নয়। সে আপনার সাথে খেলা করেছে।

সে কাপুরুষ নয় তবে নির্বোধ নিশ্চয়। তবুও আমি পিতাজীকে অনুরোধ করছি তাকে এখানে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক।

রাজা জয় সিংহের দিকে তাকালেন। তারপর উদয় সিংহকে সম্বোধন করে বললেন- ডাক তাকে।

উদয় সিংহ দরজায় এক প্রহরীকে ইশারা করলেন। সে বাইরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ভীম সিংহ প্রবেশ করলেন। অভিবাদনের পর করযোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাজা জিজ্ঞেস করলেন- তুমি পরাজয়ের পর সোজা দেবলে গেলে না কেন?

ভীম সিংহ বললেন- মহারাজ, আমার জানা ছিল না যে আপনি দেবলে পৌছে যাবেন। আমি আপনাকে কয়েকটি গুরুতর কথা নিবেদন করার জন্য নীরুনে পৌছা আবশ্যক মনে করেছিলাম।

কিন্তু বাকী সৈন্যসহ দেবলে পৌছা তোমার কর্তব্য ছিল।

মহারাজের বোধ হয় জানা নেই আমি আহত হয়ে কিছুদিন শত্রুর হাতে বন্দী ছিলাম। মুক্তি পাওয়ার পরে আমার সাথে মাত্র কয়েকজন আহত সৈনিক ছিল। তাদেরকে কোন নিরাপদ স্থানে পৌছান আমার কর্তব্য ছিল।

রাজা বললেন- ভীম সিংহ, দেবল ও বেলার যুদ্ধে আমাদের পরাজয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তোমার। পার্বত্যাঞ্চলে তুমি শত্রুর পথরোধ করতে পারলে দেবলে আমাদের পরাজয় হত না। তোমার পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি তোমাকে এ সুযোগ দিয়েছিলাম। এখন আমি সিদ্ধান্ত করেছি ভবিষ্যতে কোন অভিযানের নেতৃত্ব তোমাকে দেওয়া হবে না।

ভীম সিংহ জবাব দিলেন- মহারাজ আমি নিজেও কোন দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই।

রাজা কটমট করে ভীম সিংহের দিকে তাকিয়ে বললেন- তবে এখানে কি জন্য এসেছ।

উদয় সিংহ পুত্রের উত্তরে ত্রস্ত হয়ে বললেন- মহারাজ, ভীম সিংহ বলতে চায় তার কোন উচ্চ পদের অভিলাষ নেই। আপনার বিজয়ের জন্য সে এক সাধারণ সৈনিক হিসাবে যুদ্ধ করাই গর্বের বিষয় মনে করে। ভীম সিংহ, অন্নদাতা তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর পা ধর।

ভীম সিংহ উত্তর দিলেন- পিতাজী, অন্নদাতার সম্মান আমি সর্বান্তঃকরণে করছি। কিন্তু তাঁর সামনে আমি মিথ্যা বলতে পারব না। আমি আহত ছিলাম। শত্রু সৈন্যের প্রধান সেনাপতি নিজ হাতে আমার ক্ষতে ঔষধ লাগিয়েছেন। আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ না করার প্রতিজ্ঞা না নিয়েই আমাকে মুক্তি

দিয়েছেন। আমাকে এখানে আসার জন্য নিজের ঘোড়া দিয়েছেন।

উদয় সিংহ আবার বাধা দিয়ে বললেন- আমাদের শত্রু অত্যন্ত ধূর্ত। সে মনে করেছিল এরূপ তোষামোদ করে সে ভীম সিংহকে ফুসলাতে পারবে। সে তো আর জানে না ভীম সিংহের বাপ-দাদা মহারাজের দাসানুদাস এবং তার শিরায় রাজপুতের রক্ত প্রবাহিত। সে আপনার জন্য শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত বিসর্জন দেবে।

ভীম সিংহ বলেন- পিতাজী, তিনি আমার প্রাণ রক্ষা না করলে আমার শেষ রক্তবিন্দু তখনই রণক্ষেত্রে ক্ষরিত হয়ে যেত। কি উদ্দেশ্য তিনি আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন তা আমি জানি না। কিন্তু এখন আমি তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে পারব না।

ভীম সিংহ স্বীয় অসি খুলে রাজার সামনে রাখতে রাখতে বললেন- মহারাজ, এ তরবারী আমাকে আপনি দিয়েছেন। অনুমতি করুন।

রাজা ক্রোধে কাঁপতে লাগলেন। রাজকুমার ভীম সিংহের হাত থেকে অসি কেড়ে নিয়ে বলেন- ভীরু ইতর।

উদয় সিংহ বলতে লাগলেন- ভীম সিংহ, তোমার কি হয়েছে? মহারাজের কাছে ক্ষমা চাও। তিনি তোমার অপরাধ ক্ষমা করবেন। ভীম সিংহ আমাকে লজ্জিত কর না। জগত কি বলবে? তুমি তো বলছিলে যে তুমি যুদ্ধ সম্বন্ধে মহারাজকে এক গুরুতর পরামর্শ দিতে এসেছ। মহারাজ, মহারাজ, আমার পুত্র নিরপরাধ। শত্রু একে যাদু করেছে।

ভীম সিংহ বলেন- হাঁ, তিনি আমাকে যাদু করেছেন। যদি আপনি তাঁকে বুঝতে চেষ্টা না করেন তবে সমস্ত সিন্ধু তাঁর যাদুতে বশীভূত হয়ে যাবে। মহারাজ, আমি আপনাকে তাঁর যাদু থেকে বাঁচবার উপায় বলতে এসেছিলাম।

উদয় সিংহ চীৎকার দিয়ে বললেন- ভীম সিংহ, ভগবানের দোহাই, তুমি যাও।

রাজা বললেন- উদয় সিংহ, তুমি চুপ থাক। তোমার পুত্র আমার অনুমতিতে এখানে এসেছে। আমার অনুমতি ছাড়া যেতে পারে না। হাঁ, ভীম সিংহ, তুমি আমাকে শত্রুর যাদু থেকে বাঁচবার উপায় বলছিলে।

ভীম সিংহ বললেন- মহারাজ, একমাত্র উপায় হচ্ছে আপনি আরব ও লংকার বন্দীদের শত্রুর হাতে সমর্পণ করে দিন। নইলে আরব থেকে আমাদের বিরুদ্ধে যে ঝড় উঠেছে তার প্রতিবন্ধক দেখছি না।

রাজা হঠাৎ আসন থেকে উঠে বললেন- তুমি এখন শত্রুর পক্ষ নিয়ে আমাকে তার ভয় দেখাতে এসেছ?

ভীম সিংহ শান্ত স্বরে বললেন- মহরাজ, আপনি দেবলে তাকে দেখে নিয়েছেন।

রাজা চীৎকার দিয়ে বললেন- দেবল, দেবল। আমার সামনে দেবলের উল্লেখ কর না। সেখানকার মন্দির-চূড়া ভেঙ্গে যাওয়ায় তোমার মত ভীরু সৈন্যের মনোবল ভেঙ্গে যায়।

মহারাজ, আমি ভীরু নই।

তা'হলে এর অর্থ হলো আমি ভীরু। কে আছো?

উদয় সিংহ করজোড়ে কম্পিত স্বরে বললেন- মহারাজ, মহারাজ এর অপরাধ ক্ষমা করুন। সাত পুরুষ ধরে মহারাজের সেবা করছি।

রাজা উগ্রস্বরে বললেন- তোমার বংশের সেবার প্রয়োজন নেই আমার।

নগ্ন তরবারী নিয়ে পনর-বিশজন প্রহরী ঘরে প্রবেশ করে রাজার আদেশের প্রতীক্ষা করতে লাগল। ভীম সিংহের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বললেন- একে নিয়ে যাও এবং নীরূনের বন্দীশালার সবচেয়ে অন্ধকার কুঠরিতে বদ্ধ করে রাখ।

উদয় সিংহ বললেন- মহারাজ, এ অপরাধ ক্ষমা করে দিন। এ আমার একমাত্র পুত্র।

জয় সিংহ অগ্রসর হয়ে রাজার কানে কি যেন বললেন। রাজা উদয় সিংহকে জবাব দিলেন- তুমিও এর সাথে যেতে পার। সিন্ধু দেশে তোমার মত সেনাপতির প্রয়োজন নেই।

পেছনের কামরার পরদা সরিয়ে রাণী লাটী তাড়াতাড়ি রাজার কাছে এসে [illegible]তে লাগলেন- মহারাজ, এ কী করছেন? উদয় সিংহ সৈন্যদের সেনাপতি। তার [illegible] দুর্ব্যবহার সৈন্যরা সহ্য করবে না।

জয় সিংহ তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন- সৈন্যরা যখন জানতে পারবে পিতা-পুত্র উভয়ে শত্রুর সাথে মিলিত হয়েছে তখন তারা সব কিছুই সহ্য করবে।

রাণী বললেন- বৎস, শত্রু মাথার উপর দন্ডায়মান। এখন আত্মকলহের সময় নয়।

জয় সিংহ উত্তর দিরেন- দেবল ছিল শত্রুর শেষ লক্ষ্যস্থল। তারা সিন্ধু নদী অতিক্রম করতে পারবে না। পিতাজী, আপনি চিন্তা করবেন না। কয়েকদিনের মধ্যে মুলতান থেকে কণৌজ পর্যন্ত সমস্ত রাজা ও নেতৃবর্গ আমাদের সাহায্যের জন্য এসে পৌছবেন। আমরা শত্রুকে এমনভাবে পরাজিত করব যা সে স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না। আমার পরামর্শ এই যে এদের দু'জনকে এখানে না রেখে আরবারে পাঠিয়ে দেয়া হোক। প্রহরীগণ, কি দেখছ? তোমরা মহারাজের আদেশ শোননি কি? এদের নিয়ে যাও।

প্রহরীরা অগ্রসর হল। কিন্তু উদয় সিংহ ইঙ্গিতে তাদেরকে নিরস্ত করে নিজের অসি বের করলেন। জয় সিংহকে সম্বোধন করে বললেন, এই নিন সেনাপতির তরবারী। সিন্ধুর সৈন্য শত্রু সৈন্যের উপর জয়লাভ করুক, এর চেয়ে অধিক কাম্য আমার কিছুই নেই।

জয় সিংহ তরবারীটি তুলে নেওয়ার পরিবর্তে কেড়ে নিলেন। তিনি বললেন, আমাদের বিজয়ের জন্য তোমার প্রার্থনার প্রয়োজন নেই।

সন্ধ্যার সময়, উদয় সিংহ ও ভীম সিংহ কতিপয় সৈন্যের প্রহরায় আরোর যাত্রা করলেন। নীরূনের মন্দিরে মন্দিরে নব সেনাপতি জয় সিংহের জয়ের জন্য পূজা প্রার্থনা হতে লাগল।

॥ দুই ॥

রাজার হুকুম মত ভীম সিংহ ও উদয় সিংহকে আরোর বন্দীশালার তৃতীয় খানায় বন্ধ করে রাখা হল। উক্ত কুঠরীতে আগে থেকেই আর একজন বন্দী ছিল। নতুন বন্দীদের দেখেই সে ভাংগা ভাংগা সিন্ধী ভাষায় বলল, স্থান সংকীর্ণ বটে। তবু আমরা তিনজন থাকতে পারব। তোমরা কে এবং এখানে কি করে এলে?

উত্তর দেয়ার পরিবর্তে ভীম সিংহ ও উদয় সিংহ অন্ধকারে বন্দীকে দেখার জন্য চোখ বড় করে তাকাতে লাগ্‌লেন। বন্দী বলল- হয়ত আপনারা আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না। শীঘ্রই অন্ধকারে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন। বসুন, আপনাদের ক্লান্ত মনে হচ্ছে। আমার ভুল না হয়ে থাকলে আপনারা বোধ হয় পিতা পুত্র।

উদয় সিংহ ও ভীম সিংহ অন্ধকারে হাত প্রসারিত করে সামলে সামলে পা ফেলে অগ্রসর হলেন এবং এক দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়লেন।

বন্দী আবার বলল- মনে হচ্ছে আপনারাও আমার মত নিরপরাধ। মাফ করবেন। সম্ভবতঃ আমার কথা আপনাদের কাছে খারাপ লাগছে। কিন্তু কত মাস যাবত আমি কোন মানুষের সংগে কথা বলিনি। কাজেই আপনাদের দেখে নিজের দুঃখের কথা বলার ও আপনাদের কথা শুনার আগ্রহ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। প্রথম ছ'মাস আমি এ তৃতীয় খানার উপরে একটি প্রশস্ত ঘরে ছিলাম। সেখানে আমার সাথে আপনাদের দেশীয় আরো ছ'জন কয়েদী ছিল। আপনাদের ভাষা আমি তাদের কাছেই শিখি। যদিও ভাষাটি আমি আয়ত্ব করতে পারিনি, তবুও আমার বিশ্বাস আমার বক্তব্য কোন রকমে প্রকাশ করতে পারি। আপনারা আমার কথা বুঝতে পারছেন?

ভীম সিংহ বললেন- তুমি বেশ ভাল সিন্ধী জান।

বন্দী ভীম সিংহের সন্ধিৎসু দৃষ্টি লক্ষ্য করে বলল- বোধ হয়, আপনি এখনো আমাকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছেন না। আমি নিকটে আসছি।

বন্দী এক কোণ থেকে উঠে ভীম সিংহের কাছে এসে বলল- হাঁ, এখন আপনি আমাকে দেখতে পাবেন। কিন্তু আমি আরব দেশের এক মুসলমান। আমার পক্ষে আপনার কাছে বসা বিরক্তিকর লাগবে না তো?

ভীম সিংহ বললেন- তুমি আরব? কিন্তু আরবদের কয়েদী তো ব্রাহ্মণাবাদে ছিল।

কয়েদী জবাব দিল- তারা অন্য লোক হবে। আমি প্রথম থেকে বন্দীশালাতেই আছি।

উদয় সিংহ জিজ্ঞেস করলেন- তুমি লংকা থেকে এসেছিলে? তোমার জাহাজ দেবলের কাছে ডুবেছিল? তোমার নাম আবুল হাসান?

বন্দী তাড়াতাড়ি বলল- ডুবে নি। ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হাঁ আপনি ব্রাহ্মণাবাদের আরব কয়েদীদের সম্বন্ধে কিছু বলছিলেন। তারা এদেশে কি করে এল? আমার জাহাজ থেকে তো মাত্র চারজন লোক বেঁচেছিল। দু'জন আহত ছিল। তারা দেবল থেকে আরোর পর্যন্ত আসবার পথেই মারা যায়। তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষত সামান্য ছিল। সেত আমার সামনে এ বন্দীশালাতেই মারা যায়।

ভীম সিংহ বললেন- তোমার জাহাজের পরে লংকা থেকে আরো দু'টি জাহাজ আসে। দেবলের শাসনকর্তা তাদেরও আটক করে।

তারা এখানে কি নিতে এসেছিল?

ভীম সিংহ জবাব দিলেন- তারা লংকা থেকে স্বদেশ যাচ্ছিল।

আপনি তাদের কারোর নাম জানেন?

সে জাহাজগুলোর কাপ্তানকে আমি জানি। তার নাম যুবায়র। সে মুক্ত হয়েছে।

যুবায়র? লংকায় ও নামের কোন আরব ছিল না। সে জাহাজ বোধ হয় অন্য কারো ছিল।

ভীম সিংহ বললেন- যুবায়রকে বসরার শাসনকর্তা লংকা পাঠিয়েছিলেন আরবদের বিধবা নারী ও পিতৃহীন শিশুদের নিয়ে যাবার জন্য।

বন্দী অস্থির হয়ে বলল- নারী ও শিশু। আপনি তাদের কারো নাম জানেন?

তাদের মধ্যে এক যুবকের নাম খালিদ। কিন্তু সে বন্দী নয়।

খালিদ, খালিদ! আমার পুত্র! সে কোথায়?

সে এখন হয়ত দেবলে আছে।

দেবলে? সেখানে সে কি করে? সত্য বল, তুমি তাকে দেখেছ?

আমি মুসলিম বাহিনীর সাথে তাকে লাসবেলায় দেখেছিলাম। তারা এখন দেবল জয় করে নিয়েছে।

কিছুক্ষণ আবুল হাসান কিছুই বলতে পারল না। সে পিট পিট করে পর পর ভীম সিংহ ও উদয় সিংহের দিকে তাকাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে সে কম্পিত স্বরে বলল- সত্যি বল, আমার সাথে পরিহাস করো না।

উদয় সিংহ বললেন- যাদের সাথে বিধাতা পরিহাস করছেন, তারা আবার অন্যের সাথে কোন সাহসে পরিহাস করবে? মুসলিম বাহিনী দেবল জয় করেছে। এখানে আসতেও তাদের বেশী দেরী হবে না।

অনেক্ষণ পর্যন্ত আবুল হাসান কোন কথা বলতে পারল না। তার নয়ন থেকে অশ্রু উথলে পড়ছিল। আনন্দ অশ্রু। কৃতজ্ঞতার অশ্রু। কিন্তু সে হঠাৎ ভীম সিংহের বাহু শক্ত করে ধরে জিজ্ঞেস করল- লংকায় আমার স্ত্রী ও এক কন্যা ছিল। তুমি তাদের কথা কিছু জান?

ভীম সিংহ জবাব দিলেন- আপনার স্ত্রী সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না। হয়ত তিনি ব্রাহ্মণাবাদের বন্দীদের সাথে আছেন। কিন্তু আমি যখন লাসবেলায় আহত মুসলমানদের বন্দী ছিলাম, তখন যুবায়রের সাথে খালিদের বোনের বিয়ে হয়েছিল।

তাহলে সল্মাও তাদের সাথে থাকবে। সে নিশ্চয় তাদের সঙ্গে থাকবে।

উদয় সিংহ জিজ্ঞেস করলেন- সল্মা কে?

আমার স্ত্রী। আপনারা আমাকে বলুন মুসলমান সৈন্য সিন্ধুর উপর কখন এবং কিরূপে আক্রমণ করল।

উত্তরে উদয় সিংহ সংক্ষেপে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের আক্রমণের ঘটনাবলী বর্ণনা করলেন। ভীম সিংহ একটু সবিস্তারে সে কাহিনী আবার বর্ণনা করলেন। তারপর আবুল হাসান তার নিজের কাহিনী শোনাল। সন্ধ্যার মধ্যেই এ তিন বন্দী গভীর বন্ধুতে পরিণত হল এবং মুক্তি লাভের নানা উপায় চিন্তা করতে লাগল।

॥ তিন ॥

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের দেবল হতে নীরূনের দিকে অগ্রসর হওয়ার খবর পেয়ে রাজা দাহির স্বীয় নেতৃবর্গ ও জংগী কর্মচারীদের পরামর্শ চাইলেন। সকলেই জয় সিংহের প্রস্তাব অনুমোদন করল যে, আরবদের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধ সিন্ধু নদীর তীরে ব্রাহ্মণাবাদের নিকট করতে হবে। নীরূণে সামান্য সৈন্য রাখা হবে যারা কেবল কয়েকদিনের জন্য মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের অগ্রগতি ঠেকিয়ে রাখবে। ইত্যবসরে রাজা ও সেনাপতি ব্রাহ্মণাবাদে এক প্রবল সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলবার সুযোগ পাবেন।

গ্রীষ্মকাল এসে পড়েছিল। রাজা দাহির মনে মনে আশা করছিলেন খরস্রোত ও কূলপ্লাবী সিন্ধু নদের উদ্ধত তরঙ্গ দেখে হয়ত মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম আর অগ্রসর হতে সাহস করবেন না। তা হলে সিন্ধুর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ থেকে নতুন সৈন্য সংগ্রহ ছাড়াও প্রতিবেশী রাজ্যসমূহ হতে সাহায্য সংগ্রহের সুযোগ পাওয়া যাবে। তাই তিনি নীরূন রক্ষার জন্য সেখানকার এক প্রভাবশালী ব্রাহ্মণকে নির্বাচন করলেন। ইনি শহরের সর্বপ্রধান পুরোহিত ছিলেন এবং যুদ্ধ বিষয়েও যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। তাঁর কাছে আট হাজার সৈন্য রেখে জয় সিংহ ও বাকী সৈন্যসহ তিনি ব্রাহ্মণাবাদে যাত্রা করলেন।

উক্ত পুরোহিত মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের আগমন যেদিন সম্ভব বলে মনে করেছিল, তার পাঁচদিন আগেই তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে নগর অবরোধ করেন। 'মিনজানীক' দ্বারা নিক্ষিপ্ত ভারী প্রস্তরাঘাতে শহরের শক্ত প্রাচীর কেঁপে উঠল। তৃতীয় দিন 'দব্বাবার' সাহায্যে নগর-প্রাকারের উপর হানাদারদের আক্রমণ প্রতিরোধ-ক্ষমতা শহর-রক্ষীগণ যখন হারিয়ে বসেছে, তখন নগরবাসীগণ উপলব্ধি করতে পারল রাজা উক্ত পুরোহিতের জঙ্গী দক্ষতা সম্বন্ধে যথার্থ অনুমান করতে পারেন নি। চতুর্থ দিন মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম, যখন এক চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তখন শহরের ফটক খুলে গেল এবং কয়েকজন পুরোহিত শান্তির পতাকা উড়িয়ে বাইরে এল।

শহর অধিকার করার পর মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম যে ব্যবহার দ্বারা দেবলবাসীর হৃদয় জয় করেছিলেন, নীরূনবাসীর প্রতিও সেরূপ ব্যবহার করলেন। নীরূনের শাসন ব্যবস্থা ঠিক করার পর তিনি সয়ূনের দিকে যাত্রা করলেন। রাজা দাহিরের ভ্রাতুষ্পুত্র বাজারীও সয়ূনের শাসনকর্তা ছিলেন। শহরের অধিকাংশ বাসিন্দা ছিল ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও ব্যবসায়ী। এক সপ্তাহ অবরোধের পর বাজারীও এক রাত্রে শহর থেকে পলায়ন করেন

এবং শহরবাসীগণ আত্মসমর্পণ করে।

সয়ূন বিজয়ের পর কয়েকজন অভিজ্ঞ সেনাপতি মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমকে পরামর্শ দেন যে এখন নদী পার হয়ে ব্রাহ্মণাবাদের দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত যা'তে রাজা দাহির বিশেষ প্রস্তুতির সময় না পান। কিন্তু মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম বললেন- নদীর, এপারেই সবিস্তান একটি বড় শহর রয়েছে। এখন রাজার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্রাহ্মণাবাদের রণসজ্জাকে শক্তিশালী করার দিকে কেন্দ্রীভূত। কাজেই আমরা নরুন এবং সয়ূনের মত সবিস্তানও সহজেই জয় করতে সক্ষম হব। আমরা যদি দেবল থেকে সোজা ব্রাহ্মণাবাদে যেতাম তা হলে নীরুণ ও সয়ূনের সৈন্যরা রাজার পতাকাতলে একত্রিত হওয়ার সুযোগ পেত। আমাদের বিজয় রাজার শক্তি ক্ষয় এবং আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করছে। পরাজিত শহরের কিছু সৈন্য বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। কিছু আমাদের সাথে মিলিত হয়। সামান্য যারা পালিয়ে রাজার কাছে গিয়ে পৌঁছে, তারা সংগে নিয়ে যায় পরাজিত মনোভাব। যে সৈন্যের শতকরা একজনও পরাজিত মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত তাদের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ হলেও আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। আমরা যখন সিন্ধুর সীমানায় প্রবেশ করি, তখন আমাদের সংখ্যা ছিল বার হাজার। এখন দেবল ও বেলার ক্ষতি সত্ত্বেও আমাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় বিশ হাজারে। আমাদের সিন্ধী ভাইয়েরা প্রমাণ করে দেখিয়েছে তাদের যে অসি সত্যের বিরুদ্ধে ভোঁতা প্রমাণিত হয়েছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে তা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের যুক্তি শুনে সমস্ত নেতৃবৃন্দ তাঁর মতই সমর্থন করলেন। বাজরীরাও সয়ূন থেকে পালিয়ে সবিস্তানে জাঠ নরপতি কাকার আশ্রয় নিয়েছিলেন। রাজা কাকা রাজা দাহিরের প্রবল সহায় ছিলেন। তাঁর বীরত্বের কাহিনী সারা-সিন্ধুতে সুপরিচিত ছিল। তা সত্ত্বেও দেবল, নীরূন ও সয়ূন মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের বিরাট জয় তাঁর মনেও খানিকটা ভীতির সঞ্চার করে দিয়েছিল। সবিস্তানের প্রাচীর যথেষ্ট শক্ত ছিল। কিন্তু হানাদারদের 'মিনজানীক' ও 'দব্বাবা' দুর্গবদ্ধ সৈন্যদের পক্ষে বিপজ্জনক মনে করে তারা মুক্ত রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ মনে করল।

॥ চার ॥

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম আক্রমণ করতে করতে সবিস্তানে পৌঁছলেন। কাকার সৈন্য শহরের বাইরে সারিবদ্ধ হয়ে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল। কাকা বীরত্বের চেয়ে উত্তেজনা ও অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিলেন বেশী। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমকে প্রস্তুতির সময় দেওয়া অসঙ্গত মনে করে তিনি হঠাৎ আক্রমণ করে দিলেন। আক্রমণের প্রচণ্ডতা দেখে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম বাহিনীর কেন্দ্রভাগকে খানিকটা পেছনে হটতে আদেশ দিলেন। কাকার সৈন্য কৌশলটি বুঝতে পারল না। তারা জয় আসন্ন মনে করে উন্মাদের মত যুদ্ধ করে অগ্রসর হতে লাগল। পশ্চাদগামী মুসলিম সৈন্য যখন হঠাৎ রুখে এবং সুদৃঢ় লৌহ প্রাচীরের মত দণ্ডায়মান হল তখন কাকা তার ভুল বুঝতে পারলেন। মুসলিম

বাহিনীর উভয় বাহু ঝড়ের ন্যায় কাকার সৈন্যকে ঘিরে ফেলল। চতুর্দিক থেকে প্রচন্ড আক্রমণের চাপ সহ্য করতে না পেরে বাজীরাও রণক্ষেত্র থেকে ছুটে পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে নিহত হলেন। তার মৃত্যুর কাকার সৈন্যের অনেকেই হতাশ হয়ে পড়ল। কাকা কিছুক্ষণ সৈন্যদের সাহস দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু যখন পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বুঝলেন তখন কয়েকজন ভক্ত সঙ্গীসহ বেষ্টনকারী সৈন্যের সারি ভেঙ্গে একদিকে বের হয়ে পড়লেন। কিন্তু মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের সৈন্যরা তার পশ্চাদ্ধাবন করে আবার তাকে ঘিরে ফেলল। তিনি অবশিষ্ট সৈন্যসহ আত্মসমর্পণ করলেন।

তাঁকে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের সামনে নেয়া হলে তিনি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন- এ সৈন্য বাহিনীর প্রধান সেনাপতি আপনি?

মৃদু হেসে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম উত্তর দিলেন- হাঁ, আমিই।

কাকা আরো বিস্মিত হয়ে মুহম্মদ ইবন কাসিমের আপাদমস্তক আর একবার দেখে জিজ্ঞেস করলেন- আমাকে কি শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত করেছেন?

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম জবাব দিলেন- সিন্ধু আক্রমণের পর তুমিই দ্বিতীয় ব্যক্তি যাকে আমি বীরের ন্যায় যুদ্ধ করতে দেখেছি। আমি ভীম সিংহের সাথে যে ব্যবহার করেছি, তোমার সাথেও সেই ব্যবহারই করব। তুমি মুক্ত।

কাকা উত্তর দিলেন- এ মুক্তির জন্য আমার কি মূল্য দিতে হবে?

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম বললেন- আমরা মুক্তির মূল্য আদায় করতে আসি নি।

তবে আপনারা কি জন্য এখানে এসেছেন?

অত্যাচার বন্ধ করতে এবং উৎপীড়িতকে রক্ষা করতে।

কাকা মাথা নত করে কিছুক্ষণ ভেবে বললেন- আমাকে অত্যাচারী বলেই যদি আপনার বিশ্বাস হয় তবে মুক্তি দিতে চান কেন?

এ জন্য যে, নির্যাতন পরাজিত মানবকে অবাধ্য হতে উত্তেজিত করে। আত্ম-সংশোধনে ব্রত করে না।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে কাকা বললেন- আমি শুনেছিলাম আপনি মহৎ যাদুকর। আপনি শত্রুকে বন্ধুতে পরিণত করার প্রণালী জানেন। আমিও কি আপনাদের বন্ধুদের মধ্যে গণ্য হতে পারি? - একথা বলে তিনি করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম সোৎসাহে তার করমর্দন করতে করতে বললেন- আমি আগেও তোমার শত্রু ছিলাম না।

রাজা দাহিরের শেষ পরাজয়

॥ এক ॥

কয়েকদিনের মধ্যে রাজা কাকা তার অবশিষ্ট সৈন্য সজ্জিত করে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের সাথে যোগ দিলেন। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম এখান থেকে ব্রাহ্মণাবাদ যাত্রা করলেন। ব্রাহ্মণাবাদের কয়েক ক্রোশ দূরে নদীর তীরে তাঁবু ফেললেন। নদী পার হওয়ার প্রস্তুতিতে কয়েকদিন কেটে গেল। এ কাজে সা'আদ (গংগু) তাঁর বিশেষ সাহায্যে এল। তার সংগীরা নদীর তীরে অনেক দূর পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের বস্তীতে সিন্ধুর ত্রাণকর্তার আগমন বাণী পৌঁছিয়ে দিল এবং কয়েকদিনের মধ্যে কয়েকজন মাল্লা নিজেদের নৌকাসহ মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমকে সাহায্য করতে এসে উপস্থিত হলো। কিন্তু নদী পার হওয়ার আগে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের ঘোড়ার মধ্যে এক রোগের প্রাদুর্ভাব হল এবং কয়েকদিনের মধ্যে অনেকগুলো ঘোড়া মরে গেল। হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ খবর পেয়েই বসরা থেকে দুই হাজার উটের উপর সিরকা বোঝাই করে পাঠিয়ে দিলেন। এ সিরকা উক্ত রোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী প্রমাণিত হলো।

৭১৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বিনা বাধায় মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম সিন্ধু পার হলেন।

রাজা দাহির প্রায় দু'শো হাতী ছাড়া তার বাহিনীতে পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী এবং কয়েক দল পদাতিক যোগ করে নিয়েছিলেন। জুন মাসের শেষ দিকে নদীর স্রোত প্রবল ছিল। তিনি আশা করেন নি মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম এত তাড়াতাড়ি নদী পার হবেন। স্বীয় বাহিনীকে তিনি তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হবার হুকুম দিলেন। এবং মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের শিবির থেকে প্রায় দু'ক্রোশ দূরে ছাউনি ফেললেন।

কয়েকদিন উভয় দলের ভ্রাম্যমাণ দলের মধ্যে সংঘর্ষ চলল। অবশেষে এক সন্ধ্যায় মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম এক চূড়ান্ত যুদ্ধ করার সংকল্প গ্রহণ করলেন। রাত্রে ইশার নামাযের পর মশালের আলোতে তিনি স্ত্রীর নামে নিম্ন চিঠিখানি লিখে দূতের হাতে দিয়ে দিলেন।

'জীবন-সংগিনী,

আল্লাহ তোমাকে মুজাহিদের স্ত্রীর যোগ্য সংকল্প ও সাহস প্রদান করুন। কাল প্রভাতে শত্রুর অসংখ্য সৈন্যের বিরুদ্ধে এক চূড়ান্ত যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। এ চিঠি তোমার হাতে পৌঁছবার আগেই সিন্ধুর ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। আমার মন বলছে আল্লাহ আমাকে জয়ী করবেন। আমার সৈন্যদের নিয়ে আমি গৌরব বোধ করি। যেসব আরব মাতার স্তন্য এদের শিরায় রক্ত হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তাদের নিয়ে আমি আরো বেশী গর্ব বোধ করি, যাঁরা শৈশবে এদেরকে ঘুম পাড়ানি গানের সাথে বদর ও হুনায়নের কাহিনী শুনিয়েছেন। আমি সেসব পত্নীদের নিয়ে গর্ব বোধ করছি যাদের কর্তব্যবোধ তাদের পতিদের জন্য যোদ্ধার জীবন ও শহীদের মৃত্যু কামনা করতে শিখিয়েছে। যাদের প্রেম তাদের পায়ের শিকল হওয়ার পরিবর্তে তাদেরকে জগৎ জয়ের পাঠ শিক্ষা দিয়েছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যতদিন এসব মুজাহিদের শিরায় এক বিন্দু রক্ত থাকবে ততদিন এরা ইসলামের পতাকাকে নত হতে দেবে না।

তোমার ও মায়ের বিরহে আমি এখনো কাতর হই নি। কিন্তু তোমার স্মৃতিকে আমি ভুলি নি। আমার সাথে যে হাজার হাজার তরুণ আল্লাহর পথে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্ব স্ব স্ত্রী, মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়ের বিচ্ছেদ হাসিমুখে সহ্য করেছে তাদের দিকে যখন আমি তাকাই তখন একথা ভেবে আনন্দ পাই যে আমিও তাদের একজন। বিগত কয়েকটি যুদ্ধ যে-সব যুবক শহীদ হয়েছেন তাদের কারো কারো মা আমাকে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছেন যে তাদের সন্তানেরা তো পালাতে গিয়ে মারা যায়নি। আমি যদি শহীদ হই, আমার বিশ্বাস আমার মাও আমাদের সংগীদেরকে এরূপ প্রশ্নই করবেন।

আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে যতদিন বিধবা নারী ও য়াতীম শিশুরা মুক্তি না পায় ততদিন আমার গতি শিথিল হতে দেব না। এ প্রতিজ্ঞা আমি পালন করব। তুমিও প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে আমি শহীদ হলে তুমি অশ্রুবর্ষণ করবে না। তোমার প্রতিজ্ঞা তুমি পালন করো। আম্মাজানকে আমার সশ্রদ্ধ সালাম জানাবে। আমি তাঁকে পৃথক পত্র দিচ্ছি।

তোমার-
মুহম্মদ।

মাতার নামে আর একখানা চিঠি লিখে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম রণক্ষেত্রের নক্শা দেখতে মগ্ন হয়ে গেলেন।

॥ দুই ॥

ফজরের নামাযের পর মুসলিম সৈন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হলে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম ঘোড়ায় চড়ে এক তেজোময় বক্তৃতা করেন ঃ-

"আল্লাহ ও রসূলের সৈনিকগণ, আজ তোমাদের বীরত্ব, তোমাদের ঈমান ও তোমাদের আত্মোৎসর্গের পরীক্ষার দিন। শত্রুর সংখ্যা দেখে ভীত হয়ো না। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে অধর্ম ও ইসলামের সমস্ত বিগত যুদ্ধেই অসত্যের পতাকাধারীর সংখ্যা সত্যের পূজারীদের তুলনায় বেশী ছিল। সত্য সাধকগণ প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে, তাদের সৈন্যের শক্তি সংখ্যায় নয় বরং ঈমানের দৃঢ়তা ও লক্ষ্যের উচ্চতায় সন্নিহিত। আমাদের যুদ্ধ কোন জাতির বিরুদ্ধে নয়। বরং পৃথিবীর যে সব উদ্ধত লোক জগতে অশান্তির সৃষ্টি করে, তাদের সকলের বিরুদ্ধে। আমরা ভূ-পৃষ্ঠে আমাদের শাসন নয় বরং আল্লাহর শাসন প্রবর্তন করতে চাই। আমরা নিজেদের নিরাপত্তা এবং সংগে সংগে পৃথিবীর সমস্ত লোকের নিরাপত্তা চাই। আল্লাহর দুনিয়ায় নিরাপত্তার একমাত্র পন্থা ইসলাম। এ সে ধর্ম যা প্রভু-ভৃত্য, গৌর-কৃষ্ণ এবং আরব-অনারবের পার্থক্য পৃথিবী হতে মুছে দেয়। আমাদের বাপ-দাদা, এই উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেছিলেন। আল্লাহ তাঁদের মুষ্টিমেয় দলের সম্মুখে পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তি ও প্রতিপত্তির অধিকারী সম্রাটের মস্তক নত করে দিয়েছেন।

আরব অশ্বারোহী, নিজের ভাগ্যের উপর তোমাদের গৌরব বোধ করা উচিত যে আল্লাহ তাঁর ধর্ম প্রচারের জন্য তোমাকে নির্বাচন করেছেন। আল্লাহর পথে তোমার মন-প্রাণ সমর্পণ করেছ এবং আল্লাহ তোমাদেরকে পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত নিয়ামত প্রদানে কৃতার্থ করেছেন। সেদিনের কথা স্মরণ কর যখন আল্লাহ তাঁর তিনশত তেরজন অস্ত্র রসদবিহীন সেবককে শ্রেষ্ঠতম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক সহস্রের অধিক সৈন্যের উপর জয়ী করেছিলেন। কাদিসিয়া, য়ারমূক এবং আজনাদায়নের রণক্ষেত্রে সত্যের পক্ষে এক তরবারীর বিরুদ্ধে অসত্যের পক্ষে দশ বা ততোধিক অসি কোষমুক্ত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ সর্বদাই সত্যকে জয়ী করেছেন। আজও আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন। কিন্তু মনে রেখো বিধির বিধান অপরিবর্তনীয়। আল্লাহ কেবল তাদেরই সাহায্য করেন যারা নিজেদের সহায়। নিজের কর্তব্য পালন না করে তোমরা আল্লাহর আশীষের যোগ্য হতে পারবে না। বিধাতার স্নেহহস্ত শুধু তারই প্রতি প্রসারিত হয়, যে তীর বর্ষণের মাঝখানে বুক পেতে দিতে পারে, যারা নিজের লাশ দ্বারা পরিখা পূর্ণ করতে পারে। বিধাতার অফুরন্ত দান কেবল সে-সব জাতির জন্য যাদের ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠা শহীদের রক্ত রঞ্জিত।

মনে রেখো, বণী ইসরাঈলও আল্লাহর প্রিয় জাতি ছিল। কিন্তু তারা যখন সত্যের পথে জিহাদ করার দায়িত্ব আল্লাহর ও রসূলের উপর চাপিয়ে দিয়ে বিশ্রাম উপভোগ শুরু করে দিল, বিধাতা তাদের পরিত্যাগ করলেন। কাজেই যে ভূ-খন্ডে তাদের প্রতিপত্তির ধ্বজা এক সময়ে উড্ডীন ছিল আজ সেখানে তারা আশ্রয় পাচ্ছে না। আল্লাহ যেন কখনো সেদিন না দেখান যখন তোমাদের জীবন থেকে জিহাদের নির্ধারণ বিলীন হয়ে যাবে।

আমার বন্ধু ও শ্রদ্ধেয়গণ, তোমাদের জন্য আজ এক কঠিন পরীক্ষার দিন। বদর ও হুনায়নের মুজাহিদগণের আদর্শ আজ তোমাদের অনুসরণ করতে হবে। কাদিসিয়া এবং য়ারমূকের শহীদদের পদচিহ্ন লক্ষ্য করে তোমাদের চলতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আজকের দিনে বিজয় লাভের জন্য আল্লাহ যে বীর সৈন্য বাহিনীকে নির্বাচন করেছেন, সে তোমাদেরই। আমি জোর করে বলতে পারি, সত্যের তরবারীর সামনে সিন্ধুর লৌহ রোম ও ইরানের লৌহের চেয়ে দৃঢ়তর প্রমাণিত হবে না। অত্যাচারী কখনো বীর হয় না। কিন্তু আমি তোমাদের আর একবার সাবধান করে দিচ্ছি যে, সত্যের পথকে অধর্মের কন্টকমুক্ত করতে গিয়ে সর্বদা মনে রাখবে কোন নির্দোষ চারা বা কুসুমিত পুষ্পকে যেন পিষে না ফেল। পতিত শত্রুকে কখনো আঘাত করবে না। নারী, শিশু ও বৃদ্ধের উপর তোমাদের হাত ওঠেনা যেন। আমি জানি সিন্ধু-রাজ আরব নারী ও শিশুদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছে। কিন্তু প্রতিশোধ কামনার জন্য সর্বদাই দয়ার স্থান রয়েছে। শত্রুকে পরাজিত করে প্রমাণ কর যে আমাদের সম্মানবোধ আল্লাহর জন্য এবং আমাদের অসি আল্লাহর অসি। কিন্তু শত্রু পরাজয় মেনে তোমার আশ্রয় চাইলে তাকে বুকে তুলে আলিঙ্গন কর এবং বল যে ইসলামের আশীষ-দ্বার সকলের জন্যই মুক্ত।

তোমরা জান মক্কার কাফিরগণ হযরত মুহম্মদকে (সঃ) যত নির্যাতন করেছিল,

পৃথিবীর অন্য কোন লোককে ততটা নির্যাতন সইতে হয় নি। অত্যাচারীর তূণে এমন তীর ছিল না যার দ্বারা তাঁর পবিত্র দেহকে বিক্ষত করতে চেষ্টা করা হয় নি। 'বিশ্বের আশীষ' সেই মহামানবের চোখের সামনে তাঁর ভক্তদের বুকের উপর উত্তপ্ত পাথর চাপা দেওয়া হত। তিনি মক্কা ছেড়ে যখন মদীনায় হিজ্‌রত করেন, তখনো অত্যাচারী তাঁকে রেহাই দেয়নি। মদীনার কয়েকটি যুদ্ধে তাঁর অনেক ভক্ত প্রাণ হারান। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর তিনি শত্রুদের সাথে যে ব্যবহার করেন, তার নির্দশন পৃথিবীর ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তাঁর সেই সদ্ব্যবহারের ফলে প্রবলতম শত্রু তাঁর ঘনিষ্ঠতম ভক্তে পরিণত হয়। যেসব দেশ পূর্বে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, তাদের প্রত্যেকের বাসিন্দারা আজ তুর্কিস্তান ও আফ্রিকায় ইসলামের জয়ের জন্য আমাদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করছে। কে বলতে পারে যে সিন্ধুর দেশ এবং সমস্ত ভারতবর্ষ একদিন ইরান, শাম ও মিসরের মত সত্যধর্মের জয়ের জন্য আমাদের সাথে মিলিত হবে না। বন্ধুগণ, আজ আমাদের গন্তব্যস্থান ব্রাহ্মণাবাদ। এসো আমরা বিজয়ের জন্য দু'আ করি।

একথা বলে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম হাত তুলে দু'আ করলেন- প্রভু, পুরস্কার ও তিরস্কারের মালিক, আমরা তোমার ধর্মের জয় চাই। আমাদের মনে পূর্ব পুরুষদের মতো আমাদের মনেও উৎসাহ জাগাও। হে বিশ্বভুবনের পালক, কিয়ামতের দিন আমাদের মাতৃকূলকে লজ্জিত কর না। আমাদেরকে গাযীর জীবন ও শহীদের মৃত্যু প্রদান কর।"

সন্ধ্যায় সিন্ধুর বাহিনী রাজা দাহিরসহ ত্রিশ হাজার মৃতদেহ রণক্ষেত্রে ফেলে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। বেলা তিন প্রহরের দিকে তাদের যে সব দল পরাজয় অনিবার্য বলে বুঝতে পারল, তারা আরোর যাত্রা করল। রাজা দাহিরের মৃত্যুতে বাকী সৈন্য সাহস হারিয়ে ব্রাহ্মণাবাদের দিকে ধাবিত হল।

কিছুদূর পশ্চাদ্ধাবন করার পর মুসলিম বাহিনী শিবিরে ফিরে আসে। এ যুদ্ধে মুসলিম হতাহতের সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে তিন হাজার। সৈন্যরা রণক্ষেত্র হতে আহতদের তুলে এনে সারি সারি শুইয়ে দিচ্ছিল। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম অস্ত্রোপচারকদের সাথে সাথে তাদের ক্ষতে ঔষধ প্রয়োগে ব্যস্ত ছিলেন। যুবায়র একজন আহত সৈনিককে কাঁধে নিয়ে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের কাছে পৌছলেন। তাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমকে বললেন, আপনি একে একটু দেখুন। এ ভীষণভাবে আহত হয়েছে।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম তাড়াতাড়ি আহত সৈনিকের কাছে গিয়ে বললেন- কে, সা'আদ?

সা'আদের চেহারা রক্তে রঞ্জিত ছিল। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম কাপড় দিয়ে তার মুখ মুছতে চেষ্টা করলে সে তাঁর হাত চেপে ধরে ওষ্ঠে মৃদু হাসি টেনে বলল- এখন আর এর কোন প্রয়োজন নেই। আমি শেষবারের মত আপনাকে দেখতে চেয়েছিলাম মাত্র।

যুবায়র ও মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। একটু দূরে খালিদ আহতদের পানি খাওয়াচ্ছিল। যুবায়র তাকে ডাকলেন। সে ছুটে সা'আদের কাছে এল। 'চাচা, তুমি ...' তার মুখ থেকে আচম্বিতে বের হয়ে পড়ল।

সা'আদ তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। খালিদ উভয় হাতে সে হাত ধরে বসে পড়ল।

মৃত্যুতে আর আমার ভয় নেই। কিন্তু আমি ভীষণ পাপী। আপনি বিশ্বাস করেন যে আল্লাহ্ আমাকে মাফ করে দেবেন?

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম বলেন- শহীদের রক্ত সমস্ত পাপ ধুয়ে তাকে নিষ্পাপ করে দেয়।

সা'আদ খালিদের দিকে তাকিয়ে দুর্বল কণ্ঠে বলল- বৎস, যুহরার যত্ন কর। আর যুবায়র, তোমাকে নাহীদ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার মনে করি না।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত সে পরপর এদের দিকে তাকাতে লাগল। পরে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। ক্রমে তার চক্ষের জ্যোতি ক্ষীণ হয়ে এল। অতি কষ্টে কয়েকটি শ্বাস নেবার পর সে খালিদ ও মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের হাত ছেড়ে দিল। ইতিমধ্যে সা'আদের আরো কয়েকজন বন্ধু এসে তার পাশে জমা হল। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম তার নাড়ীতে হাত রেখে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন (আমরা আল্লাহর সৃষ্ট জীব এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাই)' বলে উঠলেন। তিনি স্বহস্তে সা'আদের চক্ষু বন্ধ করে দিলেন।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম ওঠে আবার আহতদের সেবায় মনযোগ দিতে যাচ্ছিলেন এমন সময় এক অশ্বারোহী সামনে এক আহত ব্যক্তিকে বহন করে তাঁর কাছে এসে পৌঁছল। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম তাকে দেখেই বলে উঠলেন- ভীম সিংহ, তুমি? .... এ কে?

এক সৈনিক আহত ব্যক্তিকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে নীচে শুইয়ে দিল। ভীম সিংহ ঘোড়া হ'তে নামতে নামতে বললেন- খালিদ, তোমার পিতাকে দেখ।

খালিদ মাথা নত করে সা'আদের কাছে বসেছিল। সে চমকে পিছনে তাকাল। আহত ব্যক্তিকে দেখেই সে মৃদু চীৎকার দিয়ে ছুটে এসে তার মস্তক কোলে তুলে নিল। আব্বা, আমার আব্বা'।

আহত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে সে ভীম সিংহকে জিজ্ঞেস করল- আপনি এঁকে কোথা থেকে নিয়ে এলেন? ইনি কি করে আহত হলেন?

ভীম সিংহ বললেন- আমি, আমার বাবা আর ইনি আরোর বন্দীশালা থেকে এক সামরিক কর্মচারীর দয়ায় ফেরার হয়েছিলাম। পিতাজীর নিষেধ সত্ত্বেও ইনি একদল সৈন্যকে আক্রমণ করেন। বাধ্য হয়ে আমিও পিতাজী এঁর সহায়তা করি। এক শরাঘাতে পিতাজী ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে হাতীর পায়ের নীচে পিষ্ট হয়ে নিহত হন। - একথা বলে তিনি নীরব হলেন এবং তাঁর নয়ন হতে অশ্রু ঝরতে লাগল। কিছুক্ষণ পর তিনি নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করতে করতে বললেন- ইনি বেপরোয়াভাবে অগ্রসর হতে থাকেন। পাঁচ ছ'জন সৈনিককে হত্যা করার পর ইনি আহত হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে যান। এর শেষ ইচ্ছা ছিল নিজের পুত্রকে দেখবার। আপনি ওকে ভাল করে দেখুন। বোধ হয় এখনো জীবিত আছেন।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম কয়েকজন সিপাহীর প্রতি ইশারা করে বললেন তোমরা এর

সাথে গিয়ে এর পিতাজীর মৃতদেহ তুলে নিয়ে এস।

তিনি নিজে আবুল হাসানের দিকে মনযোগ দিলেন। তার নাড়ীর উপর হাত রেখে বললেন- ইনি অচেতন হয়েছেন। পানি আন।

এক সৈনিক এক গ্লাস পানি এনে দিল। মুহম্মদ ইবন কাসিম আবুল হাসানের মুখ তুলে তাকে কয়েক ঢোক পানি খাইয়ে দিলেন। আবুল হাসানের চেতনা ফিরে এল এবং তিনি চোখ খুললেন। কিন্তু খালিদকে চিনতে পেরেই কিছুক্ষণের জন্য আবার অচেতন হয়ে পড়লেন। পুনরায় তাঁর চেতনা ফিরে এলে মুহম্মদ ইবন কাসিম তাঁর ক্ষতে ওষুধ লাগিয়ে দিলেন।

খালিদকে আবুল হাসান প্রথম প্রশ্ন করলে- তোমার মা কোথায়?

'তিনি- তিনি'- খালিদ ঘাবড়িয়ে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

আবুল হাসান বিষণ্ন হাসি হেসে বললেন- বৎস, ভয় পেয়ো না। আমি বুঝেছি। তিনি জীবিত নেই। নাহীদ কোথায়?

সে দেবলে আছে।

তা'হলে তোমার স্ত্রীও সেখানেই হবে। হায়, আমি মৃত্যুর পূর্বে যদি তাদের দেখতে পেতাম। কিন্তু তারা রয়েছে অনেক দূরে। আর আমার জীবন মাত্র কয়েক ঘন্টা বাকী আছে।

মুহম্মদ ইবন কাসিম সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললেন- আপনি চিন্তা করবেন না। আমি এখুনি তাদের ডেকে পাঠাচ্ছি। আল্লাহর ইচ্ছায় ডাকের ঘোড়ায় তারা পরশু এখানে পৌঁছে যাবে।

আবুল হাসান কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মুহম্মদ ইবন কাসিমের দিকে তাকিয়ে বললেন- ধন্যবাদ, কিন্তু হয়ত আমি পরশু পর্যন্ত জীবিত থাকব না।

মুহম্মদ ইবন কাসিম বললেন- আপনার ক্ষত খুব বেশী বিপজ্জনক নয়। আপনাদের সাক্ষাৎ যদি বিধাতার অভীষ্ট হয়, তা'হলে তা অবশ্যই ঘটবে।

চতুর্থ দিন সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পরে আবুল হাসানের শয্যাপার্শ্বে মুহম্মদ ইবন কাসিম, খালিদ এবং যুবায়র ছাড়া নাহীদ এবং যুহরাও উপস্থিত ছিল। নাহীদ ও যুহরা পূর্বদিন সন্ধ্যায় এখানে পৌঁছে। পথের ক্লান্তিতে অবসন্ন হওয়া সত্ত্বেও তারা খালিদ ও যুবায়রের মত সমস্ত রাত্রি জেগে আবুল হাসানের সেবা শুশ্রূষা করে।

শ্বাস-কষ্টের একটু আগে নাহীদ ও যুহরার মত খালিদের চোখেও অশ্রু দেখে আবুল হাসান বললেন- বৎস, আমি এর চেয়ে শ্রেয় মৃত্যু কামনা করতে পারতাম না। মৃত্যু উপলক্ষ্যে অশ্রু বর্ষণ একটা পার্থিক প্রথা। কিন্তু শহীদের মৃত্যুতে এ প্রথা পালন করা শাহাদতকে পরিহাস করা মাত্র। এরূপ অশ্রু-সজল চোখে আমার দিকে তাকিও না। আমি অশ্রুকে ঘৃণা করি। জীবনের কঠোর গন্তব্যপথে মুসলমানের মূলধন অশ্রু নয়-রক্ত।

খালিদ চোখ মুছে বলল- আব্বাজান, আমাকে মাফ করুন।

দুপুরের সময় আবুল হাসান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

॥ এক ॥

ব্রাহ্মণাবাদ পৌঁছে জয় সিংহ চতুর্দিকে দূত পাঠালেন। রাজা দাহিরের পরাজয়ের পূর্বে মুলতান হ'তে রাজপুতানা পর্যন্ত অনেক নরপতি ও নেতৃবর্গ সৈন্যসহ তাঁর সাহায্যের জন্য যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু নীরূন জয়ের পর মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম ব্রাহ্মণাবাদ যাত্রা না করে যখন সয়ূন ও সবিস্তানের দিকে অগ্রসর হলেন তখন তারা মনে করলেন ব্রাহ্মণাবাদের কাছে চূড়ান্ত যুদ্ধের এখনো ঢের দেরী আছে। জুন মাসে নদী পূর্ণ ও খরস্রোতা ছিল। কেউই ভাবেন নি নদী পার হওয়ার জন্য মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম নদীর পানি কমে যাওয়ার অপেক্ষা করবেন না। কাজেই তাঁরা ধীরে সুস্থে পথ অতিক্রম করতে লাগলেন। স্বয়ং রাজা দাহিরকে তাঁর প্রত্যাশার অনেক পূর্বে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের সাথে শক্তি পরীক্ষার জন্য সৈন্য সমাবেশ করতে হয়েছিল। দূর দূরান্ত হতে আগত অতি কম লোকই তাঁকে সাহায্য করার জন্য এসে পৌঁছতে পেরেছিল।

সিন্ধু বাহিনীর পরাজয়, বিশেষ করে রাজা দাহিরের মৃত্যুর অপ্রত্যাশিত খবর তাদের অধিকাংশকে নিরুৎসাহ করে দিল। তারা জয় সিংহের সাহায্যের জন্য ব্রাহ্মণাবাদ পৌঁছার পরিবর্তে ফিরে যেতে লাগল। এদের সাহায্যের ভরসাতেই জয় সিংহ আর একবার ভাগ্য পরীক্ষা করতে স্থির করেছিলেন। কাজেই তিনি প্রচার করলেন রাজা দাহির নিহত হননি। তিনি পরাজিত হয়ে দক্ষিণ ভারতের রাজন্যবর্গের সাহায্য সংগ্রহ করতে গিয়েছেন। কিছুদিনের মধ্যেই এক অপরাজেয় বাহিনী নিয়ে ব্রাহ্মণাবাদে ফিরে আসবেন। জয় সিংহের দূতেরা নিরাশ হয়ে প্রত্যাবর্তনকারী রাজন্য ও নেতৃবর্গকে এ সংবাদ শুনাবার পর তারা শেষ জয়ে অংশীদার হবার লোভে তাঁর পতাকাতলে এসে জড় হতে লাগল।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম এ সংবাদ পেয়েই তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হলেন। জয় সিংহের পতাকাতলে প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য একত্র হয়েছিল। তারা শহর থেকে বাইরে এসে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের সম্মুখীন হল। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের সৈন্য বাহিনীতে সিন্ধুর অনেক সাধারণ লোক ছাড়াও কয়েকজন নেতৃবর্গ যোগ দিয়েছিল। নেতৃবর্গের নেতৃত্বের ভার ছিল ভীম সিংহের উপর। ব্রাহ্মণাবাদের নগর প্রাচীরের বাইরে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হল। জয় সিংহের রাজপুত সুহৃদবর্গ অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। কিন্তু আরব সৈন্যের মধ্যে অনেক স্বদেশবাসী যোদ্ধাকে দেখে সিন্ধী সৈন্যরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। ভীম সিংহের কয়েকজন প্রাচীন বন্ধু তাঁর আহবানে সাগ্রহে সাড়া দেয় এবং যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই তারা মুসলিম বাহিনীতে যোগদান করে। তা সত্ত্বেও জয় সিংহ তাঁর নব

সাহায্যকারীদের উপর নির্ভর করেছিলেন। তিনি বীরত্বের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তৃতীয় প্রহরে সিন্ধী বাহিনীতে ভাঙ্গন ধরে। রণক্ষেত্রে বিশ হাজার মৃতদেহ ফেলে জয় সিংহ দক্ষিণ দিকে পলায়ন করলেন।

॥ দুই ॥

ব্রাহ্মণাবাদ প্রাসাদের এক প্রকোষ্ঠে রাজা দাহিরের কনিষ্ঠা ও প্রিয়তমা রাণী স্বর্ণ-সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। রাণীর নাম লাটী। তাঁর কমনীয় মুখে ক্লান্তি ও বেদনার চিহ্ন বিরাজিত। কয়েকজন পরিচারিকা ও নেতৃবর্গ করজোরে দণ্ডায়মান ছিল।

প্রতাপ রায় নত মস্তকে ধীর পদক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করল। রাণীর নিকটে গিয়ে সে নিম্ন স্বরে বলল- মহারাণী, জয় সিংহের পরাজয় হয়েছে। শত্রুর অল্পক্ষণের মধ্যেই নগর অধিকার করবে। এখন পলায়ন ছাড়া আর আমাদের উপায় নেই। আমরা সুড়ংগ পথে বের হয়ে যেতে পারি।

রাণী কাঠোর স্বরে জবাব দিলেন- পরাজয়ের খবর আমাকে দেয়ার জন্য এ পরিচারিকারাই যথেষ্ট ছিল। তুমি রণক্ষেত্র ছেড়ে চলে এলে কেন?

মহারাণীকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য। এখন কথা কাটাকাটির সময় নেই। চলুন। আমি সুড়ংগের অপর দিকে অশ্ব প্রস্তুত রেখেছি। আপনি কোন বিপদের আশংকা ছাড়াই আরবার পৌছতে পারবেন।

রাণী বিরক্ত হয়ে বললেন- তোমার মত ভীরুর তত্ত্বাবধানে প্রাণ রক্ষার চেয়ে আমি শত্রুর হাতে প্রাণ দান শ্রেয় মনে করি। প্রতাপরায় সংকুচিত হয়ে বললো- আমার প্রতি অবিচার হচ্ছে। আমি আপনার বিশ্বস্ত সেবক।

তোমার বিচারের সময় এসে পড়েছে।- একথা বলে রাণী আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন।

প্রতাপরায় ব্যস্ত হয়ে বলল- মহারাণী, আপনি কি বলছেন? আমি আপনার মঙ্গলের জন্যই বলছি।

রাণী গর্জন করে বললেন- তুমি এদেশের সবচেয়ে বড় শত্রু। তোমার জন্যই সিন্ধুর উপর বর্তমান বিপদ এসেছে। আরবদের সাথে যুদ্ধ বাধাতে তুমি মহারাজকে প্ররোচিত করেছিলে। তুমিই জয়রামকে আমাদের শত্রুতে পরিণত করেছ। ভীম সিংহ ও উদয় সিংহের মত বীর যোদ্ধা তোমার জন্যই শত্রুর সাথে যোগ দিয়েছে। বিগত রণক্ষেত্রে তুমি সর্বপ্রথম যুদ্ধ থেকে পালিয়েছিলে। এখন আমার প্রাণ রক্ষার জন্য নয়, বরং তোমার নিজের প্রাণের ভয়ে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চাও। কারণ আরবগণ নারীর ওপর হাত তুলে না। হয়ত তারা আমার খাতিরে তোমাকেও ছেড়ে দেবে।

প্রতাপ রায় বলল- মহারাণী, আপনি এ কি বলছেন? শুনুন, শত্রু দুর্গে প্রবেশ করছে। যে কোন মুহূর্তে এখানে এসে পড়তে পারে। তাদের হাতে বন্দী হওয়ার

অপমানকে আপনি ভয় না করলে চললাম।

এ কথা বলে প্রতাপরায় ফিরে যেতে চাইল। কিন্তু রাণী ঘুরে তার পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। একটি শাণিত খঞ্জর বের করে বললেন, দাঁড়াও, তোমার বিচার এখনো বাকী রয়েছে।

নগ্ন তরবারী নিয়ে লোক তাকে ঘিরে ফেলছে দেখে প্রতাপরায় একদিকে লাফ দিয়ে সরে অসি মুক্ত করল। রাণী এক সভাষদের হাত থেকে অসি নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং বললেন- কাপুরুষ, তোমার হাতে তলোয়ার মানায় না। চুড়ি পরাই ও হাতে শোভা পায়।

আহত হিংস্র জন্তুর ন্যায় প্রতাপরায় রাণীর ওপর আক্রমণ করল। কিন্তু তিনি হঠাৎ একদিকে সরে দাঁড়ালেন। প্রতাপরায় দ্বিতীয়বার অসি তুলবার আগেই চারটি অসি তার বুক ছিদ্র করে বের হয়ে গেল।

॥ তিন ॥

কিল্লার মধ্যে সবদিক থেকে আল্লাহু আকবর ধ্বনি উত্থিত হচ্ছিল। রাণী প্রাসাদের উপরতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাচ্ছিলেন। দুর্গের ফটকে সিন্ধুর পতাকার পরিবর্তে ইসলামী পতাকা উড়ছিল। নীচের প্রশস্ত অঙ্গনে মুসলিম সৈন্য একত্রিত হচ্ছিল। সকলের পুরোভাগে এক তরুণ শ্বেত অশ্বের উপর আসীন ছিলেন এবং সিন্ধুর অসংখ্য সৈন্য 'মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের জয়' বলে চীৎকার দিচ্ছিল। জনৈক সভাষদ শ্বেত অশ্বের দিকে অংগুলি নির্দেশ করে রাণীকে বলল, ঐ মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম।

রাণী যে সব লোক তাঁর পাশে জড়ো হচ্ছিল তাদেরকে পিছনে সরে যাবার হুকুম দিয়ে নিজে এক স্তম্ভের আড়ালে দাঁড়ালেন। একজন বৃদ্ধ সর্দার অগ্রসর হলে বলল- মহারাণী, এখনো পালাবার সময় আছে।

রাণী এক সৈনিকের হাত থেকে তীর ও ধনুক কেড়ে নিয়ে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের দিকে লক্ষ্য স্থির করতে করতে বললেন- পলায়নকারী রাজা-রাণীদের জন্য পৃথিবীতে কোথাও স্থান নেই।

কিন্তু হঠাৎ পদ-শব্দ শুনে রাণীর মনোযোগ কিছুক্ষণের জন্য বাম দিকের দরজার দিকে আকৃষ্ট হল। ভীম সিংহ কয়েকজন নেতৃবর্গসহ উপস্থিত হলেন। রাণী তাঁকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং আবার মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের দিকে লক্ষ্য স্থির করতে লাগলেন। নীচে কয়েকজন সৈন্য হৈ চৈ করে উঠল। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম হঠাৎ একদিকে ঝুঁকলেন। ভীম সিংহ রাণীকে বাধা দেয়ার আগেই তীর ধনুক থেকে বের হয়ে গেল। লক্ষ্য বিফল হল দেখে রাণী পুনর্বার ধনুকে শর লাগাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভীম সিংহ অগ্রসর হয়ে তাঁর হাত থেকে ধনুক কেড়ে নিতে নিতে বললেন- মহারাণী, আপনি কি করছেন। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, তীর চালাবার সময় আপনার হাত কেঁপে

গিয়েছিল। নচেৎ বিজয়ী সৈন্যের প্রতিশোধের তীব্রতা আপনি কল্পনাও করতে পারতেন না। আপনি যদি মনে করে থাকেন প্রধান সেনাপতির মৃত্যু হলে এ সৈন্য বাহিনী সাহস হারাবে, তা'হলে আপনি ভুল করেছেন। সেনাপতির মৃত্যু হলে এ বাহিনী রণক্ষেত্র ছেড়ে পালায় না। এদের প্রত্যেক সৈনিকই সেনাপতি।

ভাবের আতিশয্যে রাণীর চোখে অশ্রু দেখা দিল। তিনি বললেন- ভীম সিংহ, তুমি আর কি চাও? তোমার প্রতিশোধ নেয়ার কি এখনো বাকী রয়েছে?

ভীম সিংহ জবাব দিলেন- আমি শুধু জানতে এসেছি আরব বন্দীগণ কোথায় আছে? বন্দীশালায় কেবল লংকার নাবিকদের পাওয়া গিয়েছে। সেখানে আমি জানতে পেরেছি রাজার মৃত্যুর পর আরব কয়েদীদেরকে প্রাসাদে আনা হয়েছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনারা তাদের সাথে কোন দুর্ব্যবহার করেন নি। কিন্তু প্রহরী আমাকে বলেছে প্রতাপরায়ও আপনার কাছে আছে। আমার ভয় হচ্ছে তার কথা শুনে আপনি বন্দীদের সাথে কোন দুর্ব্যবহার করে না ফেলে থাকেন।

রাণী বললেন- ধরে নাও আমি যদি কোন দুর্ব্যবহার করেই থাকি তা হলে?

মুসলমান নারীর উপর হাত তুলে না। কিন্তু প্রতাপরায়কে হয়ত তারা ক্ষমার অযোগ্য মনে করবে।

রাণী বললেন- আমি যদি তাদেরকে হুকুম দিয়ে হত্যা করিয়ে থাকি?

ভীম সিংহ চমকে জবাব দিলেন- তা'হলে আমি বুঝব সিন্ধুর ভাগ্যে আরো দুর্ভোগ আছে। কিন্তু আপনার কাছে এরূপ ব্যবহার আশা করি না। আমি মুহম্মদ ইবন কাসিমকে বলে দিয়েছি বন্দীদের সম্বন্ধে আপনি প্রতাপরায় ও মহারাজের ভয়ংকর প্রস্তাবের সর্বদা বিরোধীতা করেছেন। তিনি এজন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

রাণী ভেবে বললেন- আমি বন্দীদের যদি শত্রুর হাতে সমর্পণ করি তা'হলে তারা এখান থেকে চলে যাবে?

ভীম সিংহ বললেন- বিজয়ী সৈন্যকে কোন শর্ত মানতে বাধ্য করা সম্ভব নয়। তাদের সাথে শান্তি স্থাপনের আমাদের যেসব সুযোগ ছিল, ক্ষমতার নেশায় আমরা তা অবহেলা করেছি। এখন তো তাদের বিজয়-প্লাবন ভারতের শেষ সীমা পর্যন্ত তারা নিয়ে যেতে চায়।

তোমার দৃঢ় বিশ্বাস তারা আরোর আক্রমণ করবে?

হাঁ, হয়ত দু'চার দিনের মধ্যেই তারা আরোরার দিকে অগ্রসর হবে। এ সম্বন্ধেও আপনার সঙ্গে কথা আছে। রাজকুমার ফাফফী আরোর রক্ষা করছেন। আপনি নিশ্চয় চান না আরব অশ্বের ক্ষুরের নীচে তিনি নিষ্পেষিত হন। কয়েদীদের মুহম্মদ ইবন কাসিমের হাতে সমর্পণ করে আপনি তাঁর জীবন রক্ষা করাতে পারেন। রাজকুমারের কাছে যত সৈন্য আছে, তার চেয়ে বেশী সৈন্য মুহম্মদ ইবন কাসিমের বাহিনীতে সিন্ধু থেকেই যোগ দিয়েছে। রাজকুমার যেমনি বীর তেমনি অনভিজ্ঞ। আপনি আরবদের

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। কেবল আত্মসমর্পণ করলেই তাঁর জীবন বাঁচতে পারে।

রাণী আরো কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে বললেন- আমি শুনেছি আরবরা অত্যন্ত অর্থলোভী। তারা যদি ফিরে যেতে চায় তাহলে ব্রাহ্মণাবাদ ছাড়া আরোরের রাজকোষও তাদের আমি দিতে পারি।

ভীম সিংহ বললেন- তারা এক নীতির জন্য যুদ্ধ করছে। এখানে ব্যবসা করতে আসে নি।

তোমার মনে আরবদের জন্য শ্রদ্ধা অত্যন্ত গভীর। তারা তোমাকে যাদু করেছে।

ভীম সিংহ কয়েকপদ অগ্রসর হয়ে নীচের দিকে দেখিয়ে বললেন- যাদু? এদিকে দেখুন। তাদের যাদু সবাইকে বশীভূত করেছে।

রাণী নীচে দৃষ্টিপাত করলেন। শহরের নেতৃবর্গ ও পুরোহিতগণ মুহম্মদ ইবন কাসিমকে ঘিরে তাঁর পদধূলি নেবার চেষ্টা করছে এবং তিনি ঘোড়া থেকে অবতরণ করে তাদেরকে আংগুলের ইশারায় নিষেধ করছেন।

ভীম সিংহ বললেন- মহারাণী, আপনি দেখলেন? কয়েক ঘন্টা পূর্বে এরাই মুহম্মদ ইবন কাসিমকে প্রবলতম শত্রু মনে করত। তিনি যখন এ দেশ আক্রমণ করেন, তখন তাঁর কাছে মাত্র দশ বার হাজার সৈন্য ছিল। এখন আমাদের দেশ থেকেই প্রায় চল্লিশ হাজার সৈন্য তাঁর বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। শারীরিক আঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য আমাদের ঢাল রয়েছে, কিন্তু স্নেহ ও সদ্ব্যবহারে নাগরিকগণ মুহম্মদ ইবন কাসিমকে শত্রুর পরিবর্তে শ্রেষ্ঠতম বন্ধু মনে করবে। আপনি জানেন আমি কাপুরুষ নই। আমি পরাজিত হয়ে জীবন্ত ফিরে আসব মনে করে লাসবেলা যাই নি। কিন্তু হায়, যখন আমি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়েছিলাম, তখন যদি তিনি আমাকে তুলে হৃদয়ে গ্রহণ না করতেন। তিনি আমাকে মৃত্যুর গ্রাস থেকে কেড়ে আনেন। আমার ক্ষতে ঔষধ লেপন করেন। আমার সেবা-শুশ্রূষা করেন। তখনই আমি অনুভব করি পৃথিবীর কোন শক্তি এরূপ শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না।

আমি মহারাজকে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়া হতে বাঁচাবার জন্য এসেছিলাম। কিন্তু পিতাজী এবং আমার সাথে এরূপ ব্যবহার করা হয়, যা মুসলমান শত্রুর সাথেও করে না। আমার হৃদয়ে এখনো স্বজাতির জন্য সহানুভূতি রয়েছে। আপনার পুত্রকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করার জন্যই আপনার কাছে এসেছি। আরব কয়েদীরা আপনার হাতে থাকলে আমার কাছে সমর্পণ করে দিন। সৈন্যরা আপনার মহলের দরজায় পৌঁছে গিয়েছিল। যখন তিনি জানতে পারলেন আপনি এখানে রয়েছেন, তিনি আদেশ দেন কোন সৈনিক যেন এখানে প্রবেশ না করে।

রাণী কামরার দিকে অগ্রসর হয়ে বললেন- আমার সাথে এস।

ভীম সিংহ সঙ্গীদের সেখানে অপেক্ষা করতে বলে রাণীর অনুসরণ করলেন। রাণী প্রথমে তাকে নিয়ে গেলেন যে ঘরে প্রতাপরায়ের মৃত দেহ পড়েছিল। রাণী যখন

বললেন প্রতাপরায় তাঁরই আদেশে নিহত হয়েছে, তখন ভীম সিংহ বললেন- ভগবানকে ধন্যবাদ যে আপনি শত্রু-মিত্রের পার্থক্য বুঝতে পেরেছেন।

রাণী উত্তর দিলেন- আমি প্রথম থেকেই শত্রু বলে চিনেছিলাম। কিন্তু হায়, মহারাজ যদি আমার কথা শুনতেন, তুমি আরব কয়েদীদের দেখতে চাইলে কোণায় কামরার যাও। মহারাজ জীবিত থাকা পর্যন্ত আমার কথা শুনেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর আমি আরব বন্দীদের আমার অতিথি হিসেবে রেখেছি। কিন্তু মুসলমানকে খুশী করার উদ্দেশ্যে নয়। বরং আমি প্রথম থেকেই অনুভব করেছিলাম এদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। প্রতাপরায় তাদের হত্যা করতে পরামর্শ দিয়েছিল। তার ক্ষমতা থাকলে সে হত্যা করতে মোটেই ইতস্ততঃ করত না।

ভীম সিংহ বললেন- কাপুরুষ চিরকালই অত্যাচারী হয়। বন্দীরা এখন কিরূপ অনুভব করছে?

রাণী বললেন- আমার সাধ্যমত তাদের কোন কষ্ট দেই নি। চল, তুমি নিজেই দেখবে।

ভীম সিংহ বলেন- মুহম্মদ ইবন কাসিম নিজে এসে দেখলেই বোধ হয় ভাল হয়। তিনি এদের সম্বন্ধে বিশেষ উদ্বিগ্ন আছেন?

রাণী উত্তর দিলেন- নিয়ে এস তাঁকে।

॥ চার ॥

রাণীর নেতৃত্বে মুহম্মদ ইবন কাসিম, যুবায়র, খালিদ, নাহীদ এবং যুহরা ছাড়া কয়েকজন সেনাপতিও কোণার প্রশস্ত কামরায় প্রবেশ করলেন। খালিদকে দেখেই আলী ছুটে এসে গলা জড়িয়ে ধরল। ইতিপূর্বে রাণী তাদেরকে স্বীয় পরাজয় ও মুসলমানদের বিজয়ের খবর শুনিয়েছিলেন। পর পর খালিদ ও যুবায়র পুরুষ বন্দীদের আলিংগন করলেন। মেয়েরা নাহীদকে জড়িয়ে ধরে কৃতজ্ঞতার অশ্রু বর্ষণ করল। মুহম্মদ ইবন কাসিম শিশুদের মস্তকে স্নেহ-হস্ত স্থাপন করলেন, পুরুষদের করমর্দন করলেন এবং মেয়েদের সান্ত্বনা দিলেন। সবশেষে তিনি রাণীকে সম্বোধন করে বললেন- মহানুভব রাণী, আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

রাণী এই প্রথম মুহম্মদ ইবন কাসিমের দিকে ভাল করে তাকালেন। তাঁর নয়ন সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে তাঁর কথা কেবল আনুষ্ঠানিক বুলি নয়।

মুহম্মদ ইবন কাসিম খালিদ ও যুবায়রকে বললেন- আমার ঢের কাজ পড়ে আছে। তোমরা এদেরকে সংগে নিয়ে বাসস্থানে চলে যাও।

রাণী একটু ইতস্ততঃ করে বললেন-এরা প্রাসাদেই থাকতে পারেন।

মুহম্মদ ইবন কাসিম বললেন- ধন্যবাদ। কিন্তু তাতে আপনার অসুবিধা হবে।

রাণী বললেন- আপনি আমাকে বন্দী না করে থাকলে আমি কালই আরোর চলে যাব

এবং সমস্ত প্রাসাদ আপনার জন্য খালি হয়ে যাবে।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম বললেন- আপনার কি করে সন্দেহ হল মুসলমান এভাবে আতিথেয়তার প্রতিদান করে? আপনি যদি আরোর যেতে চান তবে আমি ব্রাহ্মণাবাদের কয়েকজন সামন্তকে আপনার সাথে দিতে পারি।

রাণী মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন- আমি আরোর চলে গেলে আপনার সৈন্য আমার পশ্চাদ্ধাবরণ করবে না কি?

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম বললেন- আরোর অত্যাচারী শামনের শেষ দুর্গ। সেটা জয় করার সংকল্প আমি পরিত্যাগ করতে পারি না। সেখানে এরূপ বন্দীশালার খবর শুনেছি যেখানে আবুল হাসানের মত অনেক কয়েদী ধুঁকে ধুঁকে মরছে।

রাণী বললেন- আবুল হাসান তো ফেরার হয়েছে। সেখানের অন্য বন্দীরা আমাদেরই প্রজা। তাদের ব্যবস্থা আমাদেরই বিবেচ্য। আপনাদের আইন আমাদের আইনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হলে তা নিজের দেশেই চালান। আমাদেরকে স্বীয় অবস্থায় থাকতে দিন। আরবদের সাথে দুর্ব্যবহার করার শাস্তি আমরা প্রাপ্যের চেয়েও বেশী পেয়েছি।

কিন্তু আমাদের দাবী অন্য প্রকার। দেশ আল্লাহর। কাজেই আল্লাহর আইনই প্রবর্তিত হবে। আমরা রাজা প্রজার পার্থক্য মিটিয়ে দিয়ে সমস্ত মানব জাতিকে একই স্তরে আনতে চাই। অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারের পরিবর্তে আমরা ন্যায় ও সাম্যের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

রাণী বললেন- রাজ্য প্রজার বিরোধ তো ভারতের প্রত্যেক রাজ্যেই রয়েছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে যেমন মানবের গড়া আইন প্রচলিত থাকায় আপনি আপত্তি করছেন না, তেমনি আরোরকে তার বর্তমান শাসনাধীন থাকতে দেওয়া কি সম্ভব নয়?

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম বললেন- আমাদের সম্বন্ধে আপনার ভুল ধারণা হয়েছে। আরোর আমাদের শেষ লক্ষ্য নয়। এ বিপ্লবের বাণী আমি ভারতের শেষ সীমা পর্যন্ত নিয়ে যেতে চাই। সিন্ধু দেশের প্রতি আমাদের মনোযোগ সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হয়েছে এ জন্য যে এখানকারই অত্যাচারিত মানবতার বিক্ষুব্ধ স্বর আমাদের কানে সর্বপ্রথম পৌঁছেছে।

রাণী আবার মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের দিকে ভাল করে তাকালেন। তিনি বললেন- তাহলে আপনি সমস্ত ভারতবর্ষ জয়ের স্বপ্ন দেখছেন।

হাঁ, আমি সারা ভারতবর্ষে ইসলামের জয় চাই। এটা স্বপ্ন নয়।

রাণী বললেন- গ্রীস থেকে আলেকজান্ডারও এ সংকল্প নিয়ে এসেছিলেন। আপনার বয়স তাঁর চেয়েও কম।

কিন্তু আলেকজান্ডার রাজাদের বিরুদ্ধে সম্রাট সেজে এসেছিলেন। রাজাদের দাসত্ব থেকে লোককে মুক্তি দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তাদেরকে স্বীয় দাসে পরিণত করতেই তিনি চেয়েছিলেন। আমি আল্লাহর রাজ্যে মানুষের রাজত্ব অস্বীকার করি। তিনি স্বীয় বাহুবলের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। আমি আল্লাহর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করি।

তিনি মানবের সাহায্যের ভরসা করেছিলেন। আমি আল্লাহর সাহায্যপ্রার্থী। তাঁর সবচেয়ে বড় পরাজয় হয় তাঁর নিজের সৈন্য বিদ্রোহী হওয়ার দরুন। আর আমার শ্রেষ্ঠ বিজয় হচ্ছে কাল পর্যন্ত যারা আমার শত্রু ছিল আজ তারা আমার সঙ্গী। এটা আমার জয় নয়, ইসলামের সত্যতার জয়।

রাণী নিরাশ হয়ে বললেন- তা' হলে এর অর্থ হচ্ছে আপনি অবশ্যই আরোর আক্রমণ করবেন।

এটা আমার কর্তব্য।

রাণী মিনতির সাথে বললেন- আমি জানি ব্রাহ্মণাবাদ ও আরোরের মধ্যে এমন পরিখা নেই যা আপনি পার হতে অক্ষম। কিন্তু আপনি আমাকে যদি কোন সদ্ব্যবহারের যোগ্য মনে করেন, তবে আমার পুত্রের উপর দয়া করুন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। আরোরে গিয়ে তাকে বুঝাবার সুযোগ আপনি আমাকে দিন। জয় সিংহ তাকে বিশ্বাস করিয়েছে মহারাজ নিহত হন নি, জীবিত আছেন। আমি এখন তাকে বুঝাতে চাই এখন যুদ্ধে কোন ফল নেই। কিন্তু আপনাকে কথা দিতে হবে সে পরাজয় স্বীকার করে নিলে তার প্রতি কোন দুর্ব্যবহার করা হবে না। সে আমার একমাত্র পুত্র। তার, সিন্ধুতে অবস্থান যদি আপনার অনভিপ্রেত হয় তবে তাকে আমি কোন দূর দেশে নিয়ে যাব।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম বললেন- আমি কথা দিচ্ছি তার সাথে কোন দুর্ব্যবহার করা হবে না। বরং সত্যের বিরুদ্ধে অসত্যের পতাকা কারণে নিরস্ত হলে তাকে আমি শ্রদ্ধার যোগ্য মনে করব। আপনি কখন যেতে চান?

আমি কাল প্রত্যুষে যাত্রা করব।

॥ পাঁচ ॥

আরোর সিন্ধুর রাজধানী ছিল বটে কিন্তু ব্রাহ্মণাবাদের রাজনৈতিক ও জঙ্গী গুরুত্ব অনেক বেশী ছিল। লোক সংখ্যাতেও এ শহর সিন্ধুর সর্বপ্রধান শহর ছিল। বিজয়ের পর মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ ও খলীফা ওলীদকে যেসব চিঠি লিখেন, তাতে জানান সিন্ধুর প্রতিরোধ শক্তি প্রকৃতপক্ষে নিঃশেষিত হয়েছে। আরোর সম্বন্ধে তাঁর ধারণা যে সেখানকার সৈন্যরা বিনা যুদ্ধেই পরাজয় স্বীকার করে নেবে। যদি প্রতিরোধ করেও, তবে এ যুদ্ধ সিন্ধুর অন্যান্য যুদ্ধের তুলনায় অত্যন্ত লঘু প্রমাণিত হবে। সিন্ধুর শেষ এবং সম্ভবতঃ দৃঢ়তম শহর মুলতান। এর ধর্মীয় পবিত্রতা বিবেচনা করে হয়ত পাঞ্জাবের কোন কোন রাজা মুলতানের সিন্ধী শাসনকর্তার সঙ্গে যোগ দেবে। কিন্তু তিনি আল্লাহর সহায়তায় বিশ্বাসী।

ব্রাহ্মণাবাদ জয়ের পূর্বেই তিনি হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফের নির্দেশ পেয়েছিলেন মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম যেন শত্রুকে বেশী প্রশ্রয় না দেন। কিন্তু এসব পত্রের উত্তরে তিনি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন সিন্ধুবাসীরা তুর্কিস্তান ও সপেনের অধিবাসীদের থেকে ভিন্ন। তারা মুসলমানকে পরিত্রাণকারী মনে করে। তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার পর পুনরায় বিদ্রোহের আশংকা নেই। তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই যে কাল পর্যন্ত যেসব সৈন্য আমাদের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করেছিল, আজ তারা আমাদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করছে।

॥ ছয় ॥

ব্রাহ্মণাবাদের কয়েকজন সামন্ত সমভিব্যহারে রাণী লাটী আরোর পৌছলেন। পিতার জীবিত থাকা সম্বন্ধে পুত্রের ভুল ধারণা দূর করতে তিনি চেষ্টা করেন। কিন্তু ফাফ্‌ফী সৎ-মা আত্মসমর্পণের বিরোধীতা করেন এবং তাকে বিদ্রূপ করেন যে তোমার মা ম্লেচ্ছদের সংস্পর্শে গিয়ে এখন তাদের অস্ত্র হিসাবে কাজ করছেন। সঙ্গে সঙ্গে নগর-পুরোহিত ঘোষণা করে যে রাণী লাটী মুসলিম সৈন্যাধ্যক্ষের সাথে কথাবার্তা বলায় ধর্মভ্রষ্টা হয়েছেন। লোকের মুখে মুখে এ কথা সালংকারে সমস্ত নগরে আগুনের মত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আরোরের কয়েকজন রাজকর্মচারী প্রতাপরায়ের আত্মীয় ছিল। প্রতাপরায়ের মৃত্যু প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে তাদের একজন পূর্ণ দরবারে প্রকাশ করে যে, মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের সন্তোষ বিধানের জন্য রাণী প্রতাপরায়কে হত্যা করেছে। এসব কারণে ফাফ্‌ফী মায়ের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হন। তিনি রাণী লাটীকে বলে, হায়, তুমি যদি আমার মা না হতে।

রাণী স্বীয় একমাত্র পুত্রের কাছে এরূপ আচরণ আশা করেন নি। কথাগুলো তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মত তাঁর বুকে বিদ্ধ হল। তিনি পর পর নিজের পুত্র সতীন ও সভাষদগণের দিকে তাকিয়ে রোষে কাঁপতে কাঁপতে চীৎকার দিয়ে বললেন-

বৎস, ভেবে কথা বল। আমি তোমার মাতা। এসব লোকদের সহায়তায় তোমার জয়লাভের যদি কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকত, তবে আমি তোমাকে বসরা পর্যন্ত ধাওয়া করতে পরামর্শ দিতাম। কিন্তু এরা যেমনি ইতর তেমনি ভীরু। যারা তোমার পিতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তারা তোমার বিশ্বাস রক্ষা করবে না। যে শত্রু লক্ষ লক্ষ সৈন্যকে পরাস্ত করেছে, তার বিরুদ্ধে তোমার দশ বিশ হাজার সৈন্য দাঁড়াতে পারবে না। সিন্ধুর অর্ধেক সৈন্য তার সাথে ইতিমধ্যেই যোগ দিয়েছে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি এদের চেয়ে অধিকতর মর্যাদাশীল নেতৃবর্গ মুসলিম সৈন্যাধ্যক্ষের পদস্পর্শ করছে। পরাজয় স্বীকার করে নিলেই তোমার মঙ্গল। নচেৎ মনে রেখো, তোমার এসব সাঙ্গোপাঙ্গো কার্যকালে তোমাকে প্রতারণা করবে। এখন পর্যন্ত যাদের শত্রুর সম্মুখীন হতে হয় তারাই এখন বেশী তেজ দেখাচ্ছে।

ফাফ্‌ফী উত্তেজিত হয়ে বললেন- মা, আপনি চুপ থাকুন। আমার সঙ্গীরা আমৃত্যু আমার সহায়তা করবে।

বৎস, তা'হলে মনে রেখো, এ যুদ্ধে মৃত্যু ছাড়া এদের আর কিছুই লাভ হবে না।

এক মাস পরে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম ব্রাহ্মণাবাদের শাসন ব্যবস্থা সুশৃংখল করার পর যখন আরোরার দিকে অগ্রসর হলেন তখন ফাফ্‌ফী টের পেলেন যে আমৃত্যু সহায়তা করার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সঙ্গীদের সম্বন্ধে রাণীর অনুমান সত্য। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম তখনো অর্ধ পথ অতিক্রম করে নি। ইতিমধ্যে ফাফ্‌ফী অবগত হলেন তাঁর কয়েকজন সামন্ত পাঁচ হাজার সৈন্যসহ রাতারাতি শহর ছেড়ে পালিয়েছে।

যখন মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের বাহিনী একদিনের পথ মাত্র দূরে ছিল তখন আরোর থেকে আরো তিন হাজার সৈন্য নগর-দ্বার রুদ্ধ দেখে সিঁড়ি দিয়ে প্রাচীর থেকে নেমে বের হয়ে যায়।

ফাফ্‌ফীর মন দমে গেল এবং অবশিষ্ট সামান্য সৈন্য নিয়ে তিনি পলায়ন করলেন।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম এক নও মুসলিম সিন্ধী নেতাকে শহরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। কয়েকদিন প্রস্তুতির পর তিনি মুলতানের দিকে অগ্রসর হলেন।

॥ এক ॥

মুলতান অবরোধের সময় মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফের মৃত্যু সংবাদ পান। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর কাছ থেকেও তিনি এক পত্র পান। তাতে পিতার মৃত্যুর সংবাদের পর মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের মাতার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গিয়েছে বলে লেখা হয়েছে। কিন্তু ভারতে কাজ শেষ না করে তিনি যেন বাড়ী ফেরার সংকল্প না করেন এটাই তাঁর মাতার ইচ্ছে বলে জানান হয়েছে। যুবায়দা নিজের সম্বন্ধে লিখেছেন- "সিন্ধু, তুর্কিস্তান এবং সপেনে যে সহস্র পত্নীদের পতিরা কর্ম-ব্যস্ত আছে, আমি তাদের চেয়ে ভিন্ন। সিন্ধুর প্রধান সেনাপতির পত্নী হিসেবে সাধারণ সৈনিকের স্ত্রীর তুলনায় অধিকতর ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে আপনার বিচ্ছেদ সহ্য করা আমার কর্তব্য। আপনি লিখেছিলেন মূলতান বিজয়ের পর আমাদেরকে আপনার কাছে নিয়ে যাবেন। কিন্তু আম্মার স্বাস্থ্যের যা অবস্থা তাতে তিনি আরো কয়েক মাস ভ্রমণ করতে পারবেন বলে মনে হয় না। আমার ভয় হচ্ছে গৃহ সম্বন্ধে আপনার উদ্বেগ আপনার বিজয় অভিযানের গতিবেগ শ্লথ করে না দেয়। ভীষণ কষ্টের সময় আপনার বিজয়বার্তা শুনলে আম্মার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যখনই তাঁর মন উদাস হয়ে ওঠে তখনই আমি তাঁর মুখে প্রার্থনা শুনতে পাইঃ "আল্লাহ ইসলামের প্রথম যুগের মুজাহিদ-মাতাদের ন্যায় আমার মনে ধৈর্য ও স্থৈর্য দান কর! আবার যখনই তিনি আমাকে বিমর্ষ দেখেন তখন বলেন- 'যুবায়দা, তুমি এক ধর্মযোদ্ধার স্ত্রী'। নাহীদ ও যুহ্‌রাকে আমার সালাম জানাবেন। এ বোনদের উপর আমার ঈর্ষা হয় যারা প্রতিদিন রণক্ষেত্রে মুজাহিদগণের অশ্বের দ্বারা উত্থিত ধূলা দেখতে পায়। ব্রাহ্মণাবাদের বন্দীশালা থেকে যে-সব নারী ও শিশুদের মুক্ত করেছেন বসরায় তাদের আগমন প্রতীক্ষা করা হচ্ছে। তাদের কখন পাঠাচ্ছেন? আপনার প্রতি পদক্ষেপ উন্নতির দিকে অগ্রসর হোক এবং আমার নয়নের প্রতি দৃষ্টি আপনার সৌভাগ্যের চক্রবাল স্পর্শ করুক-এর চেয়ে প্রার্থনীয় আর আমার কি হতে পারে?"

কিছুদিন প্রতিরোধ করার পর মুলতানবাসী আত্মসমর্পণ করল। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম আমির দাউদ নসরকে মুলতানের উচ্চতম আমীর নিযুক্ত করে আরবারে ফিরে গেলেন। পথে তিনি সংবাদ পান কনৌজের[১] রাজা হরিচন্দ্র রাজকুমার জয় সিংহকে আশ্রয় দিয়ে সিন্ধু আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। সংবাদ পাওয়া মাত্রই মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম ধাওয়া করে আরোর পৌছেন এবং সেখানে অবস্থান করার পরিবর্তে কনৌজ আক্রমণ করে দিলেন। সিন্ধু ও রাজপুতানার সীমানায় উভয় বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হল। রাজা

১. কনৌজ দক্ষিণ ভারতের শহর নয়। বর্তমান উদয়পুরের নিকটস্থ তখনকার একটি শক্তিশালী সামন্ত রাজ্যের রাজধানী ছিল।

হরিচন্দ্র জয় সিংহের মুখে শুনেছিলেন বিদেশী হানাদারদের সংখ্যা দশ হাজারের অধিক নয়। কিন্তু তিনি যখন নিজের চোখে দেখলেন 'মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের জয়' ধ্বনিকারী সিন্ধুবাসীর সংখ্যা আরবদের চেয়ে বহুগুণে বেশী তখন তিনি জয় সিংহকে অভিশাপ দিয়ে রণক্ষেত্র ছেড়ে ফিরে চলে গেলেন। জয় সিংহের কয়েকজন সঙ্গী তাঁকে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের কাছে সন্ধি প্রস্তাব করার পরামর্শ দিল। কিন্তু চতুর্দিক থেকে নিরাশ হওয়া সত্ত্বেও তিনি তা গ্রহণ করলেন না। তিনি দক্ষিণ দিকে পলায়ন করলেন। মাত্র দু'জন সামন্ত তাঁর সঙ্গে গেল। অন্য সবাই মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের আশ্রয় নিল।

এরপর মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম সিন্ধুর শাসন ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করা বা প্রতিবেশী রাজ্যসমূহ আক্রমণ করার পূর্বে স্বীয় সৈন্য বাহিনীকে নতুন করে পুনর্গঠন করার জন্য আরোরে ফিরে আসেন। তাঁর ফেরার একদিন পূর্বে বসরা থেকে এক দূত এসে পৌঁছেছিল। সে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমকে দেখেই বলে উঠল- প্রধান সেনপতি, আমি অত্যন্ত খারাপ সংবাদ নিয়ে এসেছি।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের গম্ভীর চেহারায় চিন্তার সামান্য চিহ্ন পরিলক্ষিত হল। ওষ্ঠে বিষণ্ণ হাসি টেনে জিজ্ঞেস করলেন- এ সংবাদ আমার মাতা সম্বন্ধে নয় তো?

দূত মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো এবং পকেট থেকে এক পত্র বের করে তাঁর হাতে দিল। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম তাড়াতাড়ি পত্র খুলে পড়লেন এবং ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজি'উন' বলে মাথা নত করলেন।

রাজ প্রাসাদের যে অংশে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম অবস্থান করতেন, সন্ধ্যার সময় সেখানে শহরের গণ্যমান্য লোকদের ছাড়া হাজার হাজার বিধবা নারীও উপস্থিত ছিল। এদের চোখ সিন্ধু, বিজয়ী স্নেহময় ভাই ও দয়ালু পিতার স্থান দখল করেছিলেন। দেবতাদের দেশে যেসব পুরোহিত মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমকে এক নব দেবতারূপে বরণ করেছিল, তারাও তাঁর মাতৃবিয়োগে দুঃখ প্রকাশ করেছিল।

প্রাসাদ থেকে বাইরে এসে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানালেন।

রাতে মশালের আলোতে তিনি আর একবার যুবায়দার পত্র পাঠ করলেন। নিম্নলিখিত শব্দগুলোর উপর তাঁর দৃষ্টি অনেক্ষণ নিবদ্ধ হল ঃ- মৃত্যু-শয্যায় আম্মাজানের শেষ কথা ছিল- শরীরের বন্ধন থেকে আমার আত্মা মুক্তিলাভ করে "যেসব রণক্ষেত্রে আমার পুত্র ইসলামের বিজয়-ধ্বজা প্রতিষ্ঠা করছে সেখানে ঘোরাফেরা করতে পারবে।"

॥ দুই ॥

তিন মাসের মধ্যে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম আরব সৈন্য ছাড়াও এক লক্ষ সিন্ধু নও মুসলিম ও অমুসলমান সৈন্যকে সামরিক শিক্ষা দিয়ে প্রস্তুত করেন। ইসলাম না গ্রহণ করেও অমুসলিম সিন্ধী সৈন্যরা ভারতের শেষ সীমা পর্যন্ত এ তরুণ সেনাপতির বিজয় পতাকা উড্ডীন করা মানবতার শ্রেষ্ঠ সেনারূপে গ্রহণ করেছিল। তারা তাঁকে স্বীয়

ত্রাণকর্তা মনে করত এবং মনে করত যে সারা ভারতের জন্য এরূপ ত্রাণকর্তার প্রয়োজন রয়েছে।

একদিন আরোরের এক বিখ্যাত ভাস্কর দেবলের চৌরাস্তায় তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি প্রদর্শনীর জন্য স্থাপন করে। এটা ছিল মর্মর পাথরের এক প্রতিমূর্তি যার নীচে খোদিত ছিল ঃ- "যে দেবতা এদেশে ন্যায় ও সাম্যের রাজত্ব স্থাপন করেছেন।"

দেবলের হাজার হাজার নাগরিক এ প্রতিমূর্তির কাছে একত্রিত হয়ে তার আপাদমস্তক ফুল দ্বারা ঢেকে দিয়েছিল। দেবলের বহু নেতৃবর্গ নিজ ঘরের শোভা ও গৌরব বর্ধনের জন্য যে কোন মূল্যে এ প্রতিমূর্তি ক্রয় করতে রাযী ছিলেন। কিন্তু নগরের পুরোহিতগণের সমবেত মত এ ছিল যে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের ন্যায় দেবতার মূর্তির স্থান কোন ধনীর ঘরে না হয়ে মন্দিরেই হওয়া উচিত। ভাস্কর নিজেও তার শ্রেষ্ঠ কীর্তির গুরুত্ব অনুভব করে তাকে মন্দিরে স্থাপন করাই স্থির করল। পুরোহিতগণ এক প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির এর জন্য নির্বাচন করল।

বিকেলের দিকে নগরের পুরোহিত ও জনসাধারণ এক বিরাট মিছিল করে প্রতিমূর্তির মন্দিরের দিকে নিয়ে চলল। মিছিল যখন রাজ প্রাসাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল তখন ভীম সিংহ ছুটে গিয়ে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমকে জানালেন লোকে আপনার প্রতিমূর্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করতে নিয়ে যাচ্ছে।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম ব্যস্ত হয়ে বাইরে এলেন। তাঁকে প্রাসাদের সিঁড়িতে দন্ডায়মান দেখে মিছিল থেমে গেল। নগরের প্রধান পুরোহিত অগ্রসর হয়ে বললো- এরা এর চেয়ে বেশী সম্মান আপনাকে করতে পারে না। এ মূর্তি ভাস্করের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। কিন্তু এদের হৃদয়ে আপনার যে মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তা এর চেয়ে বহু গুণে সুন্দর।

জনতাকে সম্বোধন করে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম উচ্চস্বরে বললেন- "থামো আমি তোমাদের কাছে কিছু বলতে চাই।"

বাদ্য ও চীৎকার সব বন্ধ হয়ে গেল। জনতা সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম নিজের বক্তৃতায় মূর্তিপূজা সম্বন্ধে ইসলামের দৃষ্টিভংগীর ব্যাখ্যা করেন এবং উপসংহারে জনতাকে নিম্নরূপ আবেদন করেন ঃ-

'আমাকে পাপী করো না। আমার মধ্যে কোন গুণ থাকলে সেটা ইসলামেরই দান। ইসলামের অনুসারী হয়ে যদি আমি মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শ স্থাপন করতে সক্ষম হয়ে থাকি, তবে এ পথ সকলের জন্যই উন্মুক্ত রয়েছে। তোমরা আমার পূজা করো না। বরং যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তারই পূজা করো। আমিও তাঁরই পূজা করি। তাঁর ধর্ম প্রত্যেক মানুষকে ন্যায়, সাম্য ও মুক্তির শিক্ষা দেয়।

ভাবের আবেগে সবাই অভিভূত হল। কিন্তু প্রতিমূর্তির বিরুদ্ধে জীবন্ত দেবতার আদেশ অমান্য করতে পারল না। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম বললেন- এসব দেখে আমার আন্তরিক কষ্ট হয়েছে। ভাস্কর সামনে এসে করজোড়ে দাঁড়িয়ে বলল- ভাস্কর কেবল মূর্তি গড়েই তার মনের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে।

তাদের বিভিন্ন কাল্পনিক মূর্তি গড়েছিল। কিন্তু আপনাকে দেখার পর আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে আমি যে দেবতারই মূর্তি গড়ব তার গঠন ও চেহারা আপনার মতই হবে। বেলার যুদ্ধে আমার পুত্র আহত হয়েছিল। অন্যান্য আহতদের মত আপনি তারও সেবা শুশ্রূষা করেছিলেন এবং সে সুস্থ হয়েছিল। কিন্তু এখানে পৌছে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং কিছুদিন পরে মারা যায়। মরবার সময় আপনি যে রুমাল দিয়ে তার ক্ষত বেঁধে দিয়েছিলেন তা চুম্বন করছিল। সে আমাকে প্রতিজ্ঞা করায় যে আমি আপনার মূর্তি প্রস্তুত করব। কিন্তু আপনাকে রুষ্ট দেখে হয়ত তার আত্মাও যন্ত্রণা ভোগ করছে। পুত্রের দেবতাকে পূজা করার পরিবর্তে তাঁর আদেশ পালন করা আমি জরুরী মনে করি। আপনার আদেশ হলে আমি এ প্রতিমূর্তি ভেংগে ফেলতে প্রস্তুত আছি।

মুহম্মদ ইবন কাসিম জবাব দেন, সেটা আমার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ হবে।

অনুগ্রহ? এমন কথা বলবেন না। এ মূর্তি চূর্ণ করার পরও আমি আপনাকে দেবতা বলেই শ্রদ্ধা করব। সিন্ধুর হাজার হাজার লোকও আপনাকে দেবতা বলেই মান্য করবে।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম বললেন- এদেশে মনুষ্যত্বের সেবক হিসাবে পরিচিত হওয়াই আমার একমাত্র আকাংখা।

বুকে পাথর বেঁধে ভাস্কর কুঠারের এক প্রচন্ড আঘাতে প্রতিমূর্তিটি চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল। জনতা উক্ত প্রস্তারখন্ডসমূহকে হীরকখন্ড জ্ঞানে লুফে নিল।

এ ঘটনার পর আরোরের হাজার হাজার নাগরিক ইসলামী শিক্ষার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হলো। সিন্ধু সর্বত্র দিন দিন নও মুসলিমের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল।

॥ তিন ॥

আরোর থেকে কয়েকজন সেনাপতি ছুটি নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের ইচ্ছা ছিল ফিরবার সময় স্ব স্ব পরিবার পরিজন নিয়ে এসে স্থায়ীভাবে সিন্ধু দেশে বাস করবেন।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম যুবায়দাকে লিখলেন যে অন্যান্য মহিলাদের সাথে তিনিও যেন বসরা থেকে সিন্ধু চলে আসেন। তিনি বসরার শাসনকর্তাকেও লিখলেন অন্যান্য মেয়েদের সাথে যুবায়দাকেও যেন প্রহরীদের তত্ত্বাবধানে আরোরে পৌছবার ব্যবস্থা করা হয়। এরপর তিনি রাজপুতানা ও পাঞ্জাব বিজয়ের জন্য মানচিত্র তৈরী করতে ব্যস্ত রইলেন। কিছুদিন গভীর চিন্তার পর তিনি সিদ্ধান্ত করলেন পাঞ্জাবের পূর্বে রাজপুতানাকে পদানত করা প্রয়োজন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যুবায়দার আগমনের পূর্বে রাজপুতানার অভিযান শেষ করে ফেলবেন। পরে মুলতানে মুল শিবির স্থাপন করে পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হবেন। বসরাগামী সৈন্যদের বিদায়ের সাতদিন পরে এক সন্ধ্যায় তিনি নগর উপকণ্ঠে সৈন্য-শিবিরে গিয়ে এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন এবং পরদিন প্রত্যুষে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে আদেশ দেন।

কিন্তু এক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের কথা, "মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের গৌরব রবি ঠিক মধ্যাহ্নে অস্ত হতে চলছিল।" ফজরের নামাযের পর যখন আরোরবাসীগণ শিবিরে

উপস্থিত হয়ে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমকে বিদায় দিচ্ছিল এবং স্ত্রীলোকেরা যোদ্ধাগণের গলায় ফুলের মালা পরাচ্ছিল, তখন হঠাৎ এক দিক থেকে উড়ন্ত ধূলি দেখা দিল। মুহূর্তের মধ্যে পঞ্চাশজন অস্ত্রধারী আরব অশ্বারোহী দৃষ্টিপথে উদিত হল। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম এক শ্বেত অশ্বে আরোহণ করে স্বীয় বাহিনী পরিদর্শন করছিলেন। আগন্তুক অশ্বারোহীদের গতিবেগ দেখে তাঁর টনক নড়ল। কয়েকজন সেনাপতিসহ একদিকে দাঁড়িয়ে আগুয়ান অশ্বারোহীদের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

এ অশ্বারোহীদের সংগে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের কতিপয় সেনাপতিও ছিলেন যারা এক সপ্তাহ আগে ছুটি নিয়ে বসরা যাত্রা করেছিলেন। এ অশ্বারোহী অগ্রসর হয়ে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমকে একখানা চিঠি দিয়ে বলল- এ পত্র আমীরুল মু'মিনীন সুলায়মান ইব্‌ন আব্‌দিল মালিক পাঠিয়েছেন।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম চমকে উঠে বললেন- আমীরুল মু'মিনিন .... সুলায়মান ....?

সে উত্তর দিল, -হাঁ, খলীফা ওলীদ পরলোক গমন করেছেন।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না, ইলাইহি রাজিউন বলে তাড়াতাড়ি চিঠি খুলে পাঠ করলেন। কিছুক্ষণ মাথা নত করে চিন্তা করার পর তিনি দূতকে বললেন- সুলায়মানের কাছে আমি এটাই আশা করেছিলাম। য়াযীদ ইব্‌ন আবী কাব্‌শা কে?

একজন অর্ধবয়সী লোক ঘোড়া এগিয়ে বলল- আমি।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম স্বীয় অশ্ব এগিয়ে য়াযীদ ইব্‌ন আবী কাব্‌শার করমর্দন করে বললেন- এ সৈন্য বাহিনীর নেতৃত্বের জন্য আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আমীরুল মু'মিনীনের শৃংখল পরার জন্য আমি প্রস্তুত।

য়াযীদ ইব্‌ন আবী কাব্‌শা মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের ম্লান হাসি দেখে অভিভূত হলেন। তিনি যাত্রার জন্য সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশের প্রতীক্ষারত শিবিরের অসংখ্য সৈন্যের দিকে তাকালেন। যেসব সেনাপতি ওলীদের মৃত্যু ও সুলায়মানের সিংহাসনে আরোহণের খবর পেয়ে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের পাশে একত্রিত হয়েছেন তাঁদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। য়াযীদ ইব্‌ন আবী কাব্‌শা অনুভব করলেন এই এক লক্ষ উৎসর্গিত প্রাণ বীর যোদ্ধাদের প্রিয় নেতার সামনে তিনি নিজেই এক অপরাধীর ন্যায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমি 'আমীরুল মু'মিনীনের শৃংখল পরার জন্য প্রস্তুত'- মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের এ কথা বারবার তাঁর কানে গুঞ্জরণ করছিল। তিনি অনুভব করছিলেন বিধাতা তাঁর মস্তকে আকাশ পাতালের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টি বহুবার মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের প্রতি উত্থিত ও অবনমিত হল। তিনি স্বীয় সংগীদের দিকে তাকালেন। তারা সকলেই মস্তক নত করে দাঁড়িয়েছিল। কয়েকবার তিনি কথা বলতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু স্বর আটকে গেল। অবশেষে তিনি বললেন- বন্ধু, বিধাতার পরিহাস যে, এ নীচতা আমার দ্বারাই অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম উত্তর দিলেন- আপনি বিচলিত হবেন না। আপনি কেবল দূত মাত্র। খালিদ, এঁকে প্রাসাদে নিয়ে যাও। আর যুবায়র আপনি সৈন্যদেরকে জানিয়ে দিন

আজ যাত্রা করার সংকল্প আমরা স্থগিত রেখেছি।

ভীম সিংহ অগ্রসর হয়ে বললেন- এ পত্রে যদি কোন গোপনীয় কথা না থাকে তবে খলীফার কাছ থেকে আপনি কি আদেশ পেয়েছেন তা জানবার জন্য আমরা সবাই উৎসুক হয়ে আছি।

মুহম্মদ ইবন কাসিম চিঠিখানা মুহম্মদ হারুনের হাতে দিয়ে বললেন- ইনি আপনাদের সবাইকে পড়ে শুনাবেন।

সন্ধ্যার সময় আরোরের প্রত্যেক অলিতে-গলিতে শোক ছেয়ে গিয়েছিল। হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের বংশের সাথে সুলায়মানের প্রাচীন শত্রুতার সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রতি ঘরে সিন্ধুর নতুন শাসনকর্তার আগমন এবং মুহম্মদ ইবন কাসিমের প্রত্যাগমনের কথা আলোচিত হচ্ছিল। শহরের হাজার হাজার নারী, পুরুষ ও শিশু রাজ প্রাসাদের চারদিকে জড় হয়ে চীৎকার করছিল।

মগ্‌রিবের নামাযের পরে মুহম্মদ ইবন কাসিমের বাহিনীর সমস্ত কর্মচারীদের এক সভা প্রাসাদের এক প্রশস্ত ঘরে অনুষ্ঠিত হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুহম্মদ ইবন কাসিমকে এ সভায় যোগ দিতে হয়। তিনি এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বলেনঃ-

প্রভাতেই আমি দামিশ্‌ক যাত্রা করব স্থির করেছি। এ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে আমি রাযী নই। সৈনিকের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য নেতার আদেশ পালন করা। আপনারা বর্তমান ঘটনায় বিচলিত হবেন না এবং নতুন সেনাপতির সাথে আপনারা বর্তমান ঘটনায় বিচলিত হবেন না। নতুন সেনাপতির সাথে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করুন। নেতার আদেশ পালনে আমি তৎপর কি না তা পরীক্ষা করাই হয়ত খলীফা সুলায়মানের উদ্দেশ্য। দামিশ্‌ক হতে আসার সময় তিনি আমার প্রতি রুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তখন তাঁর হাতে দায়িত্বভার ছিল না। এখন তিনি মুসলিম জাতির কর্ণধার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে। খুব সম্ভব তিনি ভারতে আমার আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করার জন্য আমাকে ফিরে পাঠাবেন। কিন্তু আমি যদি তাঁর ভুল ধারণা দূর করতে সক্ষম না হই এবং তিনি পুনরায় আমাকে এখানে আসার সুযোগ না দেন তা হলেও য়াযীদ আবী কাবশার আদেশ পালন করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য।

ভীম সিংহ বললেন- আপনি যে আদেশ দিবেন তাই আমরা মানতে প্রস্তুত। কিন্তু সিন্ধুর সমস্ত নেতৃবর্গের মত এই যে খলীফার সদিচ্ছা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আপনি এখান থেকে না যান। আমি যুবায়রের কাছে দামিশ্‌কের সমস্ত ঘটনার কথা শুনেছি। আমার মন সাক্ষ্য দিচ্ছে সুলায়মান আপনার সাথে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করবেন। আমরা আপনাকে সুলায়মানের প্রজা মনে করি না, বরং আমাদের হৃদয়ের রাজা মনে করি। আপনার ইংগিতে আমরা আগুনে ঝাঁপ দিতে পারি। আমাদের চোখের সামনে আপনাকে শৃংখল পরাবে তা আমরা সহ্য করতে পারব না। আপনার আরব সংগীদের মনে হয়ত খলীফার দরবারের সম্মান জাগরূক আছে। কিন্তু সিন্ধুকে তার শ্রেষ্ঠ বন্ধু থেকে বঞ্চিতকারী খলীফার জন্য আমাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। আমরা জীবনে মরণে আপনার

সহায়তায় প্রতিজ্ঞা করেছি। এ প্রতিজ্ঞা ভংগ করার নয়। আপনি সিন্ধুতে থাকুন। সিন্ধুতে আপনার প্রয়োজন রয়েছে। আপনার আরব সংগীরা আপনার পক্ষ ত্যাগ করলেও আমাদের এক লক্ষ অসি আপনাকে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত। শুধু তাই নয়, বরং বিপদের সময় সিন্ধুর প্রত্যেক আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা আপনার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হবে। ভগবানের দোহাই, আপনি যাবেন না। অন্ততঃ ততক্ষণ যাবেন না, যতক্ষণ আমরা আশ্বস্ত হতে না পারি সুলায়মান আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করবেন না। আমার কথায় যদি আপনার মন না টলে, তবে একবার প্রাসাদের নীচে তাকিয়ে দেখুন এবং সিদ্ধান্ত করুন যে সহস্র সহস্র পিতৃহীন শিশু আপনাকে পিতা মনে করে, যে সহস্র সহস্র বৃদ্ধ আপনাকে পুত্র মনে করে। যে সব সহায়া বিধবা আপনাকে ভাই মনে করে, আপনার উপর তাদের কোন অধিকার আছে কি না।

উপসংহারের দিকে ভীম সিংহের স্বর ধরে এল। উপস্থিত সবাই পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল।

যুবায়র বলেন- আপনি ভাল করেই জানেন সুলায়মান আপনার সাথে ভাল ব্যবহার করবেন না। আপনি এখানেই থাকুন এবং আমাকে আমীরুল মু'মিনীনের কাছে যাওয়ার সুযোগ দিন। আমার জীবন তত মূল্যবান নয়। কিন্তু সিন্ধু ও মুসলিম জগতের জন্য আপনার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম জবাব দিলেন- আমার প্রত্যেক সৈনিকের জীবনকে আমার জীবনের চেয়ে বেশী মূল্যবান মনে করি। আর ভীম সিংহ, তোমার ও তোমার সংগীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। কিন্তু আমার ব্যক্তিত্বকে তোমরা আমার উদ্দেশ্যের উপরে স্থান দিয়েছ। তোমরা জান না যে মহান আদর্শের জন্য গত এক শতাব্দী যাবত লক্ষ লক্ষ বীর রক্ত দান করেছেন, খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অর্থ সেই আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। এই এক লক্ষ সৈন্য সারা ভারতবর্ষ জয়ের জন্য যথেষ্ট। আমার জীবন এত মূল্যবান নয় যে আমি তার জন্য এই এক লক্ষ তরবারীকে মুসলিম জগতের এক লক্ষ তরবারীর সংগে সংঘর্ষ বাধাবার অনুমতি দেব। এরূপ সংঘাতে আমার জয় হলেও তা মুসলমানের প্রচন্ডতম পরাজয়ের সমর্থক হবে। তুর্কিস্তান ও সপেনে আমাদের যেসব সৈন্য জিহাদে ব্যস্ত, সিন্ধুর সৈন্যাধ্যক্ষ স্বীয় প্রাণ ভয়ে মুসলিম জগতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে বলে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হোক- এরূপ ব্যবস্থা কি আমি কখনো পছন্দ করিতে পারি? এটা সুলায়মান ও আমার ব্যক্তিগত প্রশ্ন হলে আমি হয়ত তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতাম না। কিন্তু যে জাতি সুলায়মানকে নিজেদের খলীফা বলে মেনে নিয়েছে আমি সেই জাতির কাছে আত্মর্পণ করছি। আমার মৃত্যু যদি মুসলিম জাতিকে এরূপ একটি সংঘর্ষ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়, তা হলে এটা আমার সৌভাগ্য বলে গণ্য করব। তোমরা বলেছ আমার ইংগিতে তোমরা প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত আছ। আতি তোমাদের কাছে কোন প্রকার ত্যাগ দাবী করার অধিকারী নই। কিন্তু তোমরা যদি চাও যে সিন্ধু থেকে বিদায় নেয়ার কালে আমার মনে

কোন ক্ষোভ না থাকে এবং আমি সিন্ধুতে কোন আরব্ধ কাজ অসমাপ্ত রেখে যাইনি এরূপ মনের শান্তি নিয়ে যাই, তা হলে যে ধর্মকে তোমরা কার্যক্ষেত্রে গ্রহণ করেছ তাকে মুখেও ঘোষণা করে দাও। আর যেসব বন্ধু এখানে উপস্থিত তাদের সবার জন্যই আমার এই আহবান। তোমাদের মত লোক ইসলাম গ্রহণ করে সিন্ধু কোন মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের মুখাপেক্ষী থাকবে না। এখন 'ইশার নামাযের সময় হয়ে এসেছে। যে পথিক দীর্ঘ ভ্রমণের পর অভীষ্ট স্থানে পৌছেই শুয়ে পড়তে চায়, আজ আমার অবস্থা তারই মত। আমার ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে আপনারা এ মুহূর্তে কোন সিদ্ধান্ত করে ফেলুন, আমার অভিপ্রায় তা নয়। কিন্তু আন্তরিকভাবে যদি আপনারা ইসলামের সৌন্দর্যসমূহ স্বীকার করে থাকেন, তা'হলে আপনাদের ঘোষণা শুনে আমার আধ্যাত্মিক আনন্দ হবে।

ভীম সিংহ উচ্চস্বরে কালিমা তওহীদ পাঠ করে বললেন- আমি ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ না হলেও আপনার আহবান উপেক্ষা করতাম না। আপনার মত লোক মুসলমান, এটাই আমার কাছে ইসলামের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম দাঁড়িয়ে ভীম সিংহকে আলিংগন করলেন এবং বললেন, মুসলমানদের মধ্যে তোমরা আমার মত হাজার হাজার লোক পাবে।

আরো আটজন নেতা ভীম সিংহের অনুসরণে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরা যখন ইশার নামাযের জন্য বাইরে যাচ্ছিল তখন প্রাসাদের আর এক ঘর থেকে আরোরের প্রধান পুরোহিতের নেতৃত্বে নগরের প্রধান ব্যক্তিদের একটি দল যাযীদ ইব্‌ন আবী কাব্‌শার সাথে দেখা করে ফিরছিলেন। এ প্রতিনিধিদলের সভ্যরা বিষণ্ণ মুখে যাযীদের ঘরে প্রবেশ করে হাসি মুখে ফিরে আসেন। যাযীদ তাদের দেবতার প্রাণ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং তারা অনুভব করছিলেন যে সিন্ধু-সূর্যের পাশে ঘনায়মান মেঘ সরে গিয়েছে।

পুরোহিত ও তার সংগীরা বাইরে এলে অসংখ লোক তাদের ঘিরে দাঁড়াল। সহস্র সহস্র ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে পুরোহিত এই মাত্র বললেন- তোমরা বাড়ী যাও। সন্দুর ভাগ্য-নক্ষত্র শাপমুক্ত হয়েছে। তোমাদের দেবতা তোমাদেরই থাকবে।

॥ এক ॥

ইশার নামাযের পর যখন মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম নিজের ঘরে প্রবেশ করছিলেন, তখন য়াযীদ ইব্‌ন আবী কাব্‌শা তাঁকে ডাক দিলেন। খালিদ, যুবায়র ও ভীম সিংহ আবু কাব্‌শার সংগে আসছিলেন। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম দরজায় দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকালেন। য়াযীদ কাছে এসে খালিদ, যুবায়র ও ভীম সিংহকে বিদায় দিলেন এবং মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের হাত ধরে ভেতরে প্রবেশ করলেন।

ঘরে মশাল জ্বলছিল। আলী এক চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম য়াযীদকে এক কুর্‌সীতে বসতে ইশারা করে বললেন- এ ছেলেটি আমাকে বড় ভালবাসে। এত ব্রাহ্মণাবাদে বন্দী ছিল।

য়াযীদ মুচ্‌কি হেসে বললেন- এদেশে এমন কে আছে যে আপনাকে ভালবাসে না?

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম কুর্‌সীতে বসতে বসতে কথার মোড় ঘুরাবার জন্য বললেন- বিদায় নেয়ার পূর্বে আপনাকে সিন্ধুর অবস্থা সম্বন্ধে সব কথা বলে যাব মনে করেছিলাম। কাল্‌ প্রত্যুষেই আপনার সাথে দেখা করব ভাবছিলাম। কিন্তু ভাল হল আপনি নিজেই এসে পড়েছেন।

য়াযীদ বললেন- আপনাকে সিন্ধুর অবস্থা জিজ্ঞেস করতে আমি আসি নি। আমি বলতে এসেছি আপনি এখানেই থাকবেন।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম বললেন- আপনার সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমি আমীরুল মু'মিনীনের আদেশ অমান্য করতে পারি না।

কিন্তু আপনি জানেন না সুলায়মান আপনার রক্ত-পিপাসু।

আমি জানি। কিন্তু আমার কয়েক ফোঁটা রক্তের জন্য মুসলিম জগত দ্বিধা বিভক্ত হবে, তা আমি চাইনা।

আপনি এ বয়সেই আমার প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশী দূরদর্শী। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি নিজে গিয়ে যদি সুলায়মানকে জানিয়ে দেই সিন্ধুতে এক লক্ষ সৈনিক আপনার জন্য শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, তা'হলে নিশ্চয় তিনি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন না।

কিন্তু তার অবশ্যম্ভাবী ফল হবে আমি এবং আমার সংগে মুসলমানদের একটি সুবৃহৎদল কেন্দ্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব এবং আমরা পৃথিবীতে সমবেত প্রচেষ্টার পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে। কেন্দ্রহীনতা পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তিগুলোকেও ধ্বংস করে যে কথা আপনাকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই।

য়াযীদ বললেন- নামাযের পূর্বে আমার কাছে আরোরের গণ্যমান্য লোকদের একটি প্রতিনিধিদল দেখা করতে এসেছিল। তাঁরা বলেছিলেন- আমাদের দেবতাকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিবেন না। সুলায়মান যদি আপনার সাথে কোন দুর্ব্যবহার করে, তা'হলে সারা ভারতবর্ষ তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে উঠবে।

আপনি তার জন্য চিন্তা করবেন না। আমি তাদের মানিয়ে নেব।

মুহম্মদ ইবন কাসিমের সিদ্ধান্ত অটল দেখে, য়াযীদ নীরব হলেন। এরপর মুহম্মদ ইবন কাসিম সিন্ধুর অবস্থা তাঁকে বিস্তারিতভাবে জানান। এদেশের লোকদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে এবং বিপদের সময় দেবলের শাসনকর্তা নাসিরুদ্দীন এবং ভীম সিংহের পরামর্শ মত কাজ করতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

উঠতে উঠতে য়াযীদ বললেন- আমি কেবল আর একটি কথা আপনাকে বলতে চাই। সেটা এই যে, সুলায়মানের আদেশ মত আপনি এখান থেকেই পায়ে শৃংখল পরে বিদায় নিতে যিদ করবেন না। এতে সহস্র সহস্র লোকের হৃদয় বিক্ষত হবে এবং সম্ভবতঃ জনসাধারণও উত্তেজিত হয়ে উঠবে।

আপনি যদি তাই কল্যাণকর মনে করেন তবে আমি যিদ করব না। নচেৎ নেতার আদেশ পালনে পায়ে শৃংখল পরতে আমি গৌরব অনুভব করতাম।

য়াযীদ তাঁর করমর্দন করতে করতে বললেন- আর একটা প্রশ্ন। আরব সেনাপতিদের মধ্যে আপনার শ্রেষ্ঠ বন্ধু কে?

সকলেই আমার বন্ধু। তবে যিনি আমার জীবনের সব বিষয় ভালরূপে জানেন, তিনি যুবায়র। তিনি সর্বদা আপনার সাথে থাকবেন।

না। আমি তাকে এক জরুরী কাজে এখুনি মদীনায় পাঠাতে চাই। তিনি আপনার প্রত্যেক আদেশ পালন করবেন।

আপনার বিদায়ের পূর্বেই আমি তাঁকে পাঠিয়ে দিতে চাই। আপনি তাঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।

মুহম্মদ ইবন কাসিম আলীকে জাগিয়ে বললেন- এঁকে এঁর ঘরে পৌঁছে দিয়ে এস এবং যুবায়রকে এঁর কাছে পাঠিয়ে দাও।

॥ দুই ॥

য়াযীদকে তাঁর ঘরে পৌঁছিয়ে আলী যুবায়রকে ডাকতে চলে গেল। য়াযীদ মশালের আলোর কাছে চিঠি লিখতে বসে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে যুবায়র ভেতরে প্রবেশ করলেন। য়াযীদ তাঁকে বসতে ইংগিত করলেন।

যুবায়র অনেকক্ষণ বসে রইলেন। চিঠি শেষ করে য়াযীদ যুবায়রকে বললেন- আপনি এক দীর্ঘ সফরের জন্য প্রস্তুত হোন। এ চিঠিখানা পড়ে নিন।

য়াযীদ যুবায়রকে চিঠিখানা দিলেন। চিঠি পাঠ করে যুবায়রের বিমর্ষ মুখ আশার

আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। য়াযীদের এ চিঠি হযরত উমর ইবন আব্দিল আযীযের' নামে লিখিত। চিঠিতে তিনি মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমকে মুসলিম জাহানের শ্রেষ্ঠ মুজাহিদ প্রমাণ করে 'উমর ইব্‌ন আব্দিল আযীযে'র নিকট আবেদন করেছেন যে, তাঁকে সুলায়মানের প্রতিহিংসা হতে রক্ষা করার জন্য তিনি যেন সম্ভবপর সর্বপ্রকার চেষ্টা করেন। য়াযীদের চিঠির শেষ কথাগুলো নিম্নরূপ ঃ-

"মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের ন্যায় মুজাহিদ বারবার জন্ম গ্রহণ করে না। আমার জীবনে বহু মহাত্মার সংস্পর্শে এসেছি। কিন্তু এ যুবকের মহানুভবতার প্রকৃত অনুমান করা আমার সাধ্যের অতীত। সতর বছর বয়সে সে সিন্ধু জয় করেছে। এখন তার অধীনে এক লক্ষ বার হাযার সৈন্য রয়েছে যারা তাঁর জন্য জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। তারাও সে নেতার আদেশ শিরোধার্য করে শৃংখল পরতেও প্রস্তুত। ইসলামের সমাজদেহে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম এমন একটি প্রাণ, যার প্রতিটি স্পন্দন আমার ন্যায় লোকের চিরজীবনের সাধানার চেয়েও মূল্যবান। আপনি ইসলাম জগতকে এক অপূরণীয় ক্ষতি হতে রক্ষা করতে পারেন।"

যুবায়র চিঠি পড়ে য়াযীদকে জিজ্ঞেস করলেন- আপনি বিশ্বাস করেন যে, তিনি সুলায়মানকে টলাতে পারবেন?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি পারবেন। আপনি যান। তিনি এখন মদীনায় আছেন। কিন্তু পথে একটি মুহূর্তও নষ্ট করবেন না। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফের জামাতা। এই অপরাধেই সুলায়মানের পরামর্শদাতা তাঁর পরম শত্রু। তিনি সর্বপ্রকার চেষ্টা করবেন বলে যাতে সিদ্ধান্ত খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। এরূপ প্রভাবশালী ব্যক্তিকে বেশীক্ষণ জীবিত থাকতে দেওয়া সুলায়মান নিজেও বিপজ্জনক মনে করবে। 'উমর ইব্‌ন আব্দিল আযীযকে যদি মদীনায় না পান, তা'হলে তিনি যেখানেই থাকুন তাঁর কাছে যাবেন এবং চেষ্টা করবেন তিনি যেন মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের ভাগ্য স্থির হওয়ার আগেই দামিশ্‌কে পৌঁছে যান। সারা ভারত জয়ের চেয়েও এ কাজটি আমি বেশী গুরুতর মনে করি।

যুবায়র দাঁড়িয়ে বললেন- আমি এখনই যাচ্ছি।

যান। আল্লাহ্ আপনার সহায় হউন।

যুবায়র য়াযীদের ঘরে থেকে বের হয়ে ছুটে নিজের ঘরে গেলেন। নাহীদ, খালিদ আর যুহ্‌রা তাঁর প্রতীক্ষা করছিল। সকলে এক সাথে বলে উঠল- কি খবর?

আমি মদীনায় যাচ্ছি। - শুধু, এটুকু বলে যুবায়র পেছনের ঘরে কাপড় বদলাতে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে পোশাক বদিলয়ে ফিরে এলেন। নাহীদ কোন প্রশ্ন না করে তলোয়ার এনে তাঁর হাতে দিল।

খালিদ উঠতে উঠতে বলল- আমি আপনার সাথে যাচ্ছি।

তলোয়ার কোমরে বাঁধতে বাঁধতে যুবায়র বললেন- না। তুমি নাহীদ ও যুহ্‌রাকে

নিয়ে মুহম্মদ ইবন কাসিমের সাথে যাও।

যুহরা জিজ্ঞেস করল- ভাই, মদীনায় আপনার কি কাজ?

যুবায়র উত্তর দিলেন- আমি এমন এক লোকের কাছে য়াযীদের চিঠি নিয়ে যাচ্ছি, যিনি মুহম্মদ ইবন কাসিমকে বাঁচাতে পারেন। খালিদ, বসরা পৌছে তুমি সোজা মুহম্মদ ইবন কাসিমের বাড়ী গিয়ে যুবায়দাকে সান্ত্বনা দেবে। আমি আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি পৌছে যাব। নাহীদ, আল্লাহ হাফিজ। যুহরা আমার সাফল্যের জন্য দু'আ কর।- একথা বলে যুবায়র বের হয়ে গেলেন।

পথে মুহম্মদ ইবন কাসিমের ঘর। ভেতরে টিমটিমে মশাল জ্বলছিল। দরজায় দাঁড়িয়ে, তিনি ভেতরে উঁকি মারলেন। তারপর কি ভেবে পা টিপে ভেতরে প্রবেশ করলেন। মুহম্মদ ইবন কাসিম গভীর নিদ্রায় মগ্ন। নিষ্পাপ শিশুর ন্যায় নির্মল হাসি তাঁর নিদ্রিত ওষ্ঠে লেগে থাকতে যুবায়র অনেক সময় দেখেছেন। আজো সেই হাসি তাঁর মুখে লেগেছিল। মাথার দিকে দেওয়ালে সেই তরবারী ঝুলান ছিল যার দ্বারা তিনি সিন্ধুর দৃঢ় দুর্গগুলো এবং দেশবাসীর হৃদয় জয় করেছিলেন।

এক অজ্ঞাত ভাবের আতিশয্যে যুবায়রের হৃদয় দুলে উঠল। তাঁর চোখে অশ্রু দেখা দিল। তিনি কম্পিত স্বরে আস্তে আস্তে বললেন- "ভাই আমার, বন্ধু আমার, সেনাপতি আমার, আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করুন।" বলে নীরবে বের হয়ে এলেন।

প্রাসাদ হতে বের হবার সময় যুবায়র তাঁর অধীর মনকে এই বলে প্রবোধ দিচ্ছিলেন- না, না। আমাদের নিশ্চয় আবার দেখা হবে।

॥ তিন ॥

ভোরবেলা প্রাসাদের ফটকে তিল ধরার স্থান ছিল না। মুহম্মদ ইবন কাসিম দরজার বাইরে এলে জনতা এদিক ওদিক সরে সিঁড়ি খালি করে দিল। সামরিক কর্মচারী, শহরের গণ্যমান্য লোক এবং পুরোহিতগণ অগ্রসর হয়ে তাঁর সাথে করমর্দন করতে লাগল। যখন ভীম সিংহের পালা এল তিনি যেন অবচেতন ইচ্ছার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি বললেন- আপনি আমার ইসলামী নাম রাখলেন না তো।

মুহম্মদ ইবন কাসিম বললেন- তোমার পছন্দ হলে আমি তোমার নাম সয়ফুদ্দীন রাখব।

সিঁড়ির প্রান্তে এক সৈনিক অশ্ব নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুহম্মদ ইবন কাসিম অগ্রসর হয়ে আরোহন করতে উদ্যত হলেন। তখন য়াযীদ ইবন আবী কাব্শা ছুটে এসে লাগাম ধরে ফেললেন। মুহম্মদ ইবন কাসিমের প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও লোক পাগলের ন্যায় ছুটে এসে তাঁর পদস্পর্শ করতে লাগল।

অশ্বরোহণ করে মুহম্মদ ইবন কাসিম একবার চারদিকে চেয়ে দেখলেন। কারো চক্ষুই শুষ্ক দেখতে পেলেন না। শুভ্র-শ্মশ্রু-বৃদ্ধ মনে করছে তার প্রিয়তম পুত্র বিদায় নিচ্ছে। বিধবা নারী ও এতীম শিশুরা অনুভব করছে বিধাতা তাদের শ্রেষ্ঠ সহায় কেড়ে নিচ্ছেন। কিশোরী ও যুবতীরা বলাবলি করছে তাদের সতীত্ব ও পবিত্রতার রক্ষক চলে যাচ্ছেন। মোট কথা আরোরের প্রতি ঘরের শোকের করাল ছায়া নেমে এসেছিল।

পিতার ইংগিতে নগর-পুরোহিতের কিশোরী কন্যা অগ্রসর হয়ে মুহম্মদ ইবন কাসিমকে পুষ্পমাল্য দান করে বলল- ভাই আমার, আরোরের সমস্ত কন্যাদের পক্ষ থেকে এ উপহার পেশ করছি।

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে মুহম্মদ ইবন কাসিম ফুল গ্রহণ করলেন।

আরোরের বাজার থেকে সুলায়মান ইবন আব্দিল মালিকের বন্দীর ঘোড়া ফুলের স্তূপ পদদলিত করে বের হল। আরোরবাসী কোন সম্রাটের জন্যও এত বিরাট মিছিল দেখে নি। কোন আত্মীয় বিয়োগেও এত অশ্রু বর্ষণ করে নি। দু'বছর পূর্বে সিন্ধু-বিজেতাকে ঘোরতর শত্রু মনে করে যে-সব হস্ত তীর ও বর্শার দ্বারা অভ্যর্থনা করেছিল, এখন তারাই তাঁর উপর পুষ্প বর্ষণ করছে।

আলী, খালিদ, নাহীদ এবং যুহরা মুহম্মদ ইবন কাসিমের সহযাত্রী আরো কয়েকজন সৈনিকসহ আগেই শহরের বাইরে চলে এসেছিল। সম্পূর্ণ কাফিলায় ষাটজন লোক। এদের মধ্যে চল্লিশজন সৈনিক য়াযীদ ইবন আবী কাব্‌শার সাথে এসেছিল মুহম্মদ ইবন কাসিমকে পায়ে শৃংখল দিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। সালিহের সুপারিশে ওয়াসিতের কোতওয়াল মালিক ইবন ইউসুফ এদের দলপতি নিযুক্ত হয়ে এসেছিল। সালিহ্ মালিক ইবন ইউসুফকে কড়া নির্দেশ দিয়েছিল পথে মুহম্মদ ইবন কাসিমকে যেন কোন রকম খাতির করা না হয়। মালিক নিজেও হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের বংশের প্রাচীন শত্রু ছিল। কিন্তু আরোরে পৌঁছে য়াযীদ ইবন আবীম কাব্‌শার মত সেও মুহম্মদ ইবন কাসিমের, ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়ে পারল না। তার কয়েকজন সংগীও আরোরের বিদায় দৃশ্য দেখে এত বিচলিত হয়েছিল যে, তারা মুক্ত কণ্ঠে সুলায়মানের অন্যায় আদেশের সমালোচনা করতে লাগল। বিদায়কালে য়াযীদ এদেরকে বিশেষ করে বলে দিয়েছিলেন যে, ওঁকে সসম্মানে বসরা নিয়ে যাবে। খলীফার কাছে তিনিই জবাবদিহি করবেন।

দু'প্রহরের সময় সয়ফুদ্দীন (ভীম সিংহ) ও আরোরের পুরোহিতসহ এক পর্বতচূড়ায় দাঁড়িয়ে দূরে পথের বাঁকে কাফিলাকে অদৃশ্য হতে দেখলেন।

এক দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বললেন- সিন্ধুর গৌরব-রবি দিন-দুপুরেই অস্তমিত হচ্ছে।

সূর্যাস্ত

॥ এক ॥

হযরত 'উমর ইব্‌ন আব্‌দিল আযীয' যুহরের নামায শেষ করে নবী-মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন। সহসা এক অশ্বারোহী দরজায় এসে থামল। অশ্বারোহীর মুখে চোখে ধূলা ও ঘাম লেগেছিল। ক্ষুৎ-পিপাসায় তার শরীর শ্রান্ত ও ক্লান্ত। হাতের ইশারায় 'উমর ইব্‌ন আব্‌দিল আযীযের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অশ্বারোহী তাঁকে কিছু বলতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার শুষ্ক কণ্ঠ থেকে শব্দ বের হল না। ঘোড়া থেকে নেমে চিঠি বের করার জন্য পকেটে হাত দিয়ে 'উমর ইব্‌ন আব্‌দিল আযীযের' দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু দু'তিন পদ চলার পরই কেঁপে মাটিতে পড়ে গেল। সংগে সংগে ক্লান্ত ঘোড়াটি আরোহীর ভারমুক্ত হয়েই মাটিতে পড়ে গেল এবং দেহের এক প্রবল আক্ষেপের সাথে চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল।

এ অশ্বরোহী ছিলেন যুবায়র। লোকে তাঁকে তুলে মসজিদের হুরায় নিয়ে গেল। কিছুক্ষন পর চেতনা ফিরে এলে তিনি চোখ খুললেন। উমর ইব্‌ন আবদিল আযীয তাঁর মুখে পানির ছিটা দিচ্ছিলেন। তিনি পানির পাত্র কেড়ে নিয়ে পান করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু 'উমর ইব্‌ন আব্‌দিল, আযীয বললেন- একটু সবুর কর। তুমি আগেই যথেষ্ট পানি খেয়েছ। এবার কিছু খাদ্য গ্রহণ কর। মনে হচ্ছে ক'দিন ধরে তুমি কিছুই খাও নি। উমর ইব্‌ন আবদিল আযীযের ইশরায় এক ব্যক্তি তাঁর সামনে কিছু খাবার এনে দিল। কিন্তু তিনি বললেন- না, আমার শুধু পানির দরকার'। তারপর চমকে উঠে পকেটে হাত দিয়ে বললেন- আমি আগেই অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেছি। এ চিঠি ... কিন্তু ...? পকেট খালি দেখে তাঁর চোখ উম্মিলিতই হয়ে গেল।

'উমর ইব্‌ন আবদিল আযীয বললেন- তোমার চিঠি আমি পড়েছি। তোমার ঘোড়ার মৃত্যু এবং তোমার সচেতন হওয়া দেখেই আমি বুঝেছিলাম তুমি কোন জরুরী খবর নিয়ে এসেছ।

যুবায়র বললেন- তা'হলে .... আপনি মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের জন্য কিছু করবেন?

আমি দামিশ্‌ক যাচ্ছি। একথা বলে হযরত 'উমর ইব্‌ন আবদিল 'আযীয তাঁর এক সাথীকে বললেন- আমার ঘোড়া প্রস্তুত?

তিনি উত্তর দিলেন- জী হাঁ।

যুবায়র বললেন- আমি আপনার সাথে যাব।

'উমর ইব্‌ন 'আব্‌দিল 'আযীয বললেন- না, তুমি বিশ্রাম কর। বিগত সফরে তুমি অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছ।

না, আমি সম্পূর্ণ ভাল আছি। আমার শ্রান্ত হওয়ার কারণ পথের কষ্টের চেয়ে মনের অস্থিরতাই অধিক। এখানে থেকে অপেক্ষা করা আমার পক্ষে ভ্রমণের চেয়ে বেশী কষ্টদায়ক হবে।

'উমর ইব্‌ন আব্‌দিল 'আযীয বললেন- বেশ, তুমি খেয়ে নাও।

যুবায়র তাড়াতাড়ি কয়েক গ্রাস খাদ্য মুখে দিয়ে পেট পুরে পানি খেলেন।

তারপর উঠে বললেন- আমি প্রস্তুত।

'উমর ইব্‌ন আবদিল 'আযীয জনৈক আরবকে আর একটি ঘোড়া আনতে বললেন এবং যুবায়রকে বললেন- তুমি একটু বস।

যুবায়র বললেন- এটা যদি আপনার আদেশ না হয় তবে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে চাইব। বসলে শ্রান্তি ও নিদ্রার প্রকোপ অপেক্ষাকৃত প্রবল হয়।

এক আরব জিজ্ঞেস করল- আপনি পথে মোটেই বিশ্রাম করেন নি?

যুবায়র বললেন- দিনের বেলা মোটেই না। রাত্রি বেলায়, শুধু তখনই যখন বেহুশ হয়ে পড়তাম।

'উমর ইব্‌ন আব্‌দিল 'আযীয জিজ্ঞেস করলেন- তুমি পথে কয়টি ঘোড়া বদলিয়েছ?

আরবার থেকে বসরা পর্যন্ত প্রত্যেক পাঁচ ক্রোশ পরে পরে সৈন্য ঘাঁটি থেকে তাজা ঘোড়া নিয়েছিলাম। কিন্তু বসরার পরে সময় বাঁচার জন্য আমি সোজা পথ গ্রহণ করাই সংগত মনে করলে আগে আমার নীচে চারটি ঘোরা মারা গিয়েছে।

'উমর ইব্‌ন আব্‌দিল আযীয, বললেন- লোকে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের বিজয় কাহিনী বিস্ময়ের সাথে শুনেছে। কিন্তু যে সেনাপতির অধীনে তোমার মত সৈনিক থাকে তার কাছে পৃথিবীর কোন দুর্গই অজেয় থাকতে পারে না।

পরিচারক এসে খবর দিল, অশ্ব প্রস্তুত। যুবায়র এবং উমর ইব্‌ন আব্‌দিল আযীয হুজ্‌রা থেকে বের হয়ে অশ্বারোহণ করলেন।

॥ দুই ॥

সিন্ধু থেকে সুলায়মান মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের সব সংবাদ পেয়েছিলেন। তিনি একথা জেনেছিলেন আরোরের ন্যায় মকরান এবং ইরানের প্রত্যেক শহরের লোকেরা পথে তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানিয়েছে এবং সিন্ধু হতে ইরাক পর্যন্ত বিদ্রোহের ভয়ে য়াযীদ তাঁকে শৃংখল পরাতে সাহস করেন নি। এসব সংবাদ তাঁর প্রতিশোধ স্পৃহায় ইন্ধন যুগিয়েছে মাত্র। তিনি স্বীয় অস্ত্রগুলো একে একে পরীক্ষা করে দেখলেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে তীক্ষ্ণ ও মারাত্মক যন্ত্রটিকে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দিয়ে বসরা পাঠিয়ে দিলেন। সে ছিল সালিহ- মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের জঘন্যতম শত্রু।

বসরার লোক যে উন্মুখ প্রতীক্ষায় মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের আগমনের অপেক্ষা করছিল, তাতে সালিহ বুঝে নেয় যে সেখানে তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করলে লোক বিদ্রোহী

হয়ে উঠবে। তার ইচ্ছা ছিল বসরা থেকে ওয়াসিত পর্যন্ত মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমকে পায়ে শৃংখল পরিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু বসরাবাসীদের উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে তাকে এ সংকল্প পরিবর্তন করতে হয়।

এক সন্ধ্যায় মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের কাফিলা বসরা থেকে ত্রিশ ক্রোশ দূরে এক বস্তীর নিকট পৌছে। বস্তীবাসীরা জেনেছিল সিন্ধু-বিজেতা সুলায়মানের বন্দী সেখানে এক রাত্রি অবস্থান করবেন। বস্তীর স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুরা সামরিক ঘাঁটির কাছে দাঁড়িয়েছিল। মেয়েরা মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম ছাড়াও সে সেয়েটিকে দেখবার জন্য অস্থির ছিল, যার আহবান সিন্ধুর ইতিহাসের ধারা পরিবর্তন করে দিয়েছিল। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমকে দেখেই কয়েকজন যুবক তাঁর চারপাশে একত্রিত হল। এক সংগেই তাঁর অশ্বের লাগাম ধরবার জন্য বহু হস্ত প্রসারিত হল। মেয়েরা ঘাঁটির অনতিদূরে হাওদাবাহী উষ্ট্র থামিয়ে নিয়েছিল এবং যুহ্‌রা ও নাহীদকে এক ঘরে নিয়ে গিয়েছিল।

ঘাঁটি রক্ষীরা মালিক ইব্‌ন ইউসুফকে জানাল পথের প্রত্যেক বস্তীতে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের বিপুল সম্বর্ধনার কথা শুনে সালিহ্ অত্যন্ত বিচলিত হয়েছে এবং তার আশংকা যে বসরাগামী অধিকতর উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবে। সে এরূপও আশংকা করে সেখানে নাহীদের আবেদন সালিহের উদ্দেশ্যের পক্ষে ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে। কাজেই সে সিদ্ধান্ত করেছে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমকে সোজা ওয়াসিত নিয়ে যাওয়া হবে। সে এ মেয়েদেরকেও বসরা পৌছতে দিতে চায় না। ভোরে হয়ত সে নিজেই এখানে পৌছে যাবে।

ঘাঁটির নেতা মালিককে সালিহের পত্র দেখাল। তাতে নির্দেশ ছিল তার আগমন পর্যন্ত মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমকে যেন সেখানেই রাখা হয়।

পথে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ পেয়ে মালিক ইব্‌ন ইউসুফ তাঁর বিশেষ ভক্ত হয়ে পড়ে। তার ধারণা ছিল বসরাবাসীদের উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে সুলায়মান মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম সম্বন্ধে স্বীয় সংকল্প পরিবর্তন করতে বাধ্য হবেন। ওলীদের মৃত্যুর পর ওয়াসীত পুনরায় খারিজী সম্প্রদায়ের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সেখানে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের স্বপক্ষে কোন দাবী উঠবার আশা ছিল না।

'ইশার নামাযের পর সে কিছুক্ষণ স্বীয় তাঁবুর বাইরে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে থাকে। অবশেষে এক দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের শিবিরে প্রবেশ করে। তিনি মোমবাতির আলোতে কিছু লিখছিলেন।

মালিক বললেন- আপনি কারো কাছে চিঠি পাঠাতে চাইলে আমি ব্যবস্থা করে দেব?

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম বললেন- না, এটা চিঠি নয়। আমি এক নতুন ধরণের 'মিনজানীক' যন্ত্রের নকশা আঁকছি। আমার মনে হয় এর দ্বারা প্রস্তর আরো দূরে এবং সঠিক লক্ষ্যস্থলে নিক্ষেপ করা যাবে।

মালিক উত্তর দিলেন- এখন আপনার নিজের সম্বন্ধে কিছু ভাবা উচিত।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম জবাব দিলেন, আমি জনৈক ব্যক্তি মাত্র আর 'মিনজানীক'

একটি জাতীয় প্রয়োজন। আমাকে যদি বন্দী করা হয় তবে আপনি নিজেই এই নকশাটি খলীফার কাছে পৌঁছিয়ে দেবেন।

মালিক উত্তর দিল- আপনার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। আপনি বসরা না গিয়ে সোজা ওয়াসিত যাচ্ছেন।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম শান্ত স্বরে জবাব দিলেন- আমি আগেই ভেবেছিলাম তিনি আমাকে বসরা নিয়ে যাবার ভুল করবেন না।

মালিক বলল- এখন আপনি নিজের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করতে পারবেন। ওয়াসিতের অল্প লোকই আপনার স্বপক্ষে কথা বলবে। কিন্তু আপনি বসরায় পৌঁছলে হাজার হাজার মুজাহিদ আপনার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হবে। আজ রাত্রি বা কাল ভোর পর্যন্ত সালিহ্ এখানে পৌঁছে যাবে। তারপর আমাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। এখন মাত্র একটি উপায় তা হচ্ছে, আপনি এখনই মেয়েদের নিয়ে যাত্রা করুন। সেখানকার প্রত্যেক গৃহ আপনার জন্য এক একটি দুর্গে পরিণত হবে। এখুনি উঠুন। সময় সংক্ষিপ্ত।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম বললেন- আমার প্রাণ রক্ষার জন্য আপনি ক'জন মুসলমানের প্রাণ বিসর্জন দেওয়া সংগত মনে করেন? বসরাবাসীদের বিদ্রোহ ইতিপূর্বেই মুসলিম জগতের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে কি? আমার একটি প্রাণ কি এতই মূল্যবান যে, তার জন্য লক্ষ লক্ষ মুসলমানের অসি পরস্পরকে আঘাত করবে? লক্ষ লক্ষ নারী বিধবা ও লক্ষ লক্ষ শিশু এতীম হবে? মুসলিম জগতকে এরূপ ধ্বংস হতে রক্ষা করার জন্য আমার প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়, তবে সে কুরবানী কি বৃথা যাবে? খিলাফত এখন রাজত্বে পরিণত হয়েছে। সে মুসলমানদের দুর্ভাগ্য। তা সত্ত্বেও মুসলিম জাতির প্রধান অংশ সুলায়মানকে খলীফারূপে গ্রহণ করার ভ্রম করে ফেলেছে। কাজেই আমার বিদ্রোহ শুধু খলীফা সুলায়মানের বিরুদ্ধে হবে না, বরং জাতির প্রধান অংশের বিরুদ্ধে হবে। আমার জীবনে কুরবানী দ্বারা হয়ত মুসলিম জনসাধারণ এ দুর্বলতা সম্বন্ধে অবহিত হবে এবং তাদের সমবেত মতের চাপে হয়ত সুলায়মান সৎ পথে ফিরে আসবে। অন্ততঃপক্ষে সুলায়মানের মত লোক এ দায়িত্বপূর্ণ পদ না পায়। যদি আমার পরিণামে বিচলিত হয়ে জনসাধারণ অনুভব করে খলীফার পদকে বংশগত উত্তরাধিকার মনে করা ভুল এবং সুলায়মানের পর তারা কোন ধার্মিক ও সদাচারী মুসলমানকে খলীফা নির্বাচন করে, তা হলে এরূপ মহান উদ্দেশ্যে জীবন দান আমার শ্রেষ্ঠতম সৌভাগ্য মনে করব।

মালিক ইব্‌ন ইউসুফকে হার মানতে হল। সে বলল- আপনার সিদ্ধান্ত অটল। আমি হার মানছি। কিন্তু এ বালিকাদের সম্বন্ধে আপনি কি স্থির করেছেন? ঘাঁটির সৈনিকদের কাছে আমি জানতে পেরেছি লোকের উত্তেজনার ভয়ে সালিহ্ এদেরকেও ওয়াসিত নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু আমার মনে হয়, এরা বসরা না পৌঁছলে লোক আরো বেশী উত্তেজিত হবে। বসরার প্রতি গৃহ নাহীদের প্রতীক্ষা করছে। সালিহের এখানে পৌঁছার আগে এদেরকে বসরা পাঠিয়ে দেওয়াই কি ভাল নয়?

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম ভেবে উত্তর দিলেন- আমার ভাবনা শুধু এজন্য যে, নাহীদ

যুবায়রের স্ত্রী এবং সালিহ্‌ আমার ন্যায় যুবায়রকেও ঘোর শত্রু মনে করে তা সত্ত্বেও সে নাহীদের সাথে দুর্ব্যবহার করার সাহস করবে বলে আমার মনে হয় না।

মালিক উত্তর দিল- আমি কয়েক বছর সালিহের সাথে কাটিয়েছি। সে মানুষ নয়, সাপ। এ বালিকাদের সম্বন্ধে সে যদি একটিমাত্র উদ্ধত শব্দ উচ্চারণ করে, তা হলে আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি আমার সমস্ত সংগী প্রাণ দিতে প্রস্তুত হবে। আপনি আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন। খালিদের সাথে এ বালিকাদের বসরা পাঠিয়ে দিন। আমি কয়েকজন সৈনিক সংগে দিচ্ছি। যদি ইসলামের ভবিষ্যৎ আপনার বিশেষ প্রিয় হয়, তবে আপনি এদেরকে উপদেশ দিতে পারেন তারা যেন বসরাতে কোন বিদ্রোহে উৎসাহ না দেন।

হঠাৎ মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের মনে এক চিন্তার উদয় হল আর মনে কোন সুপ্ত অনুভূতি জেগে উঠল। তিনি দাঁড়ালেন এবং অস্থিরভাবে তাঁবুর ভেতরে পায়চারী করতে লাগলেন। মালিক তাঁর হালচাল নিবিষ্ট মনে পর্যবেক্ষণ করছিল। বারবার মুষ্টিবদ্ধ করে তিনি প্রবল ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন মনে হল। কয়েকবার পায়চারী করার পর মালিককে কিছু না বলে তিনি তাঁবুর বাইরে চলে গেলেন এবং পাশের তাঁবু থেকে খালিদকে ডাকলেন। খালিদ ছুটে এল। তিনি বললেন- খালিদ, নাহীদ ও যুহ্‌রাকে বস্তী হতে শীঘ্র ডেকে নিয়ে এস। শীগগীর কর।

খালিদ তৎক্ষণাৎ ছুটে বস্তীতে গেল। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম মালিককে বললেন- আপনি এখুনি চারটি ঘোড়া প্রস্তুত রুন। না, পাঁচটি। আলীও আমাদের সাথে যাবে।

মালিক আশ্বান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন- তাহলে আপনি যাচ্ছেন?

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম জবাব দিলেন- যদি তোমার অনুমতি হয়, তা হলে আমি এদেরকে বসরা রেখে চলে আসব। আল্লাহ চাহে তো ভোরেই আমি ফিরে আসব।

মালিক উত্তর দিল- আপনি ফিরে আসার নাম মুখে আনবেন না। সব চেয়ে ভাল হয় যদি আপনি সিন্ধুর পথ ধরেন। আমি কিছু দিনের মধ্যেই আপনার স্ত্রীকে সেখানে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করব।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম বললেন- বন্ধু আমার, বারবার আমার সম্বন্ধে ভুল ধারণা কর না। আমি এরূপ ব্যক্তি নই যে, কোথাও লুকিয়ে থাকব। মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য আমি বাড়ী যেতে চাই। তাও, তুমি যদি আমার প্রতিজ্ঞা বিশ্বাস কর, তবেই। সালিহ যদি আজ রাত্রে বসরা ত্যাগ না করে থাকে তবে আমি কথা দিচ্ছি তার এখানে পৌঁছার আগেই আমি ফিরে আসব।

সালিহের মত লোক এরূপ অবস্থায় রাত্রে ভ্রমণ করেন না। ইরাকের মাটিতে সে দিনের বেলা ওজন করে করে প্রতি পদক্ষেপণ করে। আমি ঘোড়া প্রস্তুত করছি। আপনি বসরা পৌঁছে ফিরে আসার সংকল্প পরিবর্তন করলে আমার চিন্তা করবেন না। আমি আপনার সাথে এক সৈনিক দিচ্ছি। আপনি তার মারফতে খবর পাঠিয়ে দেবেন। আমার সংগীদের নিয়ে আমি সিন্ধুর দেশে চলে যাব।

মুহম্মদ ইবন কাসিম একটু তিক্তস্বরে বললেন- মালিক, তুমি বারবার আমাকে লজ্জিত কর না। তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস না কর তবে আমি যাব না।

মালিক সংকুচিত হয়ে বললেন- না, না আমি ঘোড়া বন্দোবস্ত করছি। আপনি প্রস্তুত হোন।- বলেই সে বের হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর মুহম্মদ ইবন কাসিম, খালিদ, নাহীদ, যুহরা এবং আলী বিদ্যুৎগতি অশ্ব-পৃষ্ঠে বসরা যাত্রা করলেন। পথে সালিহের সাথে টক্কর লাগার ভয়ে মুহম্মদ ইবন কাসিম সাধারণ সোজা পথ ত্যাগ করে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এবং অজ্ঞাত পথ ধরলেন।

৷৷ তিন ৷৷

প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রির সময় দাসী দৌড়ে গিয়ে যুবায়দার ঘরে প্রবেশ করে তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগাতে জাগাতে বলল- যুবায়দা, যুবায়দা, তিনি এসে পড়েছেন, তিনি এসে পড়েছেন।

যুবায়দা আচমকা নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। দাসী একটু উচ্চস্বরে বলল- যুবায়দা, মুহম্মদ এসেছেন।

পথ-ভোলা পথিককে অচেতন অবস্থায় উত্তপ্ত মরুভূমি হতে তুলে শ্যামল খর্জুর উদ্যানে নিয়ে এলে যেরূপ অবস্থা হয়, যুবায়দার অবস্থাও তাই হল। যে একবিন্দু পানির জন্য কাতরাবার পর সাগরে সন্তরণের সুযোগ পায়, তার মত। অনুভূতির প্রাবল্যে যুবায়দা এক মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইল। দাসী মশাল জ্বালিয়ে বলল- ওঠ, তাঁর সংগে কয়েকজন মেহমান আছে।

ততক্ষণে যুবায়দার সম্বিৎ ফিরে এল। 'তিনি কোথায়'?- সে কম্পিতস্বরে জিজ্ঞেস করল।

তিনি আস্তাবলে ঘোড়া বাঁধছেন। দু'টি বালিকা উঠানে দাঁড়িয়ে আছে। যুবায়দা বাইরে এসে চাঁদের আলোতে যুহরা ও নাহীদের দিকে তাকাল।

বলল- আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে আসুন। আমি এখুনি স্বপ্ন দেখছিলাম। আপনারা নাহীদ আর যুহরা তো?

উত্তর না দিয়ে নাহীদ অগ্রসর হয়ে যুবায়দাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। আত্মসম্বরণের চেষ্টা সত্ত্বেও যুহরার চোখে অশ্রু উথলে উঠল। নাহীদের আলিংগনমুক্ত হয়ে যুবায়দা যুহরার দিকে মনোযোগী হল। সে তার অশ্রু বর্ষণের কারণ জিজ্ঞেস করতে চাইছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে মুহম্মদ ইবন কাসিম, খালিদ ও আলীকে কাছে আসতে দেখা গেল।

মুহম্মদ ইবন কাসিমের সাথে দু'জন অপরিচিত পুরুষ-দেখে যুবায়দা নাহীদ যুহরাকে ঘরের ভেতর নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু নাহীদ বলল- আমাদের পাশের ঘরে বিশ্রাম করতে দিন। আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত।

যুবায়দা বলল- বেশ আপনারা বিশ্রাম করুন।

যুবায়দার ইশারায় দাসী যুহ্‌রা ও নাহীদকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম খালিদ ও আলীকে সে ঘরে পৌঁছে দিয়ে যুবায়দার কামরায় প্রবেশ করলেন।

॥ চার ॥

রাত্রি তৃতীয় প্রহর। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম নিজের ঘরে বসে যুবায়দার সাথে কথা বলছিলেন। দরজা খোলা ছিল। যুবায়দা মাঝে মাঝে স্বামীর চেহারা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে বাইরের দিকে তাকাচ্ছিল এবং তার চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। উষার আলো তার জন্য বিরহ সাঁঝের বাণী নিয়ে আসছিল। প্রভাতপাখীর কাকলী আরম্ভ হওয়ার কিছুক্ষণ আগেই মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম সম্বন্ধে সুলায়মানের অভিসন্ধি জ্ঞাত হওয়ার সংগে সংগেই যুবায়দার মাতা স্বীয় ভ্রাতা এবং বসরার কয়েকজন প্রভাবশালী লোকের ডেপুটেশন নিয়ে দামিশ্‌ক যাত্রা করেছিলেন। উঠতে উঠতে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম বললেন- দুঃখের বিষয় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হল না। যুবায়দা, আমি আশা করি নাহীদ ও যুহ্‌রা তোমাকে উদাস হতে দেবে না। কয়েকদিন চেষ্টা করবে যেন এদের আগমন সংবাদ কেউ না পায়।

যুবায়দা ঠোঁট কামড়িয়ে ক্রন্দনোচ্ছাস চাপতে চেষ্টা করছিল। তার দৃষ্টি বলছিল- আপনি সত্যিই চলে যাচ্ছেন?

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম বললেন- যুবায়দা, আল্লাহ্ হাফিয।

মিনতিপূর্ণ স্বরে যুবায়দা বলল- আপনি অনুমতি দিলে আমি আপনার সাথে আস্তাবল পর্যন্ত আসব।

তিনি বললেন- না, তুমি এখানেই থাক। আমার দিকে ও রকম করুণ চোখে তাকিও না।

যুবায়দার চোখে অশ্রুর বন্যা উথলে উঠছিল। সে চোখ বন্ধ করে বলল- আসুন।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম এক মুহূর্তের জন্য যুবায়দার অশ্রুবিন্দুর প্রতি তাকিয়ে রইলেন- যাতে প্রেম ও আনুগত্যের সহস্র স্রোতস্বিনী বন্দী ছিল। তিনি রুমাল দিয়ে তার অশ্রু মুছিয়ে দিতে হাত বাড়ালেন। সে আবার মুদিত নয়নে বলে উঠল- আসুন।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম, দু'পদ অগ্রসর হলেন। একবার থমকে দাঁড়িয়ে পেছনের দিকে তাকালেন। তারপর দীর্ঘ পদক্ষেপ করে বাইরে চলে গেলেন।

আস্তাবলের সামনে তিনি খালিদ ও আলীকে দেখে বললেন- তোমরা এখনো শোও নি?

খালিদ জবাব দিল- আমাদের কেউ এখনো শোয় নি। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম বললেন- যাও, শুয়ে পড়।

কিন্তু আমি আপনার সাথে যেতে চাই।

মুহম্মদ ইবন কাসিম খালিদের কাঁধে সস্নেহে হাত রেখে বললেন- আমি তোমার মনোভাব জানি। কিন্তু তোমার এখানে থাকাই কল্যাণকর। আমার জীবনের বর্তমান জিহাদে আর কোন সঙ্গীর প্রয়োজন নেই।

আমার সেনাপতির আদেশ আমার শিরোধার্য। কিন্তু এখানে থেকে আপনার প্রতীক্ষার প্রতি ঘন্টা আমার কাছে কিয়ামত মনে হবে।

মুহম্মদ ইবন কাসিম উত্তর দিলেন- এটা তোমার সেনাপতির আদেশ নয় ভাই। তোমার বন্ধুর অনুরোধ। যতদিন যুবায়দার মামা ফিরে না আসেন, তোমার এখানে থাকা প্রয়োজন।

নিরাশ হয়ে খালিদ আলীর দিকে তাকাল। আলী আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিয়ে এল।

মুহম্মদ ইবন কাসিম ঘোড়ায় চড়ে করমর্দনের জন্য হাত বাড়ালেন। খালিদ ভাবোচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে তাঁর হাত চুম্বন করল এবং বলে উঠল- ভাই আমার, বন্ধু আমার, প্রভু আমার, আল্লাহ হাফিয।

খালিদের অশ্রুবিন্দু মুহম্মদ ইবন কাসিমের হাতের উপর পতিত হল। হাত ছাড়িয়ে তিনি আলীর দিকে ফিরলেন। আলী তাঁর হাত শক্ত করে নিজ হাতে ধরে কম্পিত স্বরে 'আল্লাহ হাফিয' বলে ফোঁপাতে লাগল।

দরজা হতে বের হবার সময় মুহম্মদ ইবন কাসিম পেছন ফিরে দেখলেন। উঠানে কয়েক পদ দূরে তিনজন নারী দন্ডায়মান ছিল।

যখন বসরার মসজিদসমূহে ভোরের আযান গুঞ্জরে উঠছিল, তখন মুহম্মদ ইবন কাসিম সেই বাজারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, যেখানে কিছুকাল পূর্বে বসরাবাসীগণ সিন্ধু আক্রমণকারী বাহিনীর সতর বছর বয়স্ক সেনাপতির বিরাট মিছিল দেখেছিল।

শহর থেকে কিছু দূরে গিয়ে এক নদীর তীরে তিনি ফজরের নামায পড়ে নিলেন। তারপর অশ্বারোহণ করে তীরবেগে অশ্ব ছুটিয়ে দিলেন।

॥ পাঁচ ॥

খলীফা সুলায়মান মসজিদে মগরিবের নামায পড়ে প্রাসাদে প্রবেশ করছিলেন। পেছন থেকে কে ডাক দিল- সুলায়মান!

সে স্বরে রোষও ছিল, মহিমাও ছিল। সুলায়মান চমকে পিছনে তাকালেন। বললেন- কে? 'উমর ইবন আবদিল 'আযীয,? ভাল তো? আপনি কখন এলেন?

'উমর ইবন আবদিল আযীয, এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পরিবর্তে সুলায়মানের হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন, সুলায়মান, আল্লাহকে কি জবাব দেবে?

সুলায়মান অত্যন্ত আত্মম্ভরী ছিলেন। কিন্তু 'উমর ইবন আবদিল 'আযীযের ব্যক্তিত্বের সামনে তিনি সংকুচিত হয়ে পড়লেন। যুবায়র কয়েক হাত দূরে ছিলেন। কিন্তু সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে তিনি তাঁকে সহসা চিনতে পারলেন না। এদিক-ওদিক তাকিয়ে

সুলায়মান বললেন- মনে হচ্ছে আপনার বক্তব্য বিষয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তার জন্য নির্জনে আলাপ করাই বোধ হয় ভাল হবে। আসুন, ভেতরে যাই।

'উমর ইব্‌ন আবদিল 'আযীয বললেন- আমি তো মসজিদে লোকের সামনে তোমাকে পাকড়াও করব ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন চল, শিগগির কর। যুবায়র, তুমিও এস।

কয়েক পদ এগিয়েই তাঁরা প্রাসাদের এক প্রশস্ত কামরায় প্রবেশ করলেন। সুলায়মান মশালের আলোকে যুবায়রের দিকে তাকিয়ে বললেন- আমি আগেও তোমাকে কোথায় দেখেছি।

'উমর ইব্‌ন আবদিল 'আযীয বললেন- এসব কথার সময় এখনই নেই। আমি মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম সম্বন্ধে কিছু বলতে এসেছি।

মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের নাম শোনা মাত্র সুলায়মান ক্রোধ ও উত্তেজনার সাথে উমরের দিকে তাকালেন এবং বললেন- তা'হলে তার ষড়যন্ত্র মদীনা পর্যন্ত পৌছেছে?-আর এ-তার বন্ধু-?

যুবায়র বললেন- আমি তাঁর বন্ধুত্ব অস্বীকার করছি না। কিন্তু এ কথা সত্য নয় যে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম আপনার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র ফেঁদেছেন। আমি য়াযীদ ইব্‌ন আবী কাব্‌শার দূত হয়ে মদীনা পৌছেছিলাম।

সুলায়মান কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু 'উমর' ইব্‌ন আব্‌দিল 'আযীয য়াযীদ ইব্‌ন আবী কাব্‌শার চিঠি তাঁর হাতে দিলে বললেন- আগে এ চিঠি পড়ে নাও। য়াযীদ তোমার বিশিষ্ট বন্ধু। মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের নির্দোষিতা যদি তাকে এরূপ চিঠি লিখতে অনুপ্রাণিত করতে পারে, তাহলে আমার কাছে এমন আশা কর না যে, তোমাকে মুসলমানের গর্দান কাটতে দেখে আমি চুপ করে বসে থাকব। তুমি হয়ত এই ভেবে আনন্দিত যে, বিধাতা আজ তোমাকে প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু তুমি সে যুবকের মহানুভবতার অনুমান পর্যন্ত করতে পারবে না, যার উৎসর্গিত প্রাণ সৈন্যের সংখ্যা তোমার সৈন্যের চেয়ে অধিকতর তীক্ষ্ণ এবং যার তীর তোমার তীরের চেয়ে অধিক হৃদয়বিদারক। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সে এক অদূরদর্শী নেতার আদেশের সম্মুখে মস্তক নত করে দিয়েছে। তুমি পঞ্চাশজন লোক সিন্ধুতে পাঠিয়েছিলে তাকে বন্দী করে নিয়ে আসতে। কিন্তু তুমিই বল, যদি তুমি তার স্থানে হতে এবং তোমার কাছে এক লক্ষের চেয়েও বেশী উৎসর্গিত প্রাণ সৈন্য বাহিনী থাকত এবং য়াযীদ গিয়ে তোমাকে খলীফার আদেশ শোনাত যে আমি তোমাকে শৃংখলাবদ্ধ করে নিয়ে যেতে চাই- তাহলে তুমি সে পঞ্চাশজন লোকের সাথে কি ব্যবহার করতে? তোমার নিজের ভাই তোমার নেতা ছিল। কিন্তু তুমি সারা জীবন তার বিরুদ্ধে নানা প্রকার ষড়যন্ত্র পাকিয়েছ। কিন্তু মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম তোমাকে ভাল করেই চেনে। তোমার কাছে সে কোন প্রকার সদ্ব্যবহার আশা করে নি। ইচ্ছা করলে সে সিন্ধুর প্রতি গৃহকে স্বীয় দুর্গে পরিণত করতে পারত। সে তোমার দূতকে হত্যা করে ফেললেও হয়ত তুমি তার কিছুই করতে পারতে

না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তোমার আদেশ পালনে ক্রটি করে নি। তুমি নিজের প্রতিশোধের বেশী কিছুই ভাবতে পার নি। কিন্তু মুসলিম জগতের ভবিষ্যৎ সে ভেবেছে। সে যে হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফের জামাতা তুমি কি তারই প্রতিশোধ নিতে চাও? কিংবা-যুদ্ধ-বিদ্যার প্রদর্শনীতে সে তোমাকে পরাজিত করেছিল বলে এ প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছ? হায়, সে যেরূপ সৈনিকের কর্তব্য বোঝে, তুমি যদি সেরূপ নেতার কর্তব্য বুঝতে পারতে, তার সৈন্য বাহিনী ভারতের শেষ সীমা পর্যন্ত ইসলামের পতাকা উড্ডীন করার প্রস্তুতি করে ফেলেছিল। তাকে ফিরিয়ে না আনলে সে হয়ত এতদিনে রাজপুতানা জয় করে ফেলত। আজ দামিশ্‌কে পৌছেই আমি জেনেছি তুমি তাকে সালিহের তত্ত্বাবধানে ওয়াসিত পাঠিয়ে দিয়েছ এবং তুমি তার জন্য জঘন্যতম শাস্তি স্থির করেছ। কিন্তু মনে রেখ, তুমি তার মহত্ব কেড়ে নিতে পারবে না। জল্লাদের তরবারী লোকে ভুলতে পারে। কিন্তু শহীদের রক্ত ভুলতে পারে না। সুলায়মান, তোমাকে আমি অনেক কিছু বোঝাতে পারতাম, কিন্তু এখন কথার সময় নেই। যদি সিন্ধু-বিজেতার বুকে বিদ্ধ হবার তীর এখনো তোমার হাতে থাকে, তাকে রোধ কর। নচেৎ মনে রেখ যে ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক যেখানে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমকে এ যুগের শ্রেষ্ঠ মুজাহিদ বলে স্বরণ করবে, সেখানে তোমাকে ইসলামের হীনতম শত্রু বলে কলঙ্কিত করবে। যদি তুমি আমার কথা না মান, তা'হলে হয়ত কাল পর্যন্ত দামিশ্‌কবাসীকে একথা চিন্তা করতে বাধ্য করব যে, মুসলিম জগতে তোমার ন্যায় খলিফার স্থান নেই। ....

সুলায়মানের ক্রোধ লজ্জায় পরিবর্তিত হয়েছিল। উত্তেজনা বশে তিনি মুষ্টি বদ্ধ করে কামরায় পায়চারি করতে করতে মশালের সামনে দাঁড়ালেন। তারপর 'উমর ইব্‌ন আব্‌দিল 'আযীয ও যুবায়রের দিকে তাকিয়ে ভীত কণ্ঠে বললেন- হায়, আপনি যদি দু'দিন আগে আসতেন। আমার তীর ধনুক হতে বের হয়ে গিয়েছে। আমি এখন কিছু করতে পারি না।

'উমর ইব্‌ন আব্‌দিল 'আযীয জিজ্ঞেস করলেন- তুমি তাকে হত্যা করার আদেশ পাঠিয়েছ? ....

সুলায়মান মাথা নেড়ে জানালেন হাঁ।

যুবায়র বললেন- আপনি যদি দ্বিতীয় হুকুম লিখে দেন, হয়ত আমি সময়মত পৌছতে পারি।

সুলামান হাত তালি দিলেন। এক দাস আদেশ পালনের জন্য উপস্থিত হল। সুলায়মান বললেন- আমার আস্তাবলের শ্রেষ্ঠ ঘোড়া প্রস্তুত কর।

গোলাম চলে গেল।

সুলায়মান চিঠি লিখতে বসলেন।

চিঠি শেষ করে সুলায়মান 'উমর ইব্‌ন আবদিল 'আযীযকে দিয়ে, বললেন- আপনি পড়ে দেখুন।

'উমর ইব্‌ন আবদিল 'আযীয তাড়াতাড়ি পত্রে চোখ বুলায়ে যুবায়রের হাতে দিলেন

এবং বললেন- আল্লাহ করুন, এটা সময়মত পৌছে যায়। তুমি অত্যন্ত ক্লান্ত। আর কাউকে পাঠালে ভাল হতো না?

যুবায়র উত্তর দিলেন- এ চিঠি পাবার পর আমার ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে। আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি পথে বিশ্রাম না করেই আমি ওরাসিত পৌছতে পারব। যদি পথের প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাজা ঘোড়া পাই, তবে দীর্ঘ পথ না ধরে সোজা মরু অতিক্রম করতে চাই।

সুলায়মান আর এক আদেশ পত্র পথের ফৌজী ঘাঁটির উদ্দেশ্য লিখে যুবায়রের হাতে দিলেন।

গোলাম এসে খবর দিল, অশ্ব প্রস্তুত।

যুবায়র সুলায়মানের করমর্দন করে 'উমর ইব্‌ন আবদিল 'আযীযের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন- আপনি আমার জন্য দু'আ করুন।

'উমর ইব্‌ন আবদিল 'আযীয 'আল্লাহ হাফিজ, বলতে বলতে যুবায়রের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। যে মুখ কিছুক্ষণ আগে এক দীর্ঘ সফরের ক্লান্তিতে শ্রান্ত ছিল, তাতে এখন আশার আলো চমকাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পর এক দ্রুত-গতি অশ্বপৃষ্ঠে যুবায়র ওয়াসিতের পথ ধরলেন।

॥ ছয় ॥

চারদিন পর যুবায়র রাত্রি তৃতীয় প্রহরে এক শস্যশ্যামল অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। পরপর অনেকদিন বিশ্রামের অভাবে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যংগ অবশ হয়ে পড়েছিল; ব্যথায় মাথা ফেটে যাচ্ছিল। অশ্বের ক্ষিপ্র গতি সত্ত্বেও মধুর শীতল বায়ুর স্পর্শে বিগত প্রহরে তিনি ঝিমুতে ঝিমুতে অশ্বপৃষ্ঠে মাথা ঠেকিয়ে স্বীয় পরিবেশ সম্বন্ধে অচেতন হতে বাধ্য হন। অদম্য সংকল্প সত্ত্বেও মাঝে মাঝে তাঁর চোখ আপনা হতেই মুদে আসে, হাতের মুষ্টিতে লাগাম শিথিল হয়ে যায় এবং কিছুক্ষণের জন্য অশ্বের গতি মন্দা হয়ে আসে। কিন্তু হঠাৎ সুতীক্ষ্ণ ছুরিকার ন্যায় এক চিন্তা তাঁর মনে খচ্ করে উঠে।

তিনি চমকে নক্ষত্রের দিকে তাকান এবং অশ্বের গতি বাড়িয়ে দেন।

তাঁর গন্তব্য স্থান নিকটে এসে গিয়েছিল। কল্পনায় তিনি সুলায়মানের চিঠি সালিহ্‌কে দিচ্ছিলেন। বন্দীশালার দরজায় তিনি মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমকে বুকে জড়িয়ে ধরছিলেন। তিনি বলছিলেন- মুহম্মদ, আমি এখন শুয়ে পড়তে চাই কোন নদীর তীরে, ঘন বৃক্ষের ছায়ায়। -আর দেখ, যতক্ষণ আমি নিজে বিশ্রাম করে না জাগি, ততক্ষণ আমাকে জাগিও না। -নিদ্রা কত বিস্ময়কর বস্তু। সকল দুঃখের প্রতিষেধক, সকল বেদনার ঔষধ। অন্ততঃপক্ষে একবার আমি প্রাণ ভরে ঘুমুতে চাই। -কিন্তু না!-বন্ধু আমার, ভাই আমার, তোমাকে নিরাপদ দেখে আমার নিদ্রা ও ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে।

পূর্ব চক্রবালে শুকতারার উদয় হচ্ছিল। যুবায়রের কল্পনা তাঁকে অনেক দূরে নিয়ে

যাচ্ছিল। তিনি আর একবার দেবলের পথে এক পর্বত চূড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন। তরুণ সেনাপতির কণ্ঠস্বর তাঁর কর্ণে গুঞ্জরণ করছিল ঃ-

যুবায়র, এ তারকাটির জীবনের উপর আমার ঈর্ষা হয়। এর আয়ু যত সংক্ষিপ্ত এর উদ্দেশ্য ততই মহান। দেখ, সে পৃথিবীকে ডেকে বলছে- আমার ক্ষণিক জীবনের জন্য দুঃখ কর না। বিধাতা আমাকে সূর্যের দূতরূপে পাঠিয়েছেন। আমার কর্তব্য সম্পন্ন করেই আমি যাচ্ছি। হ্যাঁ আমিও যদি এদেশে ইসলামের সূর্যোদয়ের পূর্বে শুকতারার কর্তব্য পালন করতে পারতাম।

যুবায়রের হৃদয় যেন মোচড় দিয়ে উঠল। তিনি আবার ক্লান্ত অশ্বকে পূর্ণবেগে ছুটিয়ে দিলেন। পূর্বাকাশ হতে নিশির কালো আবরণ অপসারিত হচ্ছিল।

শুকতারা আলোকের অঞ্চলে লুকিয়ে গেল। সূর্য রক্তাম্বর পরিধান করে উদিত হল।

শেষ ঘাঁটি হতে যুবায়র অশ্ব বদলিয়ে নিলেন। আরো দু'ক্রোশ চলার পর যুবায়রের দৃষ্টিপথে ওয়াসিতের মসজিদের গুম্বজ দেখা দিল। প্রত্যেক পদক্ষেপে তিনি ভয় ও নিরাশার আসন্ন ঝড়ের মাঝে আশার মশাল জ্বেলে রাখছিলেন।

শহরের পশ্চিম ফটকে লোকের ভিড় দেখে যুবায়র ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলেন। কয়েকজন যুবকের কাঁধে, জানাযা দেখে তিনি ঘোড়া হতে নেমে পড়লেন। শরীরের ভার বহনের শক্তি তাঁর পায়ের ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি সাহস করে এক আরবকে জিজ্ঞেস করলেন- সালিহ্ কোথায় থাকে?

ঘৃণার সাথে তাঁর দিকে চেয়ে আরব জিজ্ঞেস করল- তুমি কে? সে রক্তপিপাসুর কাছে তোমার কি কাজ?

যুবায়র কয়েকজন যুবকের চোখে অশ্রুপূর্ণ দেখতে পেলেন। তারপর আরবের দিকে তাকালেন। তারপর কম্পিত হৃদয়ের উপর হাত রেখে বললেন- আমি দামিশ্‌ক হতে খলীফার এক জরুরী বাণী নিয়ে এসেছি।

আরব জিজ্ঞেস করল- খলীফা এবার কার হত্যা হুকুম পাঠালেন। প্রস্তরীভূত নয়নে যুবায়র আরবের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন- এ জানাযা কার?

আরব উত্তর দিল- তুমি সিন্ধু- বিজেতার নাম শুনেছ?

যুবায়রের হাত থেকে ঘোড়ার রাশ খসে পড়ল এবং তিনি টলে মাটিতে পড়ে গেলেন।

তাঁর চারদিকে অনেক লোক জড় হল। এক যুবক 'যুবায়র যুবায়র' বলে অগ্রসর হল আর কাছে বসে তাঁর সম্বিত ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগল। তাঁর চোখে অশ্রু ছিল। দরদভরা কণ্ঠে সে বলতে লাগল- যুবায়র ওঠ, শীগগীর কর। 'ইমাদুদ্দীন মুহম্মদ ইবন কাসিমের জানাযা যাচ্ছে।

যুবায়র অচেতন অবস্থায় বিড়বিড় করছিলেন- মুহম্মদ, আমি এখন শুয়ে থাকতে চাই- কোন নদীর তীর- কোন বৃক্ষের শীতল ও ঘন ছায়ায়। -যতক্ষণ আমি নিজে না

উঠি, আমাকে জাগিও না।

যুবক তাঁকে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলল- যুবায়র, আমি খালিদ। আমার দিকে তাকাও। মুহম্মদ চলে গেলেন। সিন্ধু-সূর্য ওয়াসিতের মাটিতে মুখ লুকাচ্ছে। ওঠ, লোকে তোমার বন্ধুর জানাযা নিয়ে যাচ্ছে।

যুবায়র চোখ খুললেন। ব্যস্ত হয়ে বললেন- খালিদ, তুমি?-আমি কোথায়?-উহু আমি বুঝি অচেতন হয়ে পড়েছিলাম। ঐ জানাযা?- আমাকে বোধ হয় কেউ বলছিলো যে- না, না- তিনি মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিম হতে পারেন না।- দেখ, আমি তাঁর মুক্তির হুকুম নিয়ে এসেছি।

যুবায়র চিঠি বের করে খালিদের হাতে দিয়ে বললেন- খালিদ, তাড়াতাড়ি এটি সালিহের কাছে পৌছে দাও।

খালিদ হেলাভরে কাগজের টুকরার দিকে তাকাল এবং এটা মাটিতে নিক্ষেপ করল। যুবায়র হতভম্ব হয়ে খালিদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

এক বৃদ্ধ আরব চিঠিখানা তুলে নিল এবং খুলে পাঠ করা মাত্র চীৎকার দিয়ে উঠল- খলীফার হুকুম ছিল যে, এঁকে সসম্মানে দামিশ্‌কে পৌছিয়ে দেওয়া হোক। সালিহ্ নিজের ইচ্ছায় এঁকে হত্যা করেছে। খলীফা কখনো এরূপ হুকুম দিতে পারেন না। ওয়াসিতের মুসলমানগণ, মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের রুহ্ প্রতিশোধ প্রার্থনা করছে। তোমরা কি দেখছ? এস, আমার সাথে এস।

জনতা সরে গেলে খালিদ যুবায়রকে তুলবার চেষ্টা করল। তিনি বললেন- আমি ঠিক আছি। চলো।

উভয়ে উঠে কবরস্থানের দিকে অগ্রসর হলেন।

যখন লোকে মুহম্মদ ইব্‌ন কাসিমের কবরের ওপর মাটি দিচ্ছিল, তখন প্রায় পঞ্চাশজন যুবক সালিহের গৃহের দরজা ভেংগে ভেতরে প্রবেশ করল এবং তলোয়ার খাড়া করে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

–ঃ সমাপ্ত ঃ–